NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG : POLITICAL SCIENCE

PAPER - IV
(Bengali Version)

MODULES - 1- 4

POST GRADUATE
POLITICAL SCIENCE
(PGPS)

প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ নভেম্বর, 2017

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান : স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

[Post-Graduate Political Science (PGPS)]

নতুন সিলেবাস (জুলাই, ২০১৫ থেকে প্রবর্তিত)

চতুর্থপত্র : রাষ্ট্রতত্ত্বের মূল বিষয়সমূহ

[Paper IV : Issues in Political Theory]

উপদেষ্টামণ্ডলী

অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য

অধ্যাপক রাধারমন চক্রবর্তী

অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ

বিষয় সমিতি

অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত

অধ্যাপক তপন চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক সুমিত মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য

অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক

রচনা

পর্যায় — এক (Module – I) একক ঃ ১ — ৪ (Units 1-4) : অধ্যাপক অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়

[অনুসৃজন : অধ্যাপক অপূর্ব মোহন মুখোপাধ্যায়]

পর্যায় — দুই (Module – II) একক ঃ ১ — ৪ (Units 1-4) : অধ্যাপক অম্বরীশ মুখার্জ্জী

পর্যায় — তিন (Module – III) একক ঃ ১ — ৪ (Units 1-4) : অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত

[সহায়তা : শ্রীমতী সৃজনী ব্যানার্জী]

পর্যায় — চার (Module – IV) একক ঃ ১ — ৪ (Units 1-4) : অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত

[সহায়তা : শ্রীমতী অর্পিতা ব্যানার্জী (চট্টোপাধ্যায়)]

সম্পাদনা : অধ্যাপক তপন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকীয় সহায়তা এবং সমন্বয়সাধন : অধ্যাপক দেবনারায়ণ মোদক

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান : স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

[Post-Graduate Political Science (PGPS)]

নতুন সিলেবাস (জুলাই, ২০১৫ থেকে প্রবর্তিত)

সূচীপত্র

পর্যায় : এক (Module – I)

একক – ১ (Unit – 1) ❑ ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ 7-18

একক – ২ (Unit – 2) ❑ উদারনীতিক কল্যাণবাদ : জন রলস্ 19-29

একক – ৩ (Unit – 3) ❑ ব্যক্তিমুক্তিভিত্তিক উদারনীতিবাদ : রবার্ট নোজিক 30-40

একক – ৪ (Unit – 4) ❑ কৌমবাদ 41-55

পর্যায় : দুই (Module – II)

একক – ১ (Unit – 1) ❑ বহুত্ববাদ 56-68

একক – ২ (Unit – 2) ❑ ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্র 69-75

একক – ৩ (Unit – 3) ❑ এলিট তত্ত্ব 76-86

একক – ৪ (Unit – 4) ❑ বহুসংস্কৃতিবাদ 87-95

পর্যায় : তিন (Module – III)

একক – ১ (Unit – 1) ❑ আধিপত্য : আন্তোনিও গ্রামশি 96-100

একক – ২ (Unit – 2) ❑ মতাদর্শ : লুই আলথুসার 101-105

একক – ৩ (Unit – 3) ❑ রাষ্ট্র সম্পর্কিত হাতিয়ারবাদী অভিমত : র‍্যালফ মিলিব্যান্ড 106-108

একক – ৪ (Unit – 4) ❑ রাষ্ট্র সম্পর্কিত কাঠামোবাদী অভিমত : নিকোস পুলানৎজাস 109-113

পর্যায় : চার (Module – IV)

একক – ১ (Unit – 1) ❑ উত্তরআধুনিকতাবাদ 114-120

একক – ২ (Unit – 2) ❑ উত্তরউপনিবেশবাদ 121-126

একক – ৩ (Unit – 3) ❑ নারীবাদ 127-134

একক – ৪ (Unit – 4) ❑ বাস্তুসংস্থানবাদ 135-144

একক—১ ❑ ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism)

গঠন

১.০১ ভূমিকা

১.০২ উদারনীতিক রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভব

১.০৩ উদারনীতিবাদের পূর্বসূরীগণ

১.০৪ উদারনীতিবাদ ঃ পটভূমি ও ঐতিহ্য

১.০৫ ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ

১.০৬ পরিমার্জিত ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ

১.০৭ গ্রন্থসূচী

১.০৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য ঃ

রাজনৈতিক তত্ত্বের এই এককটি পাঠের মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্টভাবে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারবো। এই বিষয়গুলি হল ঃ

(১) উদারনীতিবাদ সম্পর্কে ধারণা অর্থাৎ উদারনীতিবাদ বলতে কী বোঝায় তা সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো।

(২) উদারনীতিবাদের উদ্ভবের সংগে আমাদের পরিচয় ঘটবে।

(৩) উদারনীতিবাদ আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠেনি। এর একটি ঐতিহ্য রয়েছে। কোন ঐতিহ্যের ধারক উদারনীতিবাদ, কাদের হাত ধরে উদার নীতিবাদের যাত্রা শুরু হয় সেই ইতিহাস আমরা জানতে পারবে।

(৪) উদারনীতিবাদের নানারূপ রয়েছে। আমরা এই এককে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ ও পরিমার্জিত উদারনীতিবাদ সম্পর্কে নিজেদের আলোকিত করতে পারবো।

১.০১ ভূমিকা (Introduction)

রাজনৈতিক তত্ত্বের সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে রাষ্ট্র সম্পর্কিত উদারনৈতিক তত্ত্বটি প্রাচীনতম তত্ত্ব। এক হিসাবে এই তত্ত্ব সম্ভবতঃ সব থেকে সফলতম তত্ত্ব। আশ্চর্যজনক স্থিতিস্থাপকতা ও নমনীয়তা এই তত্ত্বে পরিলক্ষিত হয়। উদারনৈতিক তত্ত্বের সফলতার কারণ দ্বিবিধ ঃ প্রথমতঃ অ-উদারনীতি রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতা এবং দ্বিতীয়তঃ, উদারনীতি-বিরোধী রাষ্ট্র ব্যবস্থাগুলির ব্যর্থতা। উদারনৈতিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জীবনীশক্তি যা চারশো বছরের অধিককাল সময় বিভিন্ন পরিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রতত্ত্বকে তার মান্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে সেটি উদারনীতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাফল্যের কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে। এই তত্ত্ব পাশ্চাত্য সমাজের সামাজিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক বাস্তবতার পরিবর্তনের সংগে সংগতি রেখেছে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের সংগে উদারনীতিক রাষ্ট্রতত্ত্ব প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে যার ফলস্বরূপ এই তত্ত্ব গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে।

উদারনীতিবাদ সেই সকল নীতিসমূহ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও অঙ্গীকার স্পষ্ট করে যাদের সাধারণ উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির স্বাধীনতার উপর বিশ্বাস স্থাপন। আদর্শ হিসাবে উদারনীতিবাদকে বহুস্বর বলে গণ্য করা যেতে পারে। সমসাময়িক উদারনীতিবাদ আর্থ-রাজনৈতিক বিকাশের ফসল। এনসাইক্লোপেডিয়া অফ সোস্যাল সায়েন্স (ভল্যুম ৯), অনুসারে উদারনীতিবাদ হল এমন একটা ধারণা যা সরকারের কার্যপদ্ধতি ও নীতি হিসাবে, সমাজ গঠনের নীতি হিসাবে এবং ব্যক্তি ও সমাজের একটি জীবনাদর্শ হিসাবে স্বাধীনতাকে গ্রহণ করে। ল্যাটিন ভাষায় 'লিবার' (Liber) শব্দটির অর্থ 'স্বাধীন' (Free)। এই শব্দটি 'দাস' (bonded) শব্দের বিপরীতার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। 'লিবারাল' (Liberal) শব্দটি এবং তার আধুনিক ধারণার উদ্ভব ঘটে 'লিবারেলস' (Liberales) নামক স্পেনীয় শব্দ থেকে। স্পেনের রাজনৈতিক দল 'লিবারেলস' সীমিত ক্ষমতার রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবীতে আন্দোলন করত। যা হোক, আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্ব রূপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে উদারনীতিবাদের (Liberalism) আবির্ভাব ঘটে। পরবর্তীকালে ইউরোপে, ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোতে এবং বিশ্বের নানাপ্রান্তে উদারনৈতিক দল ও চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ায় এই তত্ত্বের বিস্তৃতি ঘটে।

১.০২ উদারনীতিক রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভব (Emergence of Liberal Political Thinking)

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে উদারনীতিক রাজনৈতিক চিন্তার উদ্ভব ঘটে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীসে গণতান্ত্রিক আথেন্স ও কর্তৃত্ববাদী স্পার্টার মধ্যে সংঘটিত পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধের (৪৩১-৪০৪ খৃঃ পূর্বাব্দ) প্রাক্-মুহূর্তে প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্র আথেন্সে মুক্ত রাজনৈতিক জীবনের জন্য

তীব্র আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। উদারনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম উন্মেষ লক্ষিত হয় প্রাচীন গ্রীসে প্রোটাগোরাস সহ সফিস্ট চিন্তকদের বিতর্কের মধ্যে এবং পরবর্তীতে আরও আথেন্সের বিখ্যাত রাষ্ট্রনেতা পেরিক্লেস (আনুমানিক ৪৯৫-৪২৯ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)-এর মধ্যে। তাঁরা ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীন চিন্তা সমর্থন করেন। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (আনুমানিক ৪২৭-৩৪৭ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) এবং তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল (আনুমানিক ৩৮৪-৩২২ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) এই প্রকার উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেন। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিকস' (Politics) গ্রন্থে ব্যক্তির 'অধিকার' সম্পর্কে মৌনতা অবলম্বন করেন যদিও তাঁর 'এথিকস' (Ethics) গ্রন্থে মানুষের স্বাভাবিক অধিকারের (Natural Right) এক অস্পষ্ট স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়।

রোমান যুগে, উদারনৈতিকতাবাদ সমর্থন লাভ করে রোমান দার্শনিক সিসেরো-এর (১০৬-৪৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দ) থেকে। অনেকে সিসেরোকে উদারনৈতিকতাবাদের জনক বলে গণ্য করেন। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্য খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি কোনও শ্রদ্ধার মনোভাব দেখা যায় নি। মধ্যযুগে পরিবার ও এস্টেট মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃত হয়।

পশ্চিম ইউরোপে প্রথমে সংস্কার (Reformation) আন্দোলন (১৫১৭-৬৩) এবং পরে ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) মধ্যবর্তী সময়ে ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ এক নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই শ্রেণী আইনশাস্ত্রে সামন্ততান্ত্রিক ধারণা 'স্ট্যাটাস' এর পরিবর্তে 'চুক্তি' (contract) ধারণা আনয়ন করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যাঙ্কমালিক, ব্যবসায়ী এবং শিল্পোৎপাদনকারীদের নিয়ে এই শ্রেণী গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানসংক্রান্ত জ্ঞান এই বিরাট সামাজিক পরিবর্তনে সাহায্য করে এবং এর ফলস্বরূপ পশ্চিম ইউরোপে 'বুর্জোয়া' শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। কালক্রমে বুর্জোয়া শ্রেণীর রাজনৈতিক চিন্তা উদারনীতিবাদ (Liberalism) রূপে গণ্য হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী সরাসরি সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার আধিপত্য এবং সামাজিক সম্পদের বন্টন ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব 'অধিকার' দাবী করে।

উদারনীতিবাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ একদিনে গড়ে ওঠেনি। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপে ধীর গতিতে এই তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। দুই শতাব্দীর অধিককাল ধরে এই তত্ত্বের বিকাশে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অবদান পরিলক্ষিত হয়। উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ হলেন ঃ মেকিয়াভেলী (১৪৬৭—১৫২৭), মার্টিন লুথার (১৪৮৩—১৫৬৪), কোপারনিকাস (১৪৭৩—১৫৪৩), টমাস মোর (১৪৭৮—১৫৩৫), জন ক্যালভিন (১৫০৯—১৫৬৪), জাঁ বোঁদা (১৫৩০—১৫৯৬), ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১—১৬২৮), কার্ডিনাল রিশলু (১৫৮৫—১৬২৪), টমাস হবস (১৫৮৮—১৬৭৯), স্পিনোজা (১৬৩২—১৬৭৭)।

সামন্ততন্ত্রের অবসানের এবং পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশের ফসল উদারনীতিবাদ। উদারনীতিবাদের সংগে পুঁজিবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রারম্ভিক স্তরে বুর্জোয়া শ্রেণীর আকাঙ্খা এই মতবাদে প্রতিফলিত হয়।

শুরুতে এই মতবাদ লেজে ফেয়ার (Laissez-faire) নীতি বা অবাধ বাণিজ্যনীতিকে সমর্থন করে এবং সকল রকম সরকারী হস্তক্ষেপের নিন্দা করে। পরবর্তীতে উদারনীতিবাদ সীমিত শাসন, সাংবিধানিকতাবাদ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের পক্ষে ওকালতি করে।

১.০৩ উদারনীতিবাদের পূর্বসূরীগণ ঃ (Precursors of Liberalism)

সুসংহত রাজনৈতিক মতবাদরূপে উদাবনীতিবাদের প্রকাশ ঘটে জনলক-এর চিন্তাধারায়। কিন্তু দুজন দার্শনিক, যথাক্রমে টমাস হবস ও স্পিনোজ তার ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, এঁরা দুজন কেউই উদারনীতিক দার্শনিক ছিলেন না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, অজ্ঞতা এবং দাসত্ব মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতা অর্জন করা ও ভোগ করার ইচ্ছা মানুষের মধ্যে তেমনভাবে দেখা যায় না। তাঁদের নিকট মানুষ প্রধানতঃ স্বার্থপর, আবেগতাড়িত, লোভী, অজ্ঞ। এই কারণে হবস ও স্পিনোজাকে উদারনীতিবাদের অগ্রদূত বলে গণ্য করা হয়।

ইংরেজ দার্শনিক টমাস হবস (১৫৮৮—১৬৭৯) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ লেভিয়াথান (১৬৫১)-এ এই যুক্তি দেন যে, ব্যক্তিকে তার নিজের কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ব্যক্তি তাঁর ক্ষমতা সমর্পণের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন করতে সম্মত হয়েছিল, কারণ এর বিকল্পটি ছিল নৈরাজ্য। হবসের যুক্তি মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নির্মিত। তিনি জনমঙ্গলের যুক্তিকে ব্যবহার করেন নি।

হবসের ব্যক্তি সম্পূর্ণ আধুনিক। তাঁর নিকট সামাজিক অন্যায় সমাধানে যে কোনোরকম সমষ্টিগত ক্রিয়া অপেক্ষা আত্মস্বার্থ (self-interest) বেশী গ্রহণযোগ্য। জর্জ স্যাবাইন মন্তব্য করেন যে, সার্বভৌমের চরম ক্ষমতা "তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রয়োজনীয় উপাদান।" যে যুগে অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে সনাতন সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ ভেঙ্গে পড়ছে এবং জনগণ মনুষ্যসৃষ্ট আইন কর্তক শাসিত হতে আগ্রহী সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এই তত্ত্ব খুবই স্বাভাবিক। এই প্রবণতা আইনগত ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটায় এবং জীবনের আধিপত্যকারী উদ্দেশ্যরূপে আত্মস্বার্থের স্বীকৃতি সনাতনী উদারনীতিবাদের ভিত্তি প্রস্তুতে সাহায্য করে।

হবসের মতো, সেই সময়কার ওলন্দাজ দার্শনিক বারুখ স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭)-কে উদারনীতিবাদের পূর্বসূরী রূপে গণ্য করা যায়। তিনি তাঁর নৈতিকতাকে স্বতঃসিদ্ধ বক্তব্য হিসাবে উপস্থিথ করেন যা সহজ, স্পষ্ট এবং স্বতঃসিদ্ধতার ভাষায় প্রকাশ পায়। স্বতঃসিদ্ধ বক্তব্যকে যুক্তিবাদী অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবহার করেন বাস্তবতার চরিত্র ব্যাখ্যা করার জন্য। তাঁর *Ethics* ও *Political Treatise* দুইটি গ্রন্থই ১৬৭৭ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। তিনি যৌক্তিকতার সাথে প্রাকৃতিক আইনের স্বপক্ষে তাঁর মত ব্যক্ত করেন। স্পিনোজা তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বে এই মত ব্যক্ত করেন যে, বলশালী সরকার সু-শাসনে (Good Government) পরিণত হয়। যখন জোরদার যুক্তিবাহী ভাষায় প্রাকৃতিক অধিকার এবং তার ব্যবহারিক

প্রয়োগে ব্যবহার করা হয়। তিনি ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি সেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন যা ব্যক্তির স্বাধীন মত, স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীনভাবে সংগঠিত হওয়ার অধিকারকে রক্ষা করে। হবসের তুলনায় স্পিনোজা উদারনীতিক রাজনীতির বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু হবস ও স্পিনোজা কেউ পুরোমাত্রায় উদারনীতিক দার্শনিক ছিলেন না। মানুষের পক্ষে সীমাহীন প্রগতির পক্ষে যাওয়া সম্ভব কিনা এই নিয়ে তাঁরা সংশয় প্রকাশ করেন। এই কারণে তাঁদের উদারনীতিক রাজনীতির উদ্‌গাতা না বলে পথিকৃৎ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

১.০৪ উদারনীতিবাদ ঃ পটভূমি ও ঐতিহ্য (Liberalism : Background and Heritage)

উদারনীতিক চিন্তা এবং প্রয়োগ দুটি প্রাথমিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ঃ প্রথমটি কতৃত্ববাদের বিরোধিতা করা, আর দ্বিতীয়টি স্বাধীনতার নীতির উপস্থিতি। উদারনীতিক চিন্তার বির্বতনে এই দুটি বিষয়কে একইসাথে সমভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বস্তুতঃ আদি উদারনীতিকতাবাদীরা এই দুটি বিষয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা করেছেন।

আদি উদারনীতিকতাবাদীরা বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতার দাবীর বিষয়টি জোরের সঙ্গে উল্লেখ করেন। আদি উদার নীতিকতাবাদীদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ, সংশয়বাদী এবং এমনকি ধর্মবিরোধী ব্যক্তিরা ছিলেন। উদারনীতিকতাবাদ আইনের শাসন এবং বাজারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। উদারনীতিবাদীরা সাধারণতঃ ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগত স্বাধীনতা, সম্মতি, বিশ্বাস করানো ইত্যাদির সমর্থন করেন। তাঁরা অভিজাততান্ত্রিক সুযোগসুবিধা বিলোপের পক্ষে ছিলেন। তাঁরা যুক্তিসংগত নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আইনের শাসন স্থাপনের পক্ষে ছিলেন। তাঁরা কর্মদ্যোগী ব্যক্তিবর্গের নিকট সুযোগসুবিধা সম্প্রসারণের পক্ষে ছিলেন।

উদারনীতিকতাবাদ এক বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী। এই সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য হল ধর্ম, রোমান আইন, সাংবিধানিকতাবাদ, নৃতাত্ত্বিক সংস্কৃতি (ethnmic culture) এবং নাগরিকতা ধারণা। ইউরোপে নবজাগরণ ও ধর্ম সংস্কারের সুমহান ঐতিহ্য উদারনৈতিকতাবাদের ধারণাকে সমৃদ্ধ করে। ধর্মযাজক ও গীর্জার উপর ব্যক্তির যে নির্ভরতা ছিল উদারনৈতিকতাবাদ তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং একই সাথে ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে উদ্ভূত জনপ্রিয় ধারণা ব্যক্তির সংগে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ যোগযোগ তাকে উদারনীতিকতাবাদ বহন করে। সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় তা উদারনৈতিকতাবাদের উত্থানে সাহায্য করে। অভিজাত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ক্ষয় এবং আইনজ্ঞ, ব্যবসায়ী, বিদ্বান ও বৈজ্ঞানিকদের মতো নতুন সামাজিক শ্রেণীর উত্থান উদারনীতিক ধারণা উদ্ভবে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। অভিজাত ও সাধারণের মধ্যে নতুন সামাজিক সম্পর্ক তৈরী হয়।

উদারনৈতিক ধারণা উদ্ভবে আত্মসচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান গুরুত্বপূর্ণ উপাদানরূপে বিবেচিত হয়। নতুন ধরণের সম্পত্তি সম্পর্ক এবং সংশোধিত আইনগত ধারণা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর উদ্যোগের ক্ষেত্রে সুযোগ ও উৎসাহ সৃষ্টি করে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও অষ্টাদশ শতাব্দী জুড়ে আর্থ-সামাজিক অভিজাত শ্রেণীর আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গীর দ্রুত বিস্তৃতি উদারনৈতিকতাবাদের বিকাশের গুরুত্বকে প্রমাণ করে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে উদারনীতিবাদকে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রবণতচা, সামাজিক আন্দোলন এবং ব্যক্তির উচ্চাশা ও নিজস্ব সামার্থের উপর বিশ্বাস বলা যায়। এইগুলির মিলিত ফলস্বরূপ ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ উদারনৈতিক মতবাদ গড়ে ওঠে।

১.০৫ ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ (Classical Liberalism)

ইংল্যান্ডে ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লব (বা রক্তপাতহীন বিপ্লব) ও ১৮৭৬ সালের সংস্কার আইনের মধ্যবর্তী সময়ে তত্ত্ব ও রাজনৈতিক কর্মসূচীরূপে উদারনৈতিকবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। ইংল্যান্ডে এই পর্যায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রে 'ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ' শব্দটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। ১৬৪৯ সালে সংঘটিত 'পিউরিটান বিপ্লব'-এর মাধ্যমে ইংল্যান্ড এক মারাত্মক গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। রাজা প্রথম চার্লসের শিরচ্ছেদ করা হয় এবং সামরিক নেতা অলিভার ক্রমওয়েলের হাতে সরকারী শাসনক্ষমতা অর্পিত হয়। তিনি ১৬৫১ সালে প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে কমনওয়েলথ স্থাপিত করেন। এই প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থা মাত্র ১০ বছর টিকে ছিল। কিন্তু নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ববাদের চেতনা অত্যন্ত গোপনে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। ১৬৬০ সালে রাজা প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস ইংল্যান্ডের সিংহাসনে আরোহণ করলে রাজতন্ত্র ইংল্যান্ডে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। দ্বিতীয় চার্লস ১৬৮৫ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তাঁর পরবর্তীতে তাঁর ভাই দ্বিতীয় জেমস সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৮৮ সালে হুইগ ও টোরীদের সম্মিলিত বিরোধিতায় তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়। উদীয়মান বণিক শ্রেণী হুইগ গোষ্ঠী ভূস্বামী অভিজাত শ্রেণী টোরী গোষ্ঠীর একাংশের সংগে সহযোগিতার মাধ্যমে 'গৌরবময় বিপ্লব' সংঘটিত করে। এই বিপ্লবের বিষয়গুলি ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সহনশীলতা, সাংবিধানিকতা এবং শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার সমূহ। ১৬৮৮ সালের বিপ্লব, যা ছিল ইতিহাসে প্রথম উদারনৈতিক বিপ্লব, সপ্তদশ শতকের উদারপন্থী বিষয়গুলিকে সুসংহত করে এবং নির্দ্দিষ্ট সাংবিধানিক আকার দান করে। ১৬৮৮-৮৯ সালের স্বীকৃত উদারপন্থা ছিল মূলতঃ নেতিবাচক প্রকৃতির, কারণ এই উদারপন্থা গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবর্গকে তাঁদের সরকারকে রাজতন্ত্রের বিশেষাধিকারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দান করে। এছাড়া, এই বিপ্লব অর্থনৈতিক লক্ষ্যের তুলনায় রাজনৈতিক লক্ষ্যগুলিকে অধিকতর মাত্রায় গুরুত্ব দিতে সক্ষম হয়। এই রাজনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পার্লামেন্টের অধিকারসমূহ ও আইনের শাসন। ১৬৮৯ সালের বন্দোবস্ত

(Act of Settlement) আইনের মাধ্যমে ধর্মীয় সহনশীলতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পৌর স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দান করা হয়।

ইংরেজ দার্শনিক জন লক (১৬৩২—১৭০৪), যিনি ইংল্যান্ডের রাজনীতির তাৎপর্য্যপূর্ণ রূপান্তর প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং যাঁর সংগে গুরুত্বপূর্ণ হুইগ নেতাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, তিনি তাঁর Second Treatise of Government (1690) গ্রন্থে 'গৌরবময় বিপ্লবের' প্রতি সম্পূর্ণ দার্শনিক সমর্থন জানান। লক-এর নিকট মানুষ যুক্তিবাদী প্রাণী, পরিশ্রমী, উদ্যোগী, মুক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী, বুদ্ধিমান এবং শান্তিপ্রিয় রূপে প্রতিভাত হয়। তাঁর সামাজিক চুক্তি এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কিত বিবরণে মানুষের জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকারের উপর গুরুত্ব প্রদানের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। এই অধিকারগুলির মধ্যে তিনি সম্পত্তির অধিকারকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার রূপে গণ্য করেন। কারণ এই অধিকার ব্যতিরেকে জীবনের অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকারকে ভোগ করাও যায় না এবং রক্ষা করাও যায় না।

লকের তত্ত্বে, উদারনৈতিকতাবাদের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল ঃ (ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা; (খ) শাসিতের সম্পত্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সীমায়িত এবং দায়িত্বশীল সরকার; (গ) ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার। যদিও লক-কে একজন প্রগতিশীল দার্শনিক ও গণতান্ত্রিক বলে প্রশংসা করা হয় কিন্তু একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, গণতান্ত্রিক সরকার সম্পর্কে লক-এর ধারণা সাম্প্রতিকালের ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। কারণ লকের সময় সর্বজনীন ভোটাধিকারের ধারণা ছিল অচিন্তনীয়। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে কেবলমাত্র সম্পত্তির মালিকদের রাজনৈতিক স্বর পরিলক্ষিত হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলী ছিল অত্যন্ত সীমিত। যা হোক, লক ছিলেন 'সীমায়িত' সরকারের প্রবক্তা।

সাংবিধানিক বন্দোবস্ত ও সামাজিক শান্তি ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। স্কটিশ উদারনীতিক অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩—১৭৯০) অবাধ বাণিজ্যের নীতি, আত্মনিয়ন্ত্রণকারী বাজার, একচেটিয়া অথবা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে তাঁর তত্ত্ব নির্মাণ করেন। উদারনীতিবাদকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদগণ ব্যাপকভাবে তাঁদের মত ব্যক্ত করেন। তাঁরা উদারনৈতিকতা মূল্যবোধের সম্প্রসারণ ঘটান। অ্যাডাম স্মিথের প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural liberty) ছিল এমন একটা 'পদ্ধতি' যা মানুষকে তার নিজের ও সাধারণের সুবিধা বৃদ্ধির স্বার্থে স্বউদ্যোগে নিয়োজিত করার অনুমতি প্রদান করে।

ইংরেজ উপযোগিতাবাদীগণ এবং তাঁদের রাজনৈতিক মিত্রবর্গ ধ্রুপদী উদারনৈতিকতাবাদের অট্টালিকাটি সম্পূর্ণ করেন। জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮—১৮৩২) এবং জেমস মিল (১৭৭৩—১৮৩৬) বাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করেন। তাঁরা ১৬৮৯ সালের উদারনৈতিকতাবাদের উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করেন কিন্তু পদ্ধতিকে নয়। তাঁরা রাজনীতি এবং শাসনতান্ত্রিকতাবাদের কাজে উপযোগিতা ও বাজারের ধারণাকে

প্রয়োগ করেন। তাঁরা "সর্বাধিক সংখ্যকের সর্বাধিক সুখের" ("the greatest happiness of the greatest number") ধারণা প্রচার করেন। রাজনীতি ও আইনের ক্ষেত্রে তাঁরা সাধারণ নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন যা সর্বাধিক অবাধ পছন্দ ও ব্যবহারিক স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে। এই সর্বাধিক অবাধ পছন্দ ও ব্যবহারিক স্বাধীনতার বিষয়টি তাঁদের মতে সাধারণ উপযোগী নিয়মের সংগে সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

বেন্থাম এবং জেমস মিল যুক্তি দেন যে, কেবলমাত্র শিক্ষা এবং বাক স্বাধীনতা, প্রতিনিধিত্ব ও সম্প্রসারিত ভোটাধিকার এবং শাসিতের প্রতি সরকারের নিয়মিত দায়বদ্ধতার মাধ্যমে সাংবিধানিক নিরাপত্তা ও সুশাসন নিশ্চিত করা যেতে পারে। এই লক্ষ্যপূরণের নিমিত্তে, তাঁরা চেয়েছিলেন যে, মুক্ত অর্থনীতির আদলে রাজনীতিকে সংগঠিত করা হউক। উপযোগিতাবাদী দার্শনিকেরা রাজনৈতিক উদারবাদের দার্শনিক ভিত্তি প্রস্তুত করেন। যথার্থ অর্থে বলা যায় যে, উপযোগিতাবাদ প্রথম উদারনীতিবাদের ব্যাপক রপ দেওয়ার চেষ্টা করেন যা ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটেনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের তিনটি ঐতিহ্যকে চিহ্নিত করা যায়। সেগুলি হল ঃ সাংবিধানিকতাবাদ, অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদ এবং উপযোগিতাবাদ। উদারনীতিবাদের এই সকল ভাষ্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায়ে গড়ে ওঠে এবং ব্রিটিশ সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিকট একটি আবেদন নিয়ে হাজির হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে উদারনীতিবাদ ব্যাপক জনপ্রিয় আবেদন নিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের সুস্পষ্ট মতাদর্শরূপে গড়ে ওঠে যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগ পর্যন্ত উদারনৈতিক দল রক্ষা করে। ১৮৪০-এর দশকে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে, উদাহরণস্বরূপ শস্য আইন বিক্ষোভ, উদারনৈতিক দল ব্যাপকতম জন সমর্থন লাভ করে। এই দলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কবডেন, ব্রাইট, উপযোগিতাবাদীগণ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী, ও শ্রমিকশ্রেণীর এক অংশ। এই সময়ে ইংল্যান্ডে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে সরকারের অ-হস্তক্ষেপ এবং ভোটাধিকারের বিস্তৃতি এই দুই প্রতিযোগী কার্যক্রমের মধ্যে উদারনীতিবাদ এক ধরনের সংশ্লেষ (সিনথেসিস) ঘটাতে সক্ষম হয়। এই মৈত্রী সম্ভবতঃ পুরোনো উদারনীতিবাদের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে।

বিশেষ করে ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক তত্ত্বরূপে উদারনীতিবাদ ব্যাপক জন সমর্থন পায় কারণ, এইরকম মতাদর্শের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, যথা ব্যাপক উদারনৈতিক আন্দোলন ও শক্তিশালী উদারনৈতিক দল, কেবলমাত্র ইংল্যান্ডে বিরাজ করত। ইউরোপ মহাদেশে কোনো বিস্তৃত উদারনৈতিক আন্দোলন দেখা যায় না এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো শক্তিশালী উদারনৈতিক দলের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ইউরোপীয় উদারনৈতিকতাবাদ দুটি কারণে খণ্ডিত ও গোষ্ঠী ভিত্তিক হয়ে পড়ে। একটি কারণ হল ইউরোপের দেশগুলিতে প্রায়শঃই সামাজিক ও ধর্মীয় দাঙ্গা সংঘটিত হতো এবং দ্বিতীয়তঃ সেখানে বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশের গতি ছিল শ্লথ। জার্মানী ও ফ্রান্সে উদারনীতিবাদের শক্তি নানাভাবে বাধার সম্মুখীন হয়। ইউরোপীয় উদানীতির এক ধরণের রূপ ছিল অভিজাততান্ত্রিক, যা শুধু ব্যক্তি স্বাধীনতা দাবী করেনি, তার সঙ্গে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর, ব্যবসায়ী সংগঠনের এবং সামাজিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধাগুলিকে (privileges) সমর্থন করত। ফ্রান্সে এই অভিজাত উদারনীতির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন চালর্স লুই মঁতেস্ক্যু (Charles Louis Montesquieu) (১৬৮৯-১৭৫৫)। তিনি চার্চে এবং সরকারী প্রসাসনে কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবী করেছেন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ The Spirit of the Laws (১৭৪৮)-এ তিনি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর (Localities) এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলির প্রতি সহনশীলতার নীতি গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

পরবর্তীকালে যুক্তিভিত্তিক এবং উপযোগিতা উদারনীতিবাদ ফ্রান্সে এবং জার্মানীতে বিকশিত হয়। ফ্রান্সে দার্শনিক গোষ্ঠী (Philosophes) এবং জার্ম্মানীতে গেটে (Goethe) এবং হারডার (Herder)-এর বক্তব্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, স্বাধীনতা স্পৃহা, যুক্তিভিত্তিক আইন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথা শোনা যায়। মহাদেশীয় উদানীতিবাদীদের অনেকের পছন্দ ছিল এক ধরণের কর্তৃত্ববাদী শাসন যা মানুষের স্বার্থরক্ষা করবে। তাঁরা এর নাম দেন enlightened despotism যা জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় আইনি ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করবে। দেখা যাচ্ছে, ইউরোপীয় উদারনীতিবাদ নিজের মধ্যেই বিভিন্ন ধরণের মতের সহাবস্থান মেনেই গড়ে ওঠে। কেননা, ফ্রান্সে রুশো, জার্ম্মানিতে ফিক্‌টে (Fichte) এবং ইটালিতে মাৎসিনী (Mazzini) মতো দার্শনিকদের চিন্তায় এক ধরণের অস্পষ্ট উদারনীতিবাদের লক্ষণ দেখা যায়। ইউরোপীয় উদারনীতিক শিবিরের মধ্যেই এই অন্তর্দন্দ্বের সুযোগ নিয়েই ফ্রান্সে নেপোলিয়ন এবং জার্ম্মানিতে বিসমার্ক তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের পর থেকে ইউরোপ উদারনীতির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে শুরু করে কিন্তু তখন "ধ্রুপদী উদারনীতি" সার্বিকভাবে গ্রহণকরার সময় চলে গেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও প্রশাসনে নাগরিকদের অংশগ্রহণের দাবী শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদ নতুন মতাদর্শ হিসেবে উঠে আসতে আরম্ভ করে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কোন কালেই "ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ" পুরোপুরি গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আমেরিকার বিপ্লব (১৭৭৬), সাংবিধানিক কনভেনশন (১৭৮৭) এবং আমেরিকার নিজস্ব আইন শাস্ত্রের (Jurisprudenee) উদ্ভব আমেরিকার নিজস্ব রাজনীতিক ঐতিহ্য গড়ে তোলে। বিশেষ মতাদর্শ হিসেবে "ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ" সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, যদিও আমেরিকার লিখিত সংবিধানে জন লক-এর বক্তব্য কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু একই সঙ্গে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি আমেরিকার সমর্থন প্রথম থেকেই খুব স্পষ্ট ছিল। গণতন্ত্র ও সাম্যের নীতি নিয়ে জেফারসন এবং জ্যাকসনের মতাদর্শের মধ্যে উদারনীতির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কিন্তু তা ইউরোপীয় উদারনীতির অন্ধ অনুকরণ ছিল না।

১.০৬ ধ্রুপদী উদারনীতিদের পরিমার্জন (Revision of Classical Liberalism)

জেমস মিল-এর পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬—১৮৭৩) তাঁর পিতার মৃত্যুর (১৮৩৬) পর নিজেকে বেন্থাম ও তাঁর পিতার বৌদ্ধিক আধিপত্যের থেকে মুক্ত করেন। পরবর্তী তিন দশকে জন স্টুয়ার্ট মিল সময়ের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের তাগিদে নিজের বৌদ্ধিক ভাবনার নতুন রূপ দেন।

প্রসঙ্গতঃ এটা মনে করার মতো বিষয় যে, জন স্টুয়ার্ট মিল ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজের রোমান্টিকতায় প্রভাবিত হয়ে বেন্থমীয় উপযোগবাদের পথ থেকে কিছুটা সরে আসেন। ফরাসী রাজনৈতিক দার্শনিক আলেক্স ডি. তকভিলের দ্বারাও মিল প্রভাবিত হয়েছিলেন। তকভিল ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অপূর্ণতার দিকটি উল্লেখ করেন। এডমন্ড বার্ক এবং টকভিল উভয়ের বক্তব্য মিলের নিকট একটি বিষয় স্পষ্ট করে দেয়। সেটি হল বেন্থাম ও তাঁর অনুগামীগণের ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের কঠোর যুক্তিবাদী ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রেক্ষিতের অপূর্ণতা।

রাষ্ট্রদর্শন হিসেবে উদারনীতিবাদের বিকাশে জন স্টুয়ার্ট মিলের অন্যান্য অবদান হল ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের অন্তর্নিহিত ধারণাগুলির পবিমার্জন সাধন। মার্কিন উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণে তকভিল আগ্রহী ছিলেন। অপরদিকে মিল সম্ভবতঃ উদারনীতিবাদের দার্শনিক বৈধতার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। মিল তাঁর **Utilitarianism** (১৮৫৯) গ্রন্থে বেন্থামের উপযোগিতা নীতিকে এমনভাবে পরিমার্জিত করেন যা তার অস্তিত্বকে যেন বিলোপ করে। মিল সুখ নিরূপণ গুণগত মাত্রার সাথে সাথে পরিমাণগত মাত্রার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর **'On Liberty'** (১৮৫৯) দীর্ঘ প্রবন্ধে মিল উদারনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার স্পষ্ট করেন। ব্যক্তির জীবনে রাষ্ট্রিক প্রশাসনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মিল যুক্তি দেন। তিনি মনে করেন যে, অত্যধিক সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে সর্বশক্তিমান সরকার এবং একই সাথে কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রর বিপদ অত্যধিক পরিমাণে বেড়ে যায়।

তাঁর **Considerations on Representative Government** (১৮৬১) গ্রন্থে মিল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে রক্ষাকবচ রূপে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (proportional representation) ও ব্যক্তি ভেদে একাধিক ভোটের (plural voting) কথা বলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক উত্থাপিত দাবীসমূহ মানিয়ে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর ভোটাধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করেন। তাঁর জীবনের শেষভাগে নতুন গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে নারীর অধীনতার অবসান এবং ক্ষমতায়নের যে আন্দোলন শুরু হয় মিল তাকে সমর্থন করেন। এর পূর্বে তাঁর Principles of Political Economy (১৮৪৮) গ্রন্থে মিল জাতীয় সম্পদের বন্টনব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁর এই ধরণের চিন্তা ব্যক্ত করেন। তাঁর সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁকে 'transitional thinker' বলে গণ্য

করা হয়। তিনি ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ ও আধুনিক উদারনীতিবাদের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজটি আরম্ভ করেন। উদীয়মান গণসমাজের (mass society) চাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শের কারণে অনেকে মিল-কে ('aristocratic democrat') বলে গণ্য করেন। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল যে, যথোপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে যদি জনগণের বৌদ্ধিক ও নৈতিক স্তর উন্নত না করা যায় তাহলে উদারনীতিক গণতন্ত্র বিপন্ন হবে।

ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ ও উপযোগিতাবাদের চূড়ান্ত ছেদ ঘটান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টমাস হিল গ্রীন (১৮৩৬—১৮৮২)। গ্রীনের অনুগামীদের 'অক্সফোর্ড ভাববাদী' (Oxford Idealist) বলে অভিহিত করা হয়। গ্রীন এবং তাঁর সমর্থকরা মনস্তাত্ত্বিক ও নীতিশাস্ত্রর আবেষ্টনী থেকে উদারপন্থী চিন্তাকে মুক্ত করেছিলেন। গ্রীন আদ্যন্ত একজন উদারপন্থী ছিলেন কারণ তাঁর মূল অভিমুখ ছিল রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তি। গ্রীন চেয়েছিলেন ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে রাষ্ট্র ইতিবাচক ভূমিকা পালন করুক। লিওনার্দ টি. হবহাউস (১৮৬৪—১৯২৯), যিনি ব্রিটেনে ('social liberalism') তত্ত্ব উদ্ভবের পুরোধা ছিলেন সামাজিক উদারনীতি এবং 'গ্রীন ও মিলের উদারনৈতিক তত্ত্বের সমন্বয় সাধন করেন। তিনি ন্যায়নীতিসঙ্গত বন্টন ও সামাজিক সম্প্রীতি ধারণার অবতারণা করেন। তিনি সকল নাগরিকবৃন্দের প্রয়োজনীয় সমৃদ্ধির জন্য সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার সমর্থক ছিলেন। এই বিষয়টি বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় উদারনৈতিক সমাজের ক্ষেত্রে আবশ্যিক শর্তরূপে গণ্য হয়। তিনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জন মঙ্গল হল একে অন্যের পরিপূরক। এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান ব্যক্তি ছিলেন John Dewey যিনি মূলতঃ গ্রীনের মতো একই সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শসমূহের প্রবক্তা ছিলেন।

১.০৭ গ্রন্থসূচী

১. Harold J. Laski,	*The Rise of European Liberalism : An Essay in Interpretation* (1936) 1958.
২. Leonard T. Hobbhouse,	*Liberalism* (1911) 1945.
৩. Frederik Watkins,	*The Political Tradition of the West : A study in the Development of Modern Liberalism* (1948).
৪. Adam Swift,	*Political Philosophy* (2001).
৫. Brian R. Nelson,	*Western Political Thought* (Indian Publication, 2009).
৬. John Gray,	*Liberalism.*
৭. G. H. Sabine,	*A History of Political Theory.*

৮. D. Johmston, *The Idea of Liberal Theory : A Critique and Reconstruction.*

৯. William Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy.*

১.০৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নসমূহ ঃ

১। রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে উদারনীতিবাদের মূল বক্তব্য উল্লেখ করো?

২। উদারনীতিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৩। হবস্ ও স্পিনোজাকে উদারনীতিবাদের পূর্বসূরী বলা হয় কেন?

৪। জনলক-এর তত্ত্বে উদারনীতিবাদের যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি উল্লেখ কর।

৫। উদারনীতিবাদ তত্ত্বের বিকাশে যে সকল ব্যক্তির অবদান লক্ষ্য করা যায় তাঁদের নাম লেখ।

৬। টমাস হবস্, জন লক, জন স্টুয়ার্ট মিলের লিখিত গ্রন্থের নাম উল্লেখ কর।

৭। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের বিকাশে বেন্থাম-এর গুরুত্ব সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করো।

৮। জন স্টুয়ার্ট মিল কোন কোন বিষয়ে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের পরিমার্জনা করেন সেগুলি উল্লেখ কর।

৯। টমাস হিল গ্রীন-এর মৌলিক বক্তব্য সূত্রাকারে নির্দ্দেশ কর।

১০। হব্হাউস-কে কি কারণে ধ্রুপদী উদারনীতির অন্যতম পরিমার্জক হিসেবে গণ্য করা হয়?

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নসমূহ ঃ

১। কীভাবে উদারনৈতিক চিন্তার উদ্ভব ঘটে তা বিস্তারিত আলোচনা করো।

২। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের তাত্ত্বিক জনক বলা হয় কাকে? কোন প্রেক্ষিতে তিনি ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ তত্ত্ব গড়ে তোলেন?

৩। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদে বেন্থাম ও জন স্টুয়ার্ট মিলের অবদান আলোচনা কর।

৪। কাঁদের দ্বারা এবং কোন্ কারণে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের পরিমার্জন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তা সবিস্তারে আলোচনা কর।

৫। কেন ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ ইউরোপ মহাদেশীয় দেশগুলিতে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শক্ত শিকড় গড়ে তুলতে পারেনি তা ব্যাখ্যা করো।

একক—২ ❑ উদারনীতিক কল্যাণবাদ ঃ জন রলস্ (Liberal Welfarism : John Rawls)

গঠন

২.০১ ভূমিকা

২.০২ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের মতাদর্শ

২.০৩ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের সংকট

২.০৪ রলস্-এর ন্যায়নীতি তত্ত্ব

২.০৫ রলসীয় কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র

২.০৬ গ্রন্থসূচী

২.০৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে :

(১) এই এককটি পাঠের মাধ্যমে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায় ও তার মতাদর্শ সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো।

(২) কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে কিকরে সংকট দেখা দেয় তার সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।

(৩) আমেরিকান দার্শনিক জন রলস্ উদারনৈতিক দর্শনে কিভাবে তাঁর ন্যায়নীতিতত্ত্ব গড়ে তোলেন এবং রলসের ন্যায়নীতিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়সমূহ আমরা এই একক পাঠের মাধ্যমে জানতে পারবো।

(৪) রলসের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের এক সংক্ষিপ্ত রূপরেখার পরিচয় ঘটবে এই একক পাঠের মাধ্যমে।

২.০১ ভূমিকা (Introduction)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে টি. এইচ. গ্রীনের সংশোধিত উদারনীতিবাদের সুসংবদ্ধ প্রকাশ পরিলক্ষিত

হয় এল. টি. হবহাউসের উদারনৈতিক আদর্শের চিন্তায়। হবহাউস বন্টনগত ন্যায় ও সামাজিক সম্প্রীতির ধারণার সংগে প্রাকৃতিক স্বাধীনতার প্রাচীন ধারণাকে সমর্থন করেন। সাধারণভাবে জনগণের উন্নতিকল্পে সরকারের হস্তক্ষেপকে তিনি সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন যে, সরকার ঘোষিত কল্যাণকর পদক্ষেপ উদারনৈতিকতা তত্ত্বে সুযোগের সমতার আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে। এটা স্পষ্ট যে, জন লক এবং জন স্টুয়ার্ট মিল যে উদারনৈতিক ব্যবস্থার পথপ্রদর্শক ছিলেন তা ক্রমশঃ তার আকর্ষণ হারিয়ে ফেলতে লাগল। উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকে তিরিশের দশকের প্রথমভাগে, 'বিশাল আর্থিক মন্দা (Great Depresion) 'কে মোকাবিলা করার জন্য উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস এবং উইলিয়াম বেভারিজ সাবেকী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ১৯৩০-এর উদারনৈতিকতাবাদ সমষ্টিগত ক্রিয়া, ব্যক্তি এবং পশ্চাদপদ গোষ্ঠীর সাহায্যার্থে রাষ্ট্রের উদ্যোগের কথা প্রচার করে। গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অনেক কর্মসূচী উদারনীতিবাদ গ্রহণ করে। এইভাবে উদারনীতিবাদীরা এই দাবীতে সোচ্চার হন যে, উদারনৈতিকতাবাদের মূল নীতি রূপে ব্যক্তির প্রাধান্যকে তারা রক্ষা করেছেন।

কৌশল ও পদ্ধতির এই পরিবর্তনকে উদারনৈতিকতাবাদে সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের সংগে সনাক্ত করা যেতে পারে। এটা কেবলমাত্র স্বেচ্ছাচারি হ্রাস করে না, এটা ব্যক্তির স্বাধীন পছন্দের সুযোগ, বন্টনের সমতা, স্বাধীনতা ভোগের সুযোগের বিস্তৃতি ঘটায়। এই মিশ্র আর্থিক ব্যবস্থায় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, প্রশাসনিক রাষ্ট্র, সাংবিধানিক অধিকার ও আইনের শাসন শুধুমাত্র টিকে থাকে না তা অধিক শক্তিশালী হয়। এই মিশ্র আর্থিক ব্যবস্থায় কেবলমাত্র একটি গোষ্ঠী বা সামাজিক শ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্র একটি যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত না, বরং তা সকল সামাজিক শ্রেণীর প্রতি দায়বদ্ধ থাকে।

কোনো সন্দেহ নেই যে, যুদ্ধ পরবর্তী উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রের বল প্রয়োগের ক্ষমতাকে আহ্বান করে। রাষ্ট্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে এটা বলা যায় যে, কিছুক্ষেত্রে মানুষ যা ইচ্ছা করে তা করার ক্ষেত্রে কম স্বাধীন ছিল। জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের মতাদর্শ ও কার্যের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মানুষের কাছে বিকল্প ছিল অনেক। রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যক্তির নতুন সম্পর্ক প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য পূরণে বিকল্প পন্থাসমূহ।

২.০২ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র মতাদর্শ (Welfare State Ideology)

কেইনসের অর্থনীতির নির্দেশ অনুসরণের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এফ. ডি. রুজভেল্টের 'নয়া ব্যবস্থা' (New Deal) কর্মসূচী রূপায়িত হয়। এই কর্মসূচী বেকারত্ব দূরীকরণ, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে আশা সঞ্চার করে। এর প্রেক্ষিতে মুক্ত বাজার পদ্ধতির পরিবর্তে সক্রিয় রাষ্ট্র ও মিশ্র অর্থনীতির পক্ষে জনমত গড়ে ওঠে। অবশ্যই সেক্ষেত্রে কিছু ব্যক্তিক্রমও লক্ষ করা যায়। গ্রেট ব্রিটেন ও পশ্চিম ইউরোপে সাধারণ স্রোতের বিরুদ্ধে ব্যতিক্রম রূপে উপস্থিত হন ফ্রিডরিল ভন হায়েক

(১৮৯৯—১৯৯২)। ১৯৪৪ সালে হায়েক-এর গ্রন্থ **The Road to Serfdom** প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সমালোচনা করেন। তিনি মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ অবশ্যম্ভাবীরূপে স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে। তাঁর এই গ্রন্থ গ্রেট বিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়দেশেই জনকল্যাণের সমর্থক ও কেইনসীয় অর্থনীতির বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে প্রবল ভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হায়েকের আক্রমণ মূর্ত হয়ে ওঠে উইলিয়াম হেনরি বেভারিজ (১৮৭৯—১৯৬৩) কর্তৃক প্রস্তুত Report on Social Insurance and Allied Service (১৯৪২) বিরোধিতার মাধ্যমে। বেভারিজ ব্রিটেনে আয় নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক বীমার 'cradle to grave' প্রকল্পের প্রস্তাব করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্রিটেনে পরবর্তী সময়ে নানা আইন প্রবর্তিত হয়। যুদ্ধ-পরবর্তী গ্রেট ব্রিটেনে শ্রমিকদলের সরকারের অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে বেভারিজের বেকারি (unemployment) সম্পর্কিত দ্বিতীয় রিপোর্ট (১৯৪৪) প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৪৪ সালে সরকার এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, সরকারের অর্থনৈতিক নীতির প্রথম লক্ষ্য বেকারত্ব দূরীকরণ। ১৯৪৫ সালে শিক্ষা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৪৬ সালের দি ন্যাশনাল ইনসুরেন্স অ্যাক্ট এবং দি ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস আইনের মাধ্যমে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের মতাদর্শ বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা হয়। আবাসন প্রকল্পে সরকারী ভর্তুকির ক্ষেত্রেও এই পদক্ষেপ অনুসৃত হয়।

এই ভাবে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র এবং 'সামাজিক নিরাপত্তা' সমার্থক হয়ে ওঠে। বাজারভিত্তিক সমাজে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্কে এক নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়। আলোচনা প্রসংগে এটা স্মর্তব্য যে, হায়েকের মতো ব্যতিক্রমী চিন্তাবিদ ব্যতিরেকে সর্বসম্মত ধারণা সৃষ্টি হয় যে, ১৯৪০-এর দশকের আর্থ-রাজনৈতিক প্রয়োজনের নিরিখে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কিন্তু জনসল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রবক্তাদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই এই মত পার্থক্যের প্রকৃতি রাজনৈতিক। বেভারিজসহ প্রথম গোষ্ঠীটি 'reluctant collectivists' নামে পরিচিত হন। এই গোষ্ঠী কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার এবং সেই লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন যার মাধ্যমে সফলভাবে বেকারির সমস্যাকে সমাধান করা যাবে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যাবে। দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি 'reformist socialists' নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীর সমর্থকেরা সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় বিশ্বাসী এবং এরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনকল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলায় আগ্রহী। এই কারণে এই গোষ্ঠী পরিকল্পিত এবং সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের এবং প্রয়োজনীয় আর্থ-রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য নতুন আইন প্রণয়ণের বিষয় উল্লেখ করে। তৃতীয় গোষ্ঠীটি হায়েকের মতাবলম্বী রূপে পরিচিত। এঁরা মনে করেন যে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের জন্য প্রচুর পরিমাণে সরকারী অর্থের বিনিয়োগ ও প্রয়োজনীয় আইন ও নিয়মাবলীসহ সম্প্রসারিত আমলাতন্ত্রের প্রয়োজন।

২.০৩ জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের সংকট (Crisis of Welfare State)

১৯৭০ থেকে জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান সংকট দেখা দিতে থাকে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, যুদ্ধোত্তর সর্বসম্মতির (consensus) বিভাজন অথবা এই দুই উপাদানের সম্মিলিত কারণে জনকল্যাণে রাষ্ট্রে সংকট সৃষ্টি হয়। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপ এবং শিক্ষা, আবাসন, স্বাস্থ্য ও চাকুরী মতো ক্ষেত্রে উন্নত পরিষেবার দাবী মেটানো কষ্টকর হচ্ছিল। আর একটি কারণ হল পারিবারিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন, বয়স্ক জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বেকার যুবকের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সামাজিক প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে মেরুকৃত রাজনৈতিক সংস্কৃতির চৌহদ্দিতে 'জনকল্যাণ' রাষ্ট্র সমালোচিত হতে থাকে। দক্ষিণপন্থী সমালোচকরা যুক্তি দেখান যে, জনগণের নিজস্ব সমস্যা সমাধানে তাদের উদ্যোগকে জনকল্যাণ রাষ্ট্র নষ্ট করে। বেকারভাতার উপর বেকার যুবককে নির্ভরশীল করে তাকে অলস ব্যক্তিতে পরিণত করা হয়। বামপন্থীরা যুক্তি দেন যে, জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রায়শঃই 'oppressive' ছিল। শ্রেণী, লিঙ্গ, জাতিগত অসাম্যের মূল কারণ সমাধানে জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ব্যর্থ বলে প্রতীয়মান হতে থাকে।

গ্রেট ব্রিটেনে ১৯৭৪-৭৯ সালে শ্রমিক সরকারের নীতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এই নীতি পরিবর্তন দক্ষিণপন্থী সমালোচনার প্রত্যুত্তর বলা যেতে পারে। ১৯৭৯ সালে মার্গারেট থ্যাচারের নেতৃত্বে রক্ষণশীল দলের নির্বাচনী জয়লাভে এই নীতির পরিবর্তন পরিকল্পিত ভাবেই ঘটে। সংক্ষেপে বলা যায়, বেভারেজ প্রতিবেদনের সুপারিশ থেকে তাৎপর্যপূর্ণ পশ্চাদপসরণ ঘটে। পূর্ণ চাকুরী থেকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষণীয়। ব্যক্তিগত আয়কর হার হ্রাস ও পরোক্ষ করে প্রত্যাবর্তন এই ধরণের পরিবর্তনের উদাহরণ। ১৯৮০ র দশকের শেষার্ধে জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বিলুপ্তির পরিবর্তে পুনর্গঠিত (restructured) হয়। অ-সরকারী (private), সরকারী (public) এবং স্বেচ্ছাসেবী (voluntary) ক্ষেত্রের পাশাপাশি অবস্থানের মাধ্যমে এক নতুন 'কল্যাণমুখী বহুত্ববাদী' ('welfare pluralist') উদ্ভব ঘটে। ১৯৯০-এর দশকে বিশ্বায়নের জোয়ার আসায় বিশ্ব অর্থনীতির (global economy) আন্তর্জাতিকীকরণ জাতীয় সরকারের স্বশাসনের ধারণাটি প্রায় ধ্বংস হয়। চলমান বিনিয়োগকে আকর্ষিত করার জন্য মজুরী ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয় হ্রাসের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। পশ্চিমী জগতে জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের বিবর্তন বিশ্লেষণ প্রসংগে G. Esping Anderson বাজার ভিত্তিক সমাজে মূলতঃ যে তিন প্রকার রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন তা হল 'conservative', 'social democratic' এবং 'liberal' জনকল্যাণকর রাষ্ট্র। প্রথম প্রকারের উদাহরণ জার্মানী, দ্বিতীয় প্রকার হল সুইডেন এবং ব্রিটেন হল তৃতীয় প্রকার। গ্রেট ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে পরিবর্তন ঘোষিত হল। এমনকি, গ্রেট ব্রিটেনে ১৯৯৭ সালে শ্রমিক দল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৩ সালে গণতান্ত্রিক দল ক্ষমতাসীন হলেও, সরকারের কার্যক্রমে উদারনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তন ঘটেনি।

১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে কমিউনিষ্ট-শাসিত দেশগুলি (তথাকথিত 'দ্বিতীয় বিশ্ব') থেকে নতুন চ্যালেঞ্জ আসে। স্বাধীনতা (liberty) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না কিন্তু তা সংকুচিত হয়। জন স্টুয়ার্ট মিল মন্তব্য করেছিলেন, "thing left to themselves inevitably decay". সামুহিকীবাদ (totalitariamism), ফ্যাসীবাদের দিক থেকেও স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিখ্যাত দার্শনিক জন রলস্ উদারনৈতিক নীতি নতুনভাবে উপস্থাপিত করেন। জনকল্যাণকর রাষ্ট্র সম্পর্কে আকর্ষণ ও উৎসাহ ১৯৭০-এর দশক থেকে হ্রাস পেতে থাকে, কারণ সামাজিক ন্যায়ও সমতা এই নীতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। রলস্ ন্যায়নীতি সম্পর্কিত তাঁর মূল্যবান তত্ত্ব রচনা করলেন এবং দেখালেন যে, উদারনৈতিকতাবাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়, বরং উদারনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা অপরিহার্য।

২.০৪ রলস্-এর ন্যায়নীতিতত্ত্ব (Rawls's Theory of Justice)

আমেরিকান দার্শনিক জন রলস্ (১৯২১—২০০২) তাঁর ন্যায়নীতিতত্ত্ব প্রণয়নের মাধ্যমে উদারনৈতিক তত্ত্বে নতুন অনুরণন সৃষ্টি করেন। তাঁর **A Theory of Justice** (1971) গ্রন্থে তিনি উদার রাজনৈতিক তত্ত্বের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত করেন যা সাম্প্রতিককালে উদারনৈতিক দর্শনের একটি অনবদ্য অবদান রূপে স্বীকৃত হয়েছে। রলস্ তাঁর গ্রন্থে ন্যায়নীতির প্রসংগটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য ন্যায়নীতির সব থেকে যথোপযুক্ত নৈতিক ধারণা কী? এই প্রশ্নটি ন্যায়নীতি সম্পর্কিত রলসের চিন্তাভাবনাকে চালিত করেছে। তাঁর এই অনুসন্ধানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে তৎকালীন দর্শনচর্চার জগতে উপযোগিতাবাদ, যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদের যে প্রাধান্য ছিল তাকে তিনি পরিহার করেন। তিনি এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য সামাজিক চুক্তি মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ন্যায়নীতির তত্ত্বের কাঠামো নির্মাণের জন্য লক, রুশো ও কান্টের সামাজিক চুক্তি মতবাদের সাহায্য নেন। এই মতবাদের মূল বক্তব্যটি হল যে, 'আইন' তখনই 'ন্যায়' বলে বিবেচিত হবে যখন স্বাধীন মানুষ তাদের সমঅধিকারের অবস্থানে দাঁড়িয়ে সেই আইনকে মেনে নিতে রাজী হয়। অর্থাৎ কোনও আইন ন্যায় নীতিসম্মত কিনা তা বোঝা যায় যখন সেটা শুধু সংখ্যাগুরুর পরিবর্তে প্রতিটি ব্যক্তির নিকট সকলের মঙ্গল সাধন হবে বলে গণ্য হয়।

রলস তাঁর চিন্তার পদ্ধতি হিসাবে 'ভারসাম্যের চিন্তা' (Reflective Eguilibrium) পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। দর্শনের ক্ষেত্রে উপযোগবাদ (utilitarianism) ও স্বজ্ঞাবাদ (Imtuitionism) যে অচলাবস্থা তৈরী করেছে তার প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য রলস্ এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এটি একটি বৌদ্ধিক কৌশল। কোনো ব্যবহারিক প্রক্রিয়ার সংগে মানুষের দৃঢ় নীতি ও বিচার বিবেচনার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য।

যখন প্রত্যয়ের সংঘাত দেখা দেয় তখন মানুষ তার ব্যবহারিক বিচারবুদ্ধি ও অন্তর্নিহিত মূল্যবোধের প্রাধান্য এবং গভীরতার মাধ্যমে সেই সংঘাত থেকে মুক্তিলাভের উপায় খোঁজার চেষ্টা করে। এই চিন্তার পদ্ধতিকে রলস ভারসাম্যের চিন্তা বা Reflective Eguilibrium বলে গণ্য করেন। এই ভারসাম্য অবশ্য স্থায়ী নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এর পরিবর্তন হওয়াটা স্বাভাবিক। সামাজিক চুক্তি সম্পাদনের সময় পরিবেশ ও শর্তাদি নতুন ভারসাম্য সৃষ্টি করতে পারে। রলস্ কর্তৃক উদ্ভূত 'ভারসাম্যের চিন্তা' ধারণাটি প্লেটো, হবস্ এবং জে. এস. মিল-এর চিন্তা পদ্ধতির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

রলস তাঁর ন্যায়নীতি তত্ত্ব গড়ে তোলার জন্য প্রথমেই কতগুলি ধারণা অনুমান করে নিয়েছেন। প্রথমতঃ তিনি 'প্রারম্ভিক অবস্থান' (Orginal Position)-এর কথা বলেছেন। তাঁর কল্পিত 'প্রারম্ভিক অবস্থান' নিয়ে রলস্ ন্যায়নীতি তত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত করেন। চুক্তি মতবাদীরা রাষ্ট্র গঠনের পূর্বেকার অবস্থাকে যে রকম 'প্রকৃতির রাজ্য' বলে কল্পনা করেছিলেন তেমনি রলস্ও তাঁর ন্যায়নীতি তত্ত্ব প্রণয়নের ক্ষেত্রে এক 'প্রারম্ভিক অবস্থান' কল্পনা করে নিয়েছেন। এটি নিছক অনুমান বা কল্পনা। এটি ইতিহাস স্বীকৃত নয়। রলস্ মনে করেন যে, মানুষ এই 'প্রারম্ভিক অবস্থানে' 'অজ্ঞতার ঘেরাটোপে' (Veil of Ignorance) বাস করতেন। অজ্ঞতার ঘেরাটোপ বলতে রলস্ বুঝিয়েছেন সেই আনুমানিক অবস্থাকে যেখানে মানুষের জ্ঞান ছিল অসম্পূর্ণ এবং বিচারবুদ্ধি ছিল সীমিত। ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা, স্বার্থ, সামর্থ্য সম্পর্কে সামান্য ধারণা বা জ্ঞান ছিল না। সমাজে তাদের নিজস্ব শ্রেণী অবস্থান ও সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কেও তাদের কোন বোধ ছিল না। জন্মগত গুণাগুণ, উচ্চতর প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য, সামাজিক অবস্থাকে ব্যবহার করে নিজের সুখসুবিধার প্রবণতা বৃদ্ধি এই বিষয়গুলিকে রলস 'অজ্ঞতার ঘেরাটোপের' ধারণার মাধ্যমে বাতিল করতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ, রলসের আর একটি অনুমান হল, যে সকল মানুষ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন তারা সবাই ছিলেন যুক্তিশীল (rational) মানুষ। তারা সবাই সর্বসাধারণের মঙ্গল (common good) চেয়েছিলেন কিন্তু আবার একই সাথে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে ছিলেন আপসহীন। রলস্ এইভাবে তাঁর চিন্তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুন্দরভাবে জন লকের ব্যক্তি স্বাধীনতার ঐতিহ্য, রুশোর সাধারণ মঙ্গলের ঐতিহ্য এবং কান্টের নৈতিক ব্যক্তিত্বের ঐতিহ্যকে মেলাতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন চুক্তির মধ্য দিয়েই উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মূল্যবোধ (এক সুশৃঙ্খল ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ) প্রতিষ্ঠিত ও সুরক্ষিত হবে। রলস এইভাবে উদারনৈতিক আদর্শের রাজনৈতিক আনুগত্যের সংগে সামাজিক ন্যায়ের পুনর্বণ্টন ধারণার সমন্বয় করতে চেয়েছেন যাতে ব্যক্তি ও সমাজ একইসাথে উপকৃত হতে পারে।

তৃতীয়তঃ, রলস্ মনে করেছিলেন যে, প্রাথমিক সামাজিক জিনিসের (primary social goods) সুবিধা লাভ করার জন্য মানুষ সামাজিক চুক্তিতে প্রবেশ করে। তাঁর মতে "স্বাধীনতা ও সুযোগ, আয় ও সম্পদ এবং আত্মসম্মানের ভিত্তি" এই বিষয়গুলি প্রাথমিক সামাজিক জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রাথমিক

সামাজিক জিনিসগুলি ক্ষমতা, অধিকার ও স্বাধীনতার মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বন্টিত হয়।

এই প্রাথমিক জিনিসগুলি যত বেশী পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে মানুষ চুক্তি করে কিন্তু তাদের সামাজিক অবস্থান এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের অজ্ঞতার কারণে তারা এই বিষয়ে নিশ্চিত ছিল না যে, এই প্রাথমিক সামাজিক জিনিসগুলি ব্যক্তিগতভাবে তারা কে কতটা পেতে পারে। রলস্ মনে করেন যে, এই কারণে চুক্তি সমর্থনকারীরা যে বন্টনের নীতিতে সম্মত হয় যেটা হবে 'ন্যায্য' (fair)। এইভাবে রলস্ অবশেষে ন্যায়নীতির যে সংজ্ঞা দেন তা হল 'ন্যায়নীতি হল ন্যায্যতা' (Justice as fairnss)। ন্যায়নীতি সম্পর্কে রলসের ধারণাটি তাই প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক (political), অধিবিদ্যক (metaphysical) নয়, ন্যায় বন্টনের এই নীতিটি ব্যক্তিগত স্বার্থ, পক্ষপাত অন্ধ সংস্কার অতিক্রম করে নৈতিক (ethical) আলোচনার ফল বলে বিবেচিত হয়।

রলস্ মনে করেন যে, প্রারম্ভিক অবস্থানে মানুষ মঙ্গলের ধারণাকে 'রূপ দেওয়া, সংশোধিত করা ও যুক্তির সাহায্যে অনুসরণ করা' এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতা তাদের নিকট রাখতে চেয়েছিলেন। এই ধারণাটির পিছনে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লুকিয়ে আছে তা হল নিজেদের মঙ্গলের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ জনগণের স্বাধীনতার ক্ষেত্রটি। রলস্ এইভাবে ন্যায়নীতি সম্পর্কে চিন্তা প্রসংগে তাকে সারগর্ভ নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করান যেখানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, মানুষ তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বিচার করবে। রলসের দার্শনিক ভাষ্যে মানুষ কান্টীয় ধারণানুসারে 'নুমিনল সেলফ'('noumenal self') বলে গণ্য হয়। যার অর্থ হল "ব্যক্তি স্বাধীন, নৈতিক, যুক্তিবাদী এবং এই কারণে আত্মস্বতন্ত্র"।

অবশেষে বলা যায় যে, ন্যায়নীতি সম্পর্কে রলসের মূল ভাবনাটি হল ঃ "সমস্ত সামাজিক মূল্যবোধ স্বাধীনতা ও সুযোগ, আয় ও সম্পত্তি এবং আত্মমর্যাদার ভিত্তিতে সমভাবে বন্টন করতে হবে যদি না এই সমস্ত মূল্যবোধগুলির কোন একটি বা সবগুলির অসম বন্টন সবার সুবিধার্থে করা হয়।" ("All social values—Liberty and opportunity, income and wealth and the bases of self-respect are to be distributed equally unless an unequal distribution of any, or all, of these values is to be everyone's advantage.") রলস্ অবশ্য মনে করেন যে, ন্যায়নীতির এই সাধারণ ধারণা ন্যায়নীতির পূর্ণতাত্ত্বিক রূপ নয়। এই কারণে তিনি ন্যায়নীতির দুটি মূল নীতি এবং দুটি অগ্রাধিকারের বিধি (priority rules) আলোচনা করেছেন।

রলসের প্রথম নীতি ঃ অন্যান্য সকল ব্যক্তির ব্যাপক মৌলিক স্বাধীনতার সংগে সামঞ্জস্য রেখেই প্রত্যেক ব্যক্তির সমতুল্য মৌল স্বাধীনতার সমানাধিকার থাকবে। ("Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty of others")। রলসের এই নীতিটি উদারনীতিবাদের সারবস্তু। এই নীতির অর্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সর্বাধিক প্রসারিত মৌল

স্বাধীনতার ব্যাপারে সমানাধিকার থাকবে। এই রকম মৌল স্বাধীনতা হল ঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ভোটাধিকার ও সরকারী পদে নিযুক্তির অধিকার, বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, এবং সমবেত হওয়ার অধিকার, বিবেকের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, স্বৈরাচারী গ্রেপ্তার ও আটকের হাত থেকে মুক্তির অধিকার (অর্থাৎ আইনের শাসন)। এইক্ষেত্রে রলসের মতের মধ্যে একদিকে রুশোর সাধারণ মঙ্গলের ধারণা এবং কান্টের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য'-এর ধারণার ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয় নীতি ঃ রলসের দ্বিতীয় নীতিটি সকলের জন্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে ন্যায়সম্মত সাম্য সম্পর্কিত। এই নীতির দুটি ভাগ আছে ঃ

(১) প্রথম ভাগটি হল 'প্রভেদের নীতি' ('Difference Principle")। প্রথম ভাগে বলা হল, "সামাজিক আর্থিক অসাম্যকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে তা প্রত্যেকের সুবিধার্থে কাজ করে এবং বিশেষভাবে অনগ্রসর মানুষের সাহায্যে লাগে।" (Social and economic inequalities are to be arranged so that they are reasonably expected to be everyone's advantage and in particular, to the advantage of the least well-off persons.)। রলস্ এই নীতিকে বলেছেন "maximin principle" অর্থাৎ যারা সবচেয়ে পিছিয়ে আছে তাদের জন্য সর্বাধিক সুবিধা দেওয়ার নীতি। রলসের মতানুসারে ন্যায়ের নীতিসমূহের দাবী অনুযায়ী ন্যূনতম সামাজিক মান প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। ন্যূনতম সুবিধাগোষ্ঠীর বিভিন্ন আয় ও সুযোগসুবিধাগুলিকে সর্বাধিক (maximize) করাই এই নীতির মূল কথা।

(২) দ্বিতীয় ভাগটি হল ঃ সামাজিক আর্থিক অসাম্যের ব্যবস্থাপনা এমন হবে যাতে ন্যায়সম্মত সমান সুযোগের অবস্থায় পদ ও কর্ম দপ্তর সকলের কাছে উন্মুক্ত থাকে।" ("Social and economic inequalities are to be arranged under condition of fair equality of opportunity.")। এর অর্থ হল যে, আয় ও শ্রেণীনির্বিশেষে যাদের একই ধরণের সামর্থ্য, দক্ষতা ও গুণ আছে তাদের জীবনযাত্রা বিকাশের সুযোগ একই ধরণের হওয়াটাই ন্যায়সংগত। এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রলসীয় উদারনীতি ধ্রুপদী উদারনীতিকে অতিক্রম করে গেছে। রলসের ন্যায়নীতিতত্ত্বের দ্বিতীয় অংশটিতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

রলসের ন্যায়নীতিতত্ত্বে এই দুই নীতির সাথে যুক্ত রয়েছে দুটি অগ্রাধিকারের বিধি (Priority Rule)। অগ্রাধিকারের প্রথম বিধিতে সুযোগ সুবিধার সাম্যের উপরে স্বাধীনতার অগ্রাধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রলস্ এই অগ্রাধিকারকে 'lexical' অভিধানসম্মত অগ্রাধিকারে বলে অভিহিত করেন। এই অগ্রাধিকারের অর্থ হল যে, কেবলমাত্র স্বাধীনতার জন্যই স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করে সম্পদ বন্টনের নীতি গ্রহণ করা যাবে না।

দ্বিতীয় অগ্রাধিকার বিধিতে বলা হয় যে, বন্টন ব্যবস্থার দক্ষতা অপেক্ষা সুযোগসুবিধার ন্যায়সম্মত

সমতা অগ্রাধিকার লাভ করবে। অর্থাৎ বন্টন ব্যবস্থাকে দক্ষ প্রশাসনের মাধ্যমে ন্যায়সম্মত করতে গিয়ে যেন কখনই সকলের জন্য ন্যায়সংগত সুযোগের সমতা (equality of opportunity) লঙ্ঘন করা না হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ন্যায়নীতির দুটি প্রধান নীতি এবং তার সঙ্গে দুটি অগ্রাধিকারের কথা বলায় রলসীয় উদারনীতি ধ্রুপদী উদারনীতিকে অতিক্রম করে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

২.০৫ রলসীয় কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (Rawlsian Welfare State)

রলস তাঁর ন্যায়নীতিতত্ত্ব প্রণয়নে উদারনীতিবাদের মুক্তকামী আদর্শ ও অর্থনৈতিক সমতাবাদকে একটি একক তাত্ত্বিক কাঠামোয় একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। এটা করতে গিয়ে, তিনি উদারনীতিবাদকে রাজনৈতিক বিতর্ক ও আলোচনায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি স্বাধীনতার গুরুত্ব বিষয়ে আপসহীন কিন্তু তিনি চান যে, গণতান্ত্রিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র আর্থিক সম্পদ, সামাজিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার ব্যাপারে সমতা আনয়নে প্রচেষ্টা গ্রহণ করুক। রলস্ গণতন্ত্রের সাংবিধানিক কাঠামোয় 'কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র' ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষপাতী। যেখানে সরকার সর্বসাধারণের জন্য অথবা ন্যূনতম আয় বিশিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষের জন্য বিনামূল্যে অথবা ভরতুর্কীতে প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবার ব্যবস্থা করে সেই ব্যবস্থাকে রলস্ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বলে সংজ্ঞায়িত করেন।

রলস্ তাঁর ন্যায়নীতিতত্ত্বে এক বিশেষ ধরনের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন যেখানে সাম্যনীতির বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিফলন থাকবে। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু, কবলমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা নয়, সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত মানুষদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ন্যায়সম্মত বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তিনি রাষ্ট্রকে একটি বিশেষ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রূপে গণ্য করেন যেখানে সদস্যরা যুক্তিবাদী এবং সাধারণ সামাজিক কল্যাণ সাধন নিমিত্তে কাজ করেন। যেহেতু তিনি সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীকে সাহায্য করবে এমন রাষ্ট্রকে পছন্দ করেন তাই তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্বকে উদারনৈতিক কল্যাণবাদ বা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। যা হোক, তিনি মানুষের মৌল স্বাধীনতাগুলোকে সুরক্ষিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করেন, আর্থ-সামাজিক লাভের জন্য ব্যক্তির মৌল স্বাধীনতাগুলিকে কোনমতেই বর্জন করা যায় না। রলসের রাজনৈতিক তত্ত্ব মানবতাবাদের নৈতিকতা (ethics of humanism)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর তত্ত্বে মানুষের ধারণা বলতে এমন একজন নৈতিক ব্যক্তিত্বকে বোঝায় যাঁর নিকট বেঁচে থাকার নিমিত্ত পার্থিব সম্পদের যতটা প্রয়োজন ততটাই ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রয়োজন।

ম্যাক্স ওয়েবারের মতো রলস্ সামাজিক স্তর বিন্যাস এবং ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ (hierarchy)-কে কার্যগতভাবে প্রয়োজনীয় এবং সেই কারণে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করেন। কিন্তু তিনি এর সাথে সকলের জন্য মৌল স্বাধীনতা সমূহের দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিতে হবে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি একইসাথে সুযোগের ন্যায্য সমতার মাধ্যমে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের মর্যাদা রক্ষা করতে আগ্রহী।

তাঁর "justice as fairness" ধারণাটি মূলতঃ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা, অধিবিদ্যার নয়। পরবর্তীকালে রলস্ তাঁর Political Liberalism (1993) গ্রন্থে উদারনৈতিক রাষ্ট্রে আইনকে ন্যায়সম্মত ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে 'সর্বসাধারণের যুক্তি' (public reason) ও 'সার্বিক ঐক্যমত' (overlapping consensus)-এর উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন যে, উদারনীতিবাদের দুটি প্রধান ধারণা সাম্য ও স্বাধীনতা তাদের নিজেদের পায়েই দাঁড়িয়ে থাকে এবং উদারনৈতিক সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে তা অন্তর্নিহিত রয়েছে।

উদারনৈতিক কল্যাণবাদের প্রবক্তা রলসকে রবার্ট নোজিক ও রোনাল্ড ডরকিনের ন্যায় উদারনৈতিক দার্শনিক, এবং মার্কসবাদী, জনকল্যাণব্রতী অর্থনীতিবিদ, কৌমবাদী, ও নারীবাদী প্রবক্তাদের দ্বারা সমালোচিত হতে হয়। এই সমালোচনার বেশীরভাগ বক্তব্য প্রকরণগত (technical)। রলসীয় বিশ্লেষণে কিছু কিছু বিষয় বাদ পড়েছে। কিন্তু ন্যায়নীতিসম্মত সামাজিক ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্দেশ্যে রলসের উদারনৈতিক কল্যাণবাদ সম্পর্কিত মূল অবস্থান পশ্চিমী জগতের উদারনৈতিক গণতন্ত্রে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বর্তমান উদারনৈতিক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক ব্যবস্থায় রলস্ কথিত 'সর্বসাধারণের যুক্তি' (public reason) ও 'সার্বিক ঐকমত্য (overlapping consensus) ব্যবহারিক উদ্দেশ্যরূপে বহুল ব্যবহৃত হয়।

২.০৬ গ্রন্থসূচী

১. John Rawls, *A Theory of Justice* (1971)

২. John Rawls, *Political Liberalism* (1993)

৩. R. Sushila, *Liberty, Equality and Social Justice : Rawls's Political Theory*

৪. A. Swift, *Political Philosophy* (2001)

৫. J. Hampton, *Political Philosophy* (1997).

৬. B. Parekh, *Contemporary Political Thinker* (1982)

৭. A. K. Mukhopadhyay, *"John Rawls's Theory of Justice in Socialist Perspective,* Vol. 31 (1–2) June-September-2003

৮. অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, 'সামাজিক ন্যায়নীতি তত্ত্ব : একটি রূপরেখা in দীপককুমার দাস, রাজনীতির তত্ত্বকথা, কলকাতা : একুশে প্রকাশন, ২০০৫

২.০৭ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Suggested Questions)

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নসমূহ ঃ

১। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র মতাদর্শের উদ্ভবের পশ্চাদভূমি (Background) বর্ণনা কর।

২। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র মতাদর্শে বেভারিজ রিপোর্টের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

৩। 'নিউ ডিল' কর্মসূচীর তাৎপর্য কী?

৪। বিংশ শতাব্দীর শেষলগ্নে তিন প্রকারের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা কর।

৫। রলস্ তাঁর ন্যায়নীতিতত্ত্ব নির্মাণ করতে গিয়ে সামাজিক চুক্তির ঐতিহ্য কেন আলোচনা করলেন?

৬। 'প্রকৃতির রাজ্য' ও 'প্রারম্ভিক অবস্থান'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

৭। রলস্-বর্ণিত 'ভারসাম্যের প্রতিফলন' (Reflective equilibrium) ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

৮। ন্যায়নীতি তত্ত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রলসের অনুমানগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

৯। স্বাধীনতা ও সাম্যের গুরুত্ব সম্পর্কে রলসের ধারণা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

১০। রলসীয় কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বর্ণনা করো।

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নসমূহ ঃ

১। রলসের ন্যায়নীতিতত্ত্ব নিমার্ণে 'প্রারম্ভিক অবস্থান' ও 'অজ্ঞতার ঘেরাটোপ'-এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২। উদারনৈতিকতাবাদে রলসের অবদানের ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক পটভূমি আলোচনা কর।

৩। রলসের ন্যায়ীতিতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশদে বিশ্লেষণ করো।

৪। রলস্ তাঁর ন্যায়নীতিতত্ত্ব নির্মাণে কেমনভাবে লক, রুশো ও কান্টের দার্শনিক ঐতিহ্যের সংযোগ ঘটিয়েছেন তা দেখাও।

৫। রলসের উদারনীতিক কল্যাণবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি এবং গুরুত্ব আলোচনা কর।

একক—৩ ❑ ব্যক্তিমুক্তিভিত্তিক উদারনীতিবাদ ঃ রবার্ট নোজিক (Liberatarianism : Robert Nozick)

গঠন

৩.০১ ভূমিকা

৩.০২ অধিকারের ব্যক্তিমুক্তিভিত্তিক তত্ত্ব

৩.০৩ ন্যায়নীতির স্বত্বাধিকার তত্ত্ব

৩.০৪ ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বত্বাধিকার তত্ত্ব

৩.০৫ ন্যূনতম রাষ্ট্রের তত্ত্ব

৩.০৬ পরবর্তী ভাবনা

৩.০৭ উপসংহার

৩.০৮ গ্রন্থসূচী

৩.০৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পড়ার মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারা যাবে ঃ

(১) নয়া উদারনীতিবাদী তত্ত্ব গড়ে ওঠার পটভূমিকা।

(২) নয়া উদারনীতিবাদী তত্ত্বে রবার্ট নোজিকের অবদান।

(৩) ন্যায়নীতির স্বত্বাধিকার তত্ত্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বত্বাধিকার তত্ত্ব সম্পর্কে নোজিকের ভাবনা।

(৪) ন্যূনতম রাষ্ট্রের ধারণা ও নোজিকের দৃষ্টিভঙ্গী।

৩.০১ ভূমিকা (Introduction)

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নব দক্ষিণপন্থী উদারনীতির প্রবক্তা রবার্ট নোজিক। তিনি প্রিন্সটন

বিশ্ববিদ্যালয়ে (নিউ জার্সি) পড়াশোনা করেন। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস)। তাঁর প্রথম গ্রন্থ Anarchy, State and Utopia ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয়। নোজিকের এই গ্রন্থটি নয়া উদারনীতিবাদী রাজনৈতিক দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানরূপে গণ্য হয়। প্রধানতঃ জন রলসের বক্তব্যের বিরোধিতা করে নোজিক তাঁর দার্শনিক বক্তব্য দাঁড় করিয়েছেন। প্রসঙ্গগতঃ উল্লেখ্য যে, জন রলসের আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ A Theory of Justice ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়। নোজিক ব্যক্তিমুক্তিস্বাত্যন্ত্রবাদ তত্ত্বের ভিত্তিতে রলসের সামাজিক ন্যায়নীতির তত্ত্ব সমালোচনা করেন এবং 'ন্যূনতম রাষ্ট্রের' ধারণার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। মতাদর্শরূপে তিনি ন্যূনতম রাষ্ট্রকে বৈধতা দেন এবং ব্যক্তি-রাষ্ট্র সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী দক্ষিণ পন্থী বলে মনে হয়। রাষ্ট্রের ব্যাপক ক্ষমতা জনগণের অধিকার হরণ করে এবং সেই কারণে তা অসংগত। নোজিকের উপর নব দক্ষিণ পন্থী রাষ্ট্রদর্শনের (নিউ রাইট) প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

নোজিক এমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সমর্থক যা সম্পূর্ণভাবে সংহতি ও সমমর্মী ধারণা বর্জিত। তিনি ঘোষণা করেন যে, ব্যক্তির অধিকার চরম। তাঁর মতে, ব্যক্তি কিছু স্বত্বাধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং ব্যক্তি যা পাওয়ার যোগ্য সেটা যদি সে পায় তবেই ন্যায়নীতি বিরাজ করতে পারে।

নোজিকের ন্যায়নীতির স্বত্বাধিকার তত্ত্ব ন্যূনতম রাষ্ট্রের পক্ষে ওকালতি করে। নোজিকের মত হল, ন্যায়নীতি সংক্রান্ত সমস্যাটির কেন্দ্রে স্বত্বাধিকারের (entitlement) ধারণা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নোজিকের ব্যক্তিমুক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব রলসের উদারনৈতিক কল্যাণবাদের বিকল্প মডেল। রলসের মতো, নোজিকও উপযোগিতাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন এই যুক্তিতে যে, উপযোগিতাবাদ ব্যক্তিবর্গের মধ্যেকার পার্থক্যকে উপেক্ষা করে। যদিও নোজিক রলসীয় সমাজবাদী ধারণার সমালোচনা করেন, কিন্তু তিনিও কান্টীয় ভাষ্য গ্রহণ করেন যেখানে ব্যক্তিকে উপায়ের (means) 'পরিবর্তে' লক্ষ্য (end) রূপে গণ্য করা হয়।

যখন নোজিকের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় সেই সময়ই নয়া-উদারনীতিবাদের (neo-liberalism) মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মতাদর্শের উদ্ভব ঘটে। উদারনীতিবাদের কল্যাণমূলক মডেলের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নয়া-উদারনীতিবাদের উদ্ভব ঘটে। নয়া-উদারনীতিবাদকে সাধারণতঃ দক্ষিণপন্থী তত্ত্ব রূপে গণ্য করা হয়। উদারনীতিবাদের রক্ষণশীল রূপ নয়া উদারনীতিবাদ। নয়া-উদারনীতিবাদ ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়। এই মতবাদ উদারনীতিক কল্যাণবাদের বিরোধিতা করে এবং জন লক ও অ্যাডাম স্মিথের কাছে ফিরে যায়। এই মতবাদ ফ্রীডরিশ হায়েক ও মিল্টন ফ্রিডম্যানের রাষ্ট্রবিরোধী (anti-statist) ধারণা সমর্থন করেন।

১৯৭০ দশকের মধ্যভাগে নয়া-উদারনীতিবাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এই প্রেক্ষাপটে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নোজিকের গ্রন্থ Anarchy, State and Utopia রাজনৈতিক দার্শনিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর ব্যক্তিমুক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব তীব্রভাবে জন রলস ও অমর্ত্য সেনের দার্শনিক অবস্থানের বিরোধী। জন

রলস ও অমর্ত্য সেন মূলতঃ নৈতিকতার (ethics) যুক্তির ভিত্তিতে সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মসূচীর অগ্রগতির স্বার্থে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সমর্থক ছিলেন। নোজিক ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত ধারণার বিষয়ে লকীয় ধারণা থেকে উৎসাহিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কান্টের কাছ থেকে ethical justification-এর ধারণা গ্রহণ করেন।

৩.০৩ অধিকারের ব্যক্তিমুক্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব (Libertarian Theory of Rights)

নোজিকের **Anarchy, State and Utopia** (১৯৭৪) কিছুক্ষেত্রে জন রলসের **A Theory of Justice** (১৯৭১)-এর মুক্তিবাদী (Libertarian) বা ব্যক্তিমুক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উত্তর বলা যেতে পারে। নোজিক নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দেন এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের পক্ষে নৈতিক সমর্থন জানান।

তাঁর 'ন্যূনতম রাষ্ট্র' (মিনিমাল স্টেট) ধ্রুপদী উদারনীতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির পছন্দের 'নৈশপ্রহরী' রাষ্ট্রের (নাইটওয়াচম্যান স্টেট) প্রতিচ্ছবি ব্যতীত আর কিছু নয়। এই রাষ্ট্র ব্যক্তিকে খুন, আক্রমণ, চুরি, ধর্ষণ ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই অধিকার সমূহ 'absolute moral side-constraints' নামে অভিহিত। নোজিকের মতে, ব্যক্তিরা তাদের অধিকার ত্যাগের পরিবর্তে তা রক্ষার জন্য রাষ্ট্র নির্মাণ করে। এইক্ষেত্রে নোজিক নৈরাজ্যবাদীদের থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন।

রলসের মতো নোজিকও ইমানুয়েল কান্টের দ্বারা উৎসাহিত হন। নোজিকের ন্যূনতম রাষ্ট্রে যে সকল অধিকার বর্ণিত হয়েছে নোজিক সেই অধিকারসমূহকে ন্যায়সম্মত (Just) অধিকার বলে বর্ণিত করেন কারণ সেগুলি কান্টের ঘোষণাকে যথার্থ বলে প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত। কান্টের মতে No one person ought ever to be dealt with purely as a means to the ends of another. [cf. Immanuel Kant, The Groundwork of the Metaphysics of Morals (1785), tr. into English as The Moral Law (1956)

নোজিক 'entitlement' বা স্বত্বাধিকার শব্দটি ব্যবহার করেন, যাকে রলস্ এবং অন্যরা 'justice' বা ন্যায়সম্মত বলেন। এই কারণে ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে অধিকারের স্বতাধিকার তত্ত্ব বলে গণ্য করা হয়। তিনি মনে করেন যে, (night watchman state) 'নৈশপ্রহরী রাষ্ট্র' ন্যায়নীতিসম্মত। রলসের মতো যাঁরা সম্প্রসারিত রাষ্ট্রক্ষমতার সমর্থক, যাঁরা মনে করেন রাষ্ট্র বহুবিধ কার্য সম্পাদিত করবেন নোজিক তার বিরোধী ছিলেন। নোজিকের মতে এই দৃষ্টিভঙ্গী ভুল। কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গী রাষ্ট্রের অধীনে ব্যক্তির দাসত্বকে উৎসাহিত করে। তাঁর নিকট ব্যক্তি চরমভাবে আত্মস্বাতন্ত্র, সুতরাং অন্য ব্যক্তিবর্গকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে কিছু ব্যক্তির উপর কর আরোপ করার অর্থ কর প্রদেয়কারী ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘন করা। 'করের' ('tax') এর ধারণায় quid pro quo নীতি থাকে না। নোজিকের মতে ব্যক্তির সামাজিক

অস্তিত্ব বলে কিছু নেই, তারা কেবলমাত্র সম্বন্ধহীন ব্যক্তিবর্গ। জনগণ আত্ম-স্বাতন্ত্র্য (autonomous) এবং সেই কারণে তারা পৃথক। সেখানে এমন কোন অধিকারসমূহ থাকতে পারে না যাকে ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব অধিকার বলা যেতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি যে অধিকার পাওয়ার উপযুক্ত সেই অধিকার সে ভোগ করে। এটাই নোজিকের অধিকারের ব্যক্তিমুক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তত্ত্ব।

৩.০৩ ন্যায়নীতির স্বত্বাধিকার তত্ত্ব (Emtitlement Theory of Justice)

নোজিকের ন্যায়তত্ত্ব যা তাঁর Amarchy, State and Utopia গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে তা ন্যায়নীতির পদ্ধতিগত তত্ত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ন্যায়নীতির পদ্ধতিগত তত্ত্ব উৎপাদন ও বন্টনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তির নিজস্ব স্বত্বাধিকার (entitlement) রয়েছে এবং তা ভোগ্যদ্রব্য ও পরিষেবার বন্টনের কোনো বিমূর্ত নীতির উপর নির্ভর করে না। এর অর্থ এই যে, ব্যক্তির স্বত্বাধিকারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কোনো বৈধতা নেই। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র যদি হস্তক্ষেপ করে তাহলে সেটা হবে মারাত্মক অন্যায়। এইরকম তীব্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তত্ত্ব সমাজের কোন উদ্দেশ্য যা যৌথভাবে বাঁচার জন্য প্রয়োজন সেটা কখনোই স্বীকার করে না। এইরকম দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিকে ক্ষমতাশালী ও চরম স্বতন্ত্র করে তোলে, ব্যক্তির সাফল্য ও ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব ব্যক্তির সম্পূর্ণভাবে নিজের।

ন্যায়নীতির পদ্ধতিগত তত্ত্ব সাধারণভাবে বাজার অর্থনীতির সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এটা মনে করা হয় যে, বাজার (market) সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে সক্ষম। এই ব্যবস্থায় কোনোরকম হস্তক্ষেপের প্রয়াস হবে প্রত্যেকের প্রতি অন্যায় ও ক্ষতিকারক। এছাড়া, হস্তক্ষেপের ভিত্তি হতে হবে ইচ্ছা-প্রণোদিত ও প্রয়োজনের কিছু গৃহীত নীতি অনুসারী।

ন্যায়নীতির পদ্ধতিগত তত্ত্বের তাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, এই পদ্ধতি বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। কারণ মুক্ত সমাজে ন্যায়নীতিতে ইচ্ছা-সম্পর্কিত কোনো সাধারণ চুক্তি থাকতে পারে না। বাজারে যারা ব্যর্থ এবং যারা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন অনুভব করে তাদের জন্য এই তত্ত্বের তাত্ত্বিকেরা চিন্তিত। তাঁরা মনে করেন যে, এর সঙ্গে ন্যায়নীতির কোনো সম্পর্ক নেই।

নোজিক ন্যায়নীতির ঐতিহাসিক (historical) এবং উদ্দেশ্য-রাষ্ট্র (end-state) নীতির যে পার্থক্য করেন তা ন্যায়নীতির স্বত্বাধিকার তত্ত্ব বোঝার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। নোজিক যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ইতিহাসের নীতি অনুযায়ী, ব্যক্তির অতীত কার্যকলাপ তার স্বত্বাধিকার নিয়ন্ত্রণ করে, কারণ যেহেতু কার্যকলাপ বিভিন্ন হয় সুতরাং স্বত্বাধিকারের ক্ষেত্রেও বিভিন্নতা দেখা দেয়। কিন্তু উদ্দেশ্য-রাষ্ট্র (end-state) নীতি মনে করে যে, একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে যার সঙ্গে বন্টনের ধারাটা সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

নোজিক যুক্তি দেন যে, সৎ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তির উপর ব্যক্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকে। নায্যতা বলতে বোঝায় প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী নিয়মকে মান্য করবে এবং প্রতারণার কোন বিষয়

থাকবে না। নোজিক বলেন, কোনো ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে বা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো সম্পত্তি লাভ করলে তার উপর সেই ব্যক্তির স্বত্বাধিকার বর্তায়। অতীতে কোনো ব্যক্তিকে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলে পরবর্তী সময়ে তা সংশোধন করে ব্যক্তির স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করা উচিত। কিন্তু তিনি পীড়নের মাধ্যমে পুর্নবন্টনে আগ্রহী নন। নোজিক মনে করেন যে, পুর্নবন্টনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ ভূমিকা রয়েছে। নোজিক মনে করেন এইভাবে ব্যক্তির স্বাধীনতা সুরক্ষিত করা যায়।

নোজিক রাষ্ট্রের এক্তিয়ার ও ভূমিকাকে সীমাবদ্ধ করবার মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে সুনিশ্চিত করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন এই পদক্ষেপ বা নীতি ব্যক্তির উদ্যোগ গ্রহণে, তাদের যৌক্তিকতাকে দক্ষভাবে ব্যবহার করতে, ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার্থে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। এইভাবে নোজিকের ন্যায়নীতিতত্ত্ব ব্যক্তির স্বাধীনতার রক্ষাকবচ রূপে কাজ করে।

৩.০৪ ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বত্বাধিকার তত্ত্ব (Entitlement Theory of Private Property)

আধুনিক রাষ্ট্র তত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় চিন্তাগুলিকে তা নাড়া দেওয়ার প্রচেষ্টা। আধুনিক যুগে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ব্যক্তির নিরাপত্তা রক্ষা করা বিশেষতঃ অর্থনৈতিক নিরাপত্তা। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিষয়টি মুখ্য হয়ে ওঠে। উদারনৈতিক রাষ্ট্র চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তরা সামন্তবাদী অর্থনীতির পরিবর্তে বাণিজ্যিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির পক্ষে তাঁদের সমর্থন জানান।

লকের সম্পত্তি তত্ত্বে সম্পত্তির ব্যক্তিগত আত্মসাৎ হলো বৈধ। তিনি মনে করেন যে, ব্যক্তির শ্রম ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি। প্রকৃতির উৎসসমূহ ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে তখনই পরিণত হয় যখন তাকে মূল্য সৃষ্টির কারণে ব্যক্তি তার শ্রম মিশ্রিত করে। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন, কারণ তাঁর মতে সম্পত্তি ছাড়া ব্যক্তি তাঁর জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করতে পারে না। তিনি বলেন যে, সম্পত্তি রক্ষার্থেই পৌরসমাজ ও সরকারের উদ্ভব ঘটেছে।

লকের সম্পত্তি সংক্রান্ত প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্ব উপযোগিতাবাদী চিন্তাবিদদের দ্বারা ভীষণভাবে সমালোচিত হয়। উপযোগিতাবাদীদের মতে, বহু উপযোগিতার কারণে সম্পত্তি গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণে সরকারের আইন ও রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সমর্থন প্রয়োজন।

কার্ল মার্কস সাম্যবাদী সমাজের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের সমর্থক ছিলেন। অবশ্য, তিনি অন্যের উপর একের শোষণ রূপে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ চেয়েছিলেন। উদারনীতিবাদী ও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিষ্ঠানকে বিলোপ করতে

চাননি, কিন্তু তাঁরা সমাজে কল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পদের পুর্নবন্টনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর কর আরোপে আগ্রহী ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে এই মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন জন রলস্, যার নোজিক সরাসরি উদারনৈতিক কল্যাণবাদের রলসীয় মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি বক্তির জীবন ও স্বাধীনতার অধিকার রক্ষার যন্ত্ররূপে লকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণায় ফিরে যান তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বত্বাধিকার তত্ত্বে।

নোজিক ব্যক্তি সম্পত্তি সংক্রান্ত যে তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন তার তিনটি নীতি রয়েছে। প্রথমতঃ সম্পত্তির মূলনীতিগত যাথার্থ্য দ্বিতীয়তঃ, সম্পত্তি হস্তান্তরের ব্যাপার, আর তৃতীয়তঃ, অনায্য সম্পত্তি অধিকারের সংশোধন। প্রথমটি সম্পত্তির সৃষ্টি সম্পর্কিত, দ্বিতীয়টি সম্পত্তি একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে যাওয়া সম্পর্কিত, এবং তৃতীয়টি হলো প্রথম ও দ্বিতীয় লঙ্ঘিত হলে তার সংশোধন সম্পর্কিত। ন্যায়নীতি প্রসঙ্গে রলসের তত্ত্বে বলা হয় যে, বন্টনের ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ন্যায়নীতি লঙ্ঘিত হলে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের স্বত্বাধিকারের পক্ষে রলস্ কোন যুক্তি দেন নি। কারণ রলস তাঁর ন্যায়নীতি তত্ত্ব গঠনের সময় ধরে নিয়েছেন যে, প্রাথমিক অবস্থায় অজ্ঞতার আবরণের মধ্যে বাস করা হেতু বন্টনের সময়কে কতটা ভোগ্যদ্রব্য পাবে সে সম্বন্ধে কারুর কোন ধারণা ছিল না।

নোজিকে স্বত্বাধিকার তত্ত্বে বন্টনের কোন বিশেষ ছক নেই এবং বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধেও কিছু বলা হয়নি। নোজিক বলেন, ভোগ্য দ্রব্যের সামাজিক বন্টন তখনই ন্যায়সম্মত হয় যখন বন্টনের প্রক্রিয়াটা ন্যায়সম্মত হয়।

৩.০৫ ন্যূনতম রাষ্ট্রের তত্ত্ব (Theory of Minimal State)

জন স্টুয়ার্ট মিল-এর মতোই নোজিক ও ব্যক্তির বাক-স্বাধীনতা, বিশেষ করে নিজস্ব জীবন শৈলী বেছে নেওয়ার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

নোজিকের স্বত্বাধিকার তত্ত্ব ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার নীতি অনুসরণ করে ন্যায়নীতিকে বুঝতে চেষ্টা করে। কীভাবে বা কোন নীতি অনুযায়ী সম্পত্তি বা ভোগ্যদ্রব্য বন্টিত হচ্ছে তার চেয়ে কীভাবে সম্মতি অর্জন করা হয়েছে তার উপর তিনি বেশী জোর দেন। সামাজিক ন্যায়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থির করে তদনুযায়ী বন্টন ব্যবস্থা স্থির করতে গেলে সব সময় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আসবে। কিন্তু নোজিকের কাছে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। 'ন্যূনতম রাষ্ট্র'-এর আদর্শই তাঁর অভিপ্রেত রাষ্ট্রদর্শন।

নোজিক তাঁর রাষ্ট্রতত্ত্বে জন লক-এর উদারনীতিতে ফিরে গেছেন। লক-এর প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণাকে নোজিক বিশ শতকের শেষদিকে পশ্চিমী জগতের অভিজ্ঞতায় নতুনভাবে দেখতে চাইলেন। তাঁর মতে 'ব্যক্তি অধিকার' কোন কিছুর দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু তাকে স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রতিভূ ব্যক্তি মানুষের ধারণাকে কেন্দ্র করেই বুঝতে হবে। নোজিক একথা মানতে রাজী নন যে, সমাজে গোষ্ঠী জীবন

থেকে ব্যক্তি অধিকারের জন্ম হয় অথবা কোন এক সময়ের প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবনধারা থেকে পাওয়া সুবিধাগুলির যোগফল 'ব্যক্তি অধিকার'। সুতরাং তাঁর মতে 'সর্বজনীন ব্যক্তি অধিকার' ধারণাটি অর্থহীন। কারণ ইতিহাসের যে কোন যুগে সকল সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তির প্রাকৃতিক অধিকার বলে অর্থবহ কোন কিছু হয় না। নোজিকের কাছে ব্যক্তি অধিকারের অর্থবহ এবং গ্রহণযোগ্য ধারণা হলো বিশেষ ভোগ্যবস্তুর ওপর বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ অধিকারের ধারণা। তাঁর মতে লক তাঁর প্রাকৃতিক রাজ্যে ব্যক্তিকে যে সব অধিকার দিয়েছিলেন সেগুলি রক্ষা করাই 'ন্যূনতম রাষ্ট্রের' কর্তব্য। আধুনিককালে রাষ্ট্র যে ব্যক্তির আয়ের ওপর কর ধার্য করে তাকে নোজিক বাধ্যতামূলক শ্রমের সমগোত্রীয় মনে করেন এবং মন্তব্য করেছেন যে, রাষ্ট্র কতৃক ধার্য আয়কর ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ব্যাহত করে এবং সে কারণে তা অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু 'ন্যূনতম রাষ্ট্রের' নিজস্ব ব্যয় নির্বাহ কীভাবে হতে পারে সে ব্যাপারে নোজিক কিছু বলেননি।

নোজিকের মতে রাষ্ট্রের সংগঠন কী ধরণের হবে তা রাষ্ট্রদর্শনের মূল কথা নয়। মূল কথা হল রাষ্ট্র আদৌ থাকা উচিত কিনা। স্বাধীন ব্যক্তিদের নিজেদের মধ্যে স্বেচ্ছামূলকভাবে আদান-প্রদানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি নৈরাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থাকে নোজিক সমর্থন করেন। তিনি চান তাঁর 'ন্যূনতম রাষ্ট্রে' নাগরিকরা নিজেদের কিছু অধিকার ত্যাগ করে একটি পারস্পরিক রক্ষা সমিতি গড়বেন তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য এবং নিজেদের অন্যান্য অধিকার রক্ষা করার জন্য। তাঁর কল্পিত 'ন্যূনতম রাষ্ট্রের' ধারণার সঙ্গে এই ধরনের স্বেচ্ছামূলক সংঘ সমিতি সঙ্গতিসম্পন্ন। ন্যূনতম রাষ্ট্রের কাজ হল হিংসা, চুরি-চামারি, জালিয়াতি ইত্যাদি থেকে ব্যক্তি স্বার্থকে রক্ষা করা এবং চুক্তি বলবৎ করা। এই ধরনের রাষ্ট্রে ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য শর্তে অধিকার হাতবদল করা তিনি অনুমোদন করেন। এর চেয়ে বেশী ক্ষমতাশালী কোন রাষ্ট্রকে নোজিক সমর্থন করেন নি। কারণ তাঁর মতে সমাজে সম্পদের সমবন্টনের নামে রাষ্ট্র যদি ব্যক্তির জীবনে হস্তক্ষেপ করতে থাকে তাহলে ব্যক্তির অধিকার নষ্ট হবে।

নোজিকের আক্রমণের মূল লক্ষ্য জন রলসের কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র। যখন জনকল্যাণমূলক প্রশাসনের প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত ও অদক্ষ রূপে বিবেচিত হয়, তখন রলসীয় গণতান্ত্রিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। নোজিক যে কোনোরকম পুনর্বন্টন প্রকল্পের ন্যায়নীতিকে অস্বীকার করেন। তাঁর নিকট যেটা প্রয়োজন সেটা হল শান্তি, শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা।

রলসের যুক্তি ব্যক্তির অধিকারের পরিবর্তে সামাজিক বাধ্যবাধকতা দিয়ে শুরু হয়। রলসীয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে নোজিকের প্রধান অভিযোগ হল যে, রলসীয় ন্যায়নীতিতত্ত্বে 'ব্যক্তি' অরক্ষিত রয়ে গেছে। নোজিকের মতে ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রয়োজন তার নিজস্ব সম্পত্তি বা প্রতিভাকে রক্ষা করার জন্য। সমাজের সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তির স্বাধীনতা প্রয়োজন হয় না। সুতরাং নোজিক চান রাষ্ট্রের ক্ষমতা যত কম হয় তত ভালো। রাষ্ট্র অভিভাবকের মতো ব্যক্তিকে দেখাশোনা করবে এই নীতি নোজিকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

নোজিক মন্তব্য করেন যে, ন্যূনতম রাষ্ট্রের ধারণা হৃদয়কে রোমাঞ্চিত করে না অথবা জনগণকে সংগ্রাম বা ত্যাগে উৎসাহিত করে না। এইখানে তিনি লক-এর থেকে আলাদা। লকীয় রাষ্ট্রে জনগণ ব্যক্তির ও সম্পত্তির নিরাপত্তায় আগ্রহী ছিলেন, তাঁর বেশী কিছু নয়। অপরপক্ষে, জে. এস. মিল মূলতঃ 'উচ্চতর সুখের' উন্নতিবিধানে চিন্তিত ছিলেন। সেই কারণে তিনি জীবন পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং উন্নয়ন নিয়ে আগ্রহী ছিলেন। নোজিক তাঁর 1974 সালে প্রকাশিত গ্রন্থে 'A Framework for Utopia' শীর্ষক শেষ অধ্যায়ে জে. এস. মিলের মতের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন।

নোজিকের ন্যূনতম রাষ্ট্রের মতাদর্শ ছিল নয়া-উদারনীতিবাদী রাজনীতির কাছে আকর্ষণের বস্তু, কিন্তু তা নয়া-উদারনীতির রাজনীতিকে অতিক্রম করে যায়। নোজিকের প্রধান যুক্তি হলো, ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা সর্বজনীনভাবে গৃহীত নৈতিক নীতি যা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, অধিকারসমূহ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সুতরাং তার সঙ্গে কোনভাবেই আপোষ করা যায় না। এই প্রেক্ষাপটে নোজিক তাঁর ন্যূনতম রাষ্ট্রের তত্ত্ব গড়ে তোলেন। তিনি অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রকে অযৌক্তিক বলে গণ্য করেন। তিনি তাঁর ন্যায়নীতিতত্ত্বে এই মত পোষণ করেন যে, বন্টনগত ন্যায়নীতি রাষ্ট্র কর্তৃক নির্দেশিত বা আরোপিত হওয়া উচিত নয়, এটা ব্যক্তির দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত।

৩.০৬ পরবর্তী ভাবনা (Later Developments)

নোজিকের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ Anarchy, State and Utopia (1974) তাঁকে কল্যাণবাদী-বিরোধী (anti welfarist) রাষ্ট্রদার্শনিক রূপে বিখ্যাত করে এবং নয়া-উদারনীতিবাদের মতাদর্শে তিনি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নোজিক তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে অন্যদিকে সরে যান। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থসমূহ Philosophical Explanations (1981), **The Nature of Rationality** (1993)-তে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মতামতের সঙ্গে মতপার্থক্য দেখা যায়। তাঁর The Examined Life গ্রন্থে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কিছুটা সংশোধন করেছেন। সমালোচকরা বলেন যে, তাঁর মূল স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত দার্শনিক ভিত্তির অভাব লক্ষিত হয় পরবর্তী গ্রন্থগুলোতে।

৩.০৭ উপসংহার (Conclusion)

নিঃসন্দেহে রবার্ট নোজিক অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিমুক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী (লিবারটেরিয়ান) দার্শনিক। প্রধানতঃ জন রলসের ন্যায়নীতি সংক্রান্ত তত্ত্বের বিরোধিতার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রাষ্ট্রচরিত্র বিচারে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে রাষ্ট্রবিরোধী সহমত পোষণ করলেও নৈরাজ্যবাদীদের থেকে তাঁর অবস্থান কিছুটা আলাদা। তিনি রাষ্ট্রের পুরোপুরি অবসানের পরিবর্তে 'ন্যূনতম রাষ্ট্রের' ধারণায় বিশ্বাসী।

রাষ্ট্র দর্শনের ব্যক্তিমুক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী (লিবারটেরিয়ান) মতবাদে স্পষ্টতঃ দুটি ধারা দেখা যায়। একটি ব্যক্তিগত অধিকারের উপর গুরত্ব দেয়, আর অন্যটি laissez-faire অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর গুরুত্ব দেয়। ব্যক্তিমুক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী (লিবারটেরিয়ান) মতবাদের প্রথম ধারার প্রবক্তারা মনে করেন ব্যক্তি তার শ্রমের মাধ্যমে যে সম্পত্তি তৈরী করছে তার উপরে তার স্বত্বাধিকার থাকে। আর দ্বিতীয় ধারার প্রবক্তারা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। আধুনিক সময়ে ব্যক্তিমুক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী (লিবারটেরিয়ান) মতবাদের প্রথম ধারার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি হলেন রবার্ট নোজিক। অবশ্য দুটি ধারার প্রবক্তারা সম্পদের পুনবন্টন ও সামাজিক ন্যায় পরিষেবার ক্ষেত্রে সরকারের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করেন।

যদিও ঐতিহাসিক বিচারে ব্যক্তিমুক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (libertarianism) ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের সঙ্গে সংযোগের দাবী করে, কিন্তু চরিত্রের দিক থেকে বিচার করলে ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্যবাদ উদারনীতিবাদের থেকে স্বতন্ত্র।

নোজিক রলসীয় কল্যাণবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি যে কোন রকমের রাষ্ট্র-পোষিত পুনর্বন্টিত ন্যায়নীতির ধারণা নস্যাৎ করেন। নোজিকের ব্যক্তিমুক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তির 'অধিকার' (Rights)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে কিন্তু সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্বকে উপেক্ষা করে। এই মতবাদ ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও দক্ষতার মূল্য দেয় কিন্তু তা যে সামাজিক পরিবেশের ফসল এটা বুঝতে ব্যর্থ হয়।

নোজিক মানব সমাজের বিবর্তনকে বিবেচনার মধ্যে আনেন নি। তিনি তাঁর দার্শনিক বিশ্লেষণ জন লক-কে দিয়ে শুরু করেছেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল-এর মতো গ্রীক দার্শনিকদের রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বক্তব্যকে উপেক্ষা করেছেন। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো, সমগ্র সমাজের স্বার্থে ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার ও স্বাধীনতা কেন সীমায়িত করা যাবে না এই প্রশ্নের উত্তর দিতে নোজিক ব্যর্থ হয়েছেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, নোজিকের 'ন্যূনতম রাষ্ট্র' এই যুক্তিতে অবশ্যই ব্যর্থ যে, কর ধার্য (taxation) সম্পর্কে নোজিকের কোনো স্পষ্ট বক্তব্য পরিলক্ষিত হয় না। ন্যূনতম রাষ্ট্র কীভাবে তার ন্যূনতম ব্যয় মেটাবে সে ব্যাপারে দিকদর্শন করাতে নোজিক ব্যর্থ হয়েছেন।

৩.০৮ গ্রন্থসূচী

১. S. L. Newman, Liberalism at Wits' End : The Libertarian Revolt aganist the Modern State.

২. G. F. Gaws and C. Kukathas (eds), Handbook of Political Theory

৩. A. Swift, Political Philosophy

৪. W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy (1990)

৫. R. Bhargava and A. Acharya (eds.) Political Theory : An Introduction

৬. W. T. Bluhom, Theories of the Political system

৭. J. Paul (ed), Reading Nozick

৮. J. Wolff, Robert Nozick : Property, Justice and the Minimal State (1991)

৯. M. Freeden, The New Liberalism

১০. G. A. Cohen, "Nozick on Appropriation", *New Left Review* (1985)

১১. Brain Lund, "Robert Nozick and the Politics of Social Welfare", ***Political Studies*** (1996)

১২. Asok Kumar Mukhopadhyay, 'Robert Nozick: Exponent of Liberal Political Philosophy', (in Bengali), *The calcutta journal of Political Studies* (New series), Calcutta University, April 2003–March 2005.

৩.০৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Suggested Questions)

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নসমূহ ঃ

১। নয়া উদারনৈতিকবাদ সমূহ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

২। নোজিকের নয়া উদারনীতি তত্ত্বের প্রাণকেন্দ্রে যে বক্তব্য রয়েছে তার তাত্ত্বিক নাম কি?

৩। কান্টীয় দর্শনের প্রতি নোজিকের ঋণের বিস্তৃতি (extent of indebtedmass) উল্লেখ কর।

৪। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ থেকে নোজিক কী অনুপ্রেরণা লাভ করেন?

৫। 'স্বত্বাধিকার' (entitlement) বলতে নোজিক কী বুঝিয়েছেন?

৬। নোজিকের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কী এবং তা কোন সালে প্রকাশিত হয়?

৭। নোজিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারে তত্ত্বের প্রধান উপাদানগুলি কী?

৮। নোজিক 'ন্যূনতম রাষ্ট্র' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

৯। বন্টনের ন্যায়নীতির বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য নোজিক কোন দুটি ধারণা ব্যবহার করেছেন?

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক (প্রবন্ধাকার) প্রশ্নসমূহ ঃ

১। নোজিকের নব-উদারনীতিবাদী তত্ত্বের সঙ্গে নৈরাজ্যবাদী তত্ত্বের তুলনা কর।

২। জন রলসের তাত্ত্বিক অবস্থানকে নোজিক কীভাবে সমালোচনা করেছেন তা ব্যাখ্যা করো।

৩। নোজিকের ন্যায়নীতিসম্মত স্বত্বাধিকার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করো।

৪। নোজিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির তত্ত্ব বিশ্লেষণ কর।

৫। নোজিকের 'ন্যূনতম' রাষ্ট্রের তত্ত্বটির মূল্যায়ণসহ ব্যাখ্যা করো।

৬। নোজিকের "ন্যূনতম রাষ্ট্রের ধারণা" তার সমালোচকরা কেন গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না?

৭। নোজিকের রাষ্ট্রতত্ত্বের সমালোচনা কর।

একক—৪ ❑ কৌমবাদ (Communitarianism)

গঠন

৪.০১ ভূমিকা

৪.০২ উদারনৈতিকতাবাদের সংকট ও পশ্চিমী উদারনৈতিক সমাজ

৪.০৩ রলস্-এর নয়া-কন্টীয় উদারনৈতিকতাবাদের সমালোচনা

৪.০৪ রলসীয় উদারনীতিবাদের কৌমবাদী উল্লেখযোগ্য প্রবক্তাবৃন্দ সমালোচনা

৪.০৫ কৌমবাদের উল্লেখযোগ্য প্রবক্তাবৃন্দ (ম্যাকাইন্টয়ার, স্যান্ডেল, টেলর, ওয়ালৎজার)

৪.০৬ কৌমবাদী বক্তব্যের কৌমবাদের মূল্যায়ণ

৪.০৭ উপসংহার

৪.০৮ গ্রন্থসূচী

৪.০৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারা যাবে ঃ

(১) কৌমবাদ বলতে কী বোঝায়?

(২) উদারনীতিবাদের সমালোচকরূপে কৌমবাদের মূল বক্তব্য কী।

(৩) কৌমবাদের প্রতিষ্ঠিত প্রবক্তাদের চিন্তা।

(৪) কৌমবাদের সীমাবদ্ধতা।

৪.০১ ভূমিকা (Introduction)

রাজনৈতিক তত্ত্বে আধুনিক উদারনৈতিক রাজনৈতিক চিন্তার সমালোচক এরকম কিছু সংখ্যক ব্যক্তির ধারণাকে বোঝাতে 'কমিউনিটারিয়ানইজম' বা 'কৌমবাদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কৌমবাদীরা 'ব্যক্তি'র পরিবর্তে 'কৌম'র উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করেন। সমাজতত্ত্বে কৌম বা সম্প্রদায় (community) বলতে নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী একদল মানুষকে বোঝায় যাদের নিজেদের মধ্যে অভিন্নতার কারণে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ টোএনিস 'Gemeinschaft' (কৌম বা community) এবং 'Gesellschaft' (সমাজ বা society)-র মধ্যে পার্থক্য করেন। প্রথমটির ক্ষেত্রে আবেগ, ব্যক্তিগত পছন্দ এবং আবেগপূর্ণ অভিন্নতার মনোভাবের ভিত্তিতে মুখোমুখি এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়টি একত্রিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্বার্থ ও যুক্তির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। সামাজিক সম্পর্কের বিচারে ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্র রূপে 'কৌম' এবং বৃহত্তর ক্ষেত্র রূপে 'সমাজ' ব্যবহৃত হয়। সাবেকি রক্ষণশীল চিন্তা এই ধারণার উপর গুরুত্ব আরোপ করে যে, 'কৌম' বা সম্প্রদায় উৎপত্তির ক্ষেত্রে গ্রামে বা কাছাকাছি বাস করে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে রক্ত, আত্মীয়তা ইত্যাদির মতো সাধারণ সম্পর্কগুলি লক্ষ্য করা যায়। আর 'সমাজ' গড়ে ওঠে বৃহত্তর পরিসরে বৃত্তিগত পরিচয়, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও রাজনৈতিক আনুগত্যের ভিত্তিতে।

রক্ষণশীল ও সমাজতন্ত্রীরা কৌমের বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের জন্য বিভিন্ন উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও তারা উভয়েই সামাজিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দেন। এঁরা মনে করেন যে, একত্রে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির সম্মতি বা স্বার্থ অপেক্ষা সামাজিক সম্পর্কের গুরুত্ব বেশী। উদারনৈতিকতাবাদীরা এইরকম চিন্তার ক্ষেত্রে উদাসীন ছিলেন। কারণ যাই হোক, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দর্শনরূপে কৌমবাদের উদ্ভব ঘটে ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকে। এই তত্ত্ব বিশেষ করে উদারনৈতিকতাবাদের সমালোচকরূপে গড়ে ওঠে। এই তত্ত্বে পশ্চিমী রাষ্ট্রদর্শনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে এই তত্ত্বকে কয়েকজন তাত্ত্বিকের ভাবনা বলে অভিহিত করা সঠিক।

রবার্ট পুটনাম ১৯৯০-এর দশকে 'সামাজিক পুঁজি' (social capital) ধারণাটি প্রচলন করেন। এটা তাঁর গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সামাজিক পুঁজিকে মূলতঃ কৌম (community) সম্পদ রূপে গণ্য করা যেতে পারে। সামাজিক পুঁজি বলতে সামাজিক সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বোঝায়, যেমন বিশ্বাস, নীতি এবং ব্যবস্থাপনা যা সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে সহযোগী কাজের মাধ্যমে। দার্শনিকগতভাবে পুটনামের 'সামাজিক পুঁজির' ধারণা কৌমের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। গণতন্ত্রকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে 'কৌম' গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রে কৌমের ওপর এই ঝোঁক দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উদারনৈতিকতাবাদের সমালোচনার ইঙ্গিত দেয়।

কখনও মাঝে মধ্যে তথাকথিত 'high' এবং 'low' কৌমবাদী রূপ লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ দার্শনিক বিতর্কের (Philosophical debates) মাধ্যমে কৌমবাদের উচ্চ ('high') রূপটি মূর্ত হয়ে ওঠে, আর

কৌমবাদের নিম্ন ('low') রূপটি জননীতি (public policy) নিয়ে বেশী চিন্তিত। পুটনাম ব্যক্তি স্বাধীনতায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তিনি মনে করেন যে, কৌম সাধারণ স্বার্থ এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনভাবে পছন্দের সংস্থা।

এই কারণে কৌমবাদ ও উদারনৈতিকতাবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। কৌমবাদীরা সামাজিক প্রেক্ষিত ও ব্যক্তিবর্গের আত্ম-ধারণার (self conception) মিথষ্ক্রিয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আর উদারনৈতিকতাবাদীরা ব্যক্তির উপর গুরুত্ব দেন। আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তায় বিভিন্নভাবে কৌম নিয়ে আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। সমাজতন্ত্রীরা সহযোগিতা (co-operation) এবং ভ্রাতৃত্বের (fraternity) উপর গুরুত্ব দেন, মার্কসবাদীরা শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে বিশ্বাস করেন।

৪.০২ উদারনৈতিকতাবাদের সংকট ও পাশ্চাত্ত্য উদারনৈতিক সমাজ

পাশ্চাত্ত্য উদারনৈতিক সমাজে সামাজিক দর্শনের একটি রূপ হিসাবে ১৯৮০-র দশকে কৌমবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কৌমবাদী তত্ত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উদারনৈতিকতাবাদের মতো ব্যক্তির অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে না, বরং তা ব্যক্তির সামাজিক দায়দায়িত্বের উপর গুরুত্ব দেয়। বলা যায় যে, কৌমবাদী তত্ত্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী উদারনৈতিকতাবাদের পদ্ধতিগত বিরোধিতার মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

কৌমবাদের বৌদ্ধিক উৎস একাধিক। জার্মান দার্শনিক হেগেল ও নয়া-হেগেলীয় ইংরেজ ভাববাদী দার্শনিক টমাস হিল গ্রীন কৌমবাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিতের ব্যবস্থা করেছিলেন। হেগেলের Sittlichkeit (ethical life) ধারণা বলতে বোঝায় সমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সকল objective values আছে এবং ব্যক্তির নিজস্ব subjective values আছে তাদের shared values কে হেগেলের ভাষায় কৌমের আত্মসত্তাকে বোঝায়। গ্রীন নাগরিকতার দায়দায়িত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের ঐতিহ্যে Fraternity (সহধর্মিতা, সৌভ্রাতৃত্ব)র ধারণা দেখা, এবং যখন নৈরাজ্যবাদী ঐতিহ্যে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের পরিবর্তে কৌমের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

পশ্চিমী উদারনৈতিক সমাজে (বিশেষতঃ আমেরিকান সমাজে) ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে যে সংকট দেখা দেয় তার বৌদ্ধিক উত্তর রূপে কৌমবাদের আর্বিভাব। এই সংকটকে উদারনৈতিকতাবাদের পার্শ্বশাখা রূপে দেখা হয়, বিশেষতঃ অত্যধিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সংকট বলে দেখা হয়। অন্যান্য আর্থ-সামাজিক উপাদানের সঙ্গে, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের ফলে বৃহৎ আকারে সমাজ বিচ্ছিন্নতা এবং তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অশুভ লক্ষণ দেখা যায়।

H. Hadenius সম্পাদিত 'Democracy's Victory and Crisis' (1997) গ্রন্থে অন্তভুক্ত রবার্ট পুটনাম তাঁর 'Democracy in America at century's End' প্রবন্ধে আমেরিকার সামাজিক সংকট সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ

"A world in which we distrust one another is a world in which social collaboration is a bad gamble, a world in which democracy itself is less safe."

আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল বেল নিজে একজন কৌমবাদী হিসেবে পশ্চিমী সমাজের সামাজিক সংকটের কিছু উপাদানকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন যে, The communitarians were "worried by unshackled greed, rootlessness, alienation from the political process, rises in the rates of divorce and all other phenomena related to a centering on the self and away from communities in contemporary western societies" [দ্রষ্টব্য ঃ D. Bell, Communitarianism and Its critics (1993)]

ঐ একই গ্রন্থে তাঁদের আন্দোলনের লক্ষ্য রূপে কৌমবাদীরা যে প্রচারপত্র প্রচারিত করেন যাকে আমেরিকান কৌমবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী ও লক্ষ্য বলা যায় সেখানে বেল-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "The Reponsive Communitarian Platform : Rights and Responsibilities" (1991) শীর্ষক প্রচার পত্রে ড্যানিয়েল বেল মন্তব্য করেন ঃ

"American men, women and children are members of many communities—families; neighbourhoods; inumerable social, religious, ethnic, workplace and professional associations; and the body politic itself. Neither human existence nor individual liberty can be sustained for long outside the interdependent and overlapping communities to which we all belong. Nor can any community long survive unless its members dedicate some of their attention, energy and resources to shared projects. The illusive pursuit of private interests erodes the network of social environment, on which we all depend, and is destructive to our shared experiments in democratic self-government. For these reasons, we hold that the rights of individuals cannot long be preserved without a communitarian perspective. A communitarian perspective recognizes both individual human dignity and the social dimension of human existence."

বেল-বর্ণিত উপরোক্ত মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, কৌমবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে এক ধরণের নৈতিক বিষয় (moral issue) জড়িত রয়েছে। সামাজিক সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধানে এবং উদারনৈতিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সংকট মোকাবিলাতে নৈতিক বিষয়ের প্রয়োজন। ভঙ্গুর কৌমজীবনকে শক্তিশালী করা দরকার এবং সেইজন্য কৌমজীবনের ক্ষয় রোধ করতে পারে এমন এক রাষ্ট্র দর্শনের প্রয়োজন। ব্যক্তির পরিবর্তে

কৌমের উপর গুরুত্ব প্রদানের জন্য এবং নৈতিক বিষয়গুলি তুলে ধরার জন্য কৌমবাদী তত্ত্ব প্রয়োজনীয় দার্শনিক রূপরেখা নির্মাণ করে।

৪.০৩ রলস্-এর নয়া-কান্টীয় উদারনীতিবাদের সমালোচনা (Critique of Rawls's Neo-Kantian Liberalism)

রাজনৈতিক তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে কৌমবাদীরা রলসীয় উদারনীতিবাদের সমালোচনা করেন। ১৯৭১ সালে রলসের গ্রন্থ A Theory of Justice প্রকাশিত হয়। রলস্ উপযোগবাদকে সমালোচনার মাধ্যমে তাঁর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বন্টনগত ন্যায়নীতিতত্ত্ব গড়ে তোলেন। রলস্ উদারনীতিকে এক সংবেদনশীল মানবিকরূপ দেন। রলসের উপরোক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে রাষ্ট্রদর্শনে উদারনীতির তাত্ত্বিক আলোচনা রলসকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে। কেউ রলসের পক্ষে, আবার কেউ রলসের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। রলস্ উপযোগিতাবাদের সমালোচনার মাধ্যমে তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। তিনি ১৯৬০-এর দশকে বামপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীরও সমালোচনা করেন। জন লকের 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতার' ঐতিহ্যের সঙ্গে রুশোর 'সাধারণ মঙ্গলের' ঐতিহ্যকে রলস সমন্বিত করতে চেয়েছেন এবং এক্ষেত্রে কান্টের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নীতি পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে। রলসের রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্তর্নিহিত নীতি হল মানুষের মৌল স্বাধীনতাগুলিকে সুরক্ষিত করা। রলসীয় রাজনৈতিক উদারনীতির মূল বক্তব্য হলো 'সামাজিক মঙ্গলের' চেয়ে ব্যক্তির 'অধিকার' অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে বাম সমালোচনার প্রধান স্বর হল যে, স্বাধীনতা বাস্তবায়নের জন্য যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রয়োজন উদারনীতিবাদ সে সম্পর্কে নিশ্চুপ। এই কারণে মতাদর্শ রূপে উদারনীতিবাদ সমৃদ্ধশালী শ্রেণীর স্বার্থ সুরক্ষিত করে। বাম সমালোচনার প্রত্যুত্তরে রলস্ বলেন যে, উদারনৈতিক সাম্য দাবী করে অসম দক্ষতা ও সামর্থ্যের জন্য কমপক্ষে অংশতঃ ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন। সুতরাং সম্পদের ন্যায় সম্মত বন্টনের জন্য সরকারের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।

অসম শক্তি ও প্রতিভার কাছে আবেদন করে অসাম্যকে সমর্থন করা যায় না। অসম বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বর্জন করতেই হবে, কারণ অসম সামাজিক অবস্থান কখনই অধিক ক্ষমতা, সম্পদ ও স্বীকৃতির স্বত্তাধিকার দেয় না। সুতরাং যুক্তির পথ ধরেই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় যার সাহায্যে জাগতিক সম্পদের ন্যায়সম্মত বন্টন সুনিশ্চিত করা যেতে পারে। রলসীয় ন্যায়নীতি এই কথাই বলে যে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ব্যতীত সমাজের সম্পদ পুনর্বন্টনের কাজ ন্যায়সম্মতভাবে করা যায় না।

৪.০৪ রলসীয় উদারনীতিবাদের কৌমবাদী সমালোচনা (Communitarian Critique of Rawlsian Liberalism)

উদারনীতিবাদের সব সমালোচক নিজেদের 'কৌমবাদী আন্দোলনের'এর সঙ্গে যুক্ত করেন নি। কৌমবাদী প্রেক্ষিতে উদারনীতিবাদের বড়ো ত্রুটি হল যে, উদারনীতিক ব্যক্তিকে (Individual) 'সামাজিক দায়মুক্ত' ব্যক্তিসত্তা ('unencumbered self') হিসেবে দেখে। উদারনীতিবাদ ব্যক্তিকে তার লক্ষ্য থেকে আলাদা বলে মনে করে। অন্যদিকে কৌমবাদীরা মনে করেন যে, লক্ষ্যের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তা গঠিত হয়।

ন্যায়নীতির উদারনীতিবাদী তত্ত্ব ব্যক্তিগত পছন্দ ও ব্যক্তির আচরণের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। কৌমবাদীরা মনে করেন যে, ন্যায়ের তত্ত্ব সবসময় সর্বজনীন প্রয়োগে বৈধ নয় এবং এই তত্ত্ব সবসময় স্থানীয় ও নির্দ্দিষ্ট। কৌমবাদীদের এই অবস্থান কিছুটা উত্তর-আধুনিক মতাদর্শের সংগে সাদৃশ্যমণ্ডিত।

কৌমবাদীরা বলেন যে, তাঁদের মূল উদ্দেশ্য হল আধুনিক সমাজে ও রাজনৈতিক চিন্তার জগতে যে ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয় তা সংশোধন করা। তাঁদের মতে আধুনিক সমাজে ব্যক্তিকে কেবলমাত্র নিজস্ব স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য উৎসাহিত করা হয়। সেখানে সামাজিক কর্তব্য ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের কোনও কথা নেই। এই সামাজিক নৈতিকতাহীন অবস্থায়, আক্ষরিক অর্থে, সমাজ ভঙ্গুর হয়ে যায়। কৌমবাদী প্রকল্প (project) তাই সমাজে নৈতিক স্বর পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করে এবং এমন একটা ঐতিহ্যে ফিরে যেতে চায় যা অ্যারিস্টটলের মধ্যে দেখা যায়। 'সাধারণ মঙ্গলের রাজনীতি' (politics of the common good) নির্মাণের চেষ্টা করে কৌমবাদীর। যাই হোক, কৌমবাদের বিরুদ্ধে সমালোচকদের অভিযোগ হলো, এর মধ্যে রক্ষণশীল ও কর্তৃত্বমূলক প্রবণতা দেখা যায়।

কৌমবাদ বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো ও নৈতিক বিধি রক্ষায় আগ্রহী। এটা কৌমবাদের রক্ষণশীল অবস্থানকে সূচিত করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, পরিবারকে রক্ষা করার নামে সনাতনী যৌন ভূমিকার (sex role) সমর্থন করায় নারীবাদীরা কৌমবাদের সমালোচনা করেন। কৌমবাদে ব্যক্তির অধিকার ও স্বতাধিকার অপেক্ষা তার সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্বের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে কৌমবাদের কর্তৃত্বমূলক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। উইলিয়াম কিম্‌লিকা এবং ভিখু পারেখ কৌমবাদের এই প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

রলস্ বন্টনগত ন্যায়নীতির (distributive justice) ক্ষেত্রে কৌমকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেওয়ায় কৌমবাদী দার্শনিকবৃন্দ রলসের সমালোচনা করেন। তাঁদের মতে, কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির কী পাওয়া উচিত তার পরিবর্তে কৌমের পক্ষে মঙ্গল কী এটাই রাজনৈতিক সমাজের বিচার্য হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন।

কৌমবাদীরা মনে করেন যে, 'অধিকার' (right) এবং মঙ্গল (good)-এর সংজ্ঞা নির্ধারণে

রাজনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্লেটোর মতো, কৌমবাদীরাও বিশ্বাস করেন যে, মানুষ সুস্থ বা মঙ্গলময় জীবন অর্জন করতে পারে যদি তারা ভালোভাবে কোন সুপরিচালিত সমাজে বাস করে। অতি অবশ্যই এটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে।

নিজে একজন কৌমবাদী হওয়া সত্ত্বেও ১৯৯০-এর দশকে মাইকেল ওয়ালৎজার স্বীকার করেন যে, কৌমবাদী সমালোচনার সমস্যা হল যে, এই তত্ত্ব উদারনৈতিকবাদের বিরুদ্ধে দুটি পৃথক ও বিরোধমূলক যুক্তির পরামর্শ দেন। প্রথম যুক্তিটি মূলতঃ রাজনীতিতে উদারনৈতিকতার প্রয়োগের দিকটির প্রতি এবং দ্বিতীয় যুক্তিটি উদারনৈতিক তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করে নির্মিত। কিন্তু দুটিই ঠিক হতে পারে না। এটা হয়তো সম্ভব যে, প্রত্যেকটি অংশতঃ সত্য। [Michael walzer, "The communitarian Critique of Liberalism", *Political Theory*, Vol 18 (1), February, 1990]

কৌমবাদীরা বলেন যে, উদারনৈতিক তত্ত্ব বাস্তবজীবনকে ভুলভাবে উপস্থাপিত করে। উদারনৈতিক তত্ত্ব মনে করে যে, পুরুষ ও নারী সকলেই আক্ষরিক অর্থে সামাজিক দায়মুক্ত এবং অনুসরণ করার মতো সাধারণ কোন মূল্য (value) তার সামনে নেই। এটা বাস্তবের সঠিক চিত্র নয়। কৌমবাদীরা মনে করেন উদারনৈতিকবাদীরা বাস্তবকে বিকৃত করেছেন। মানুষ বাস্তবে কৌমবাদী জীব। আমেরিকার জনগণের সামাজিক জীবনে চার ধরনের সচলতা (mobility) লক্ষ্য করা যায়। এইগুলি হল—ভৌগোলিক সচলতা (geographical mobility), সামাজিক সচলতা (social mobility), বৈবাহিক সচলতা (marital mobility), এবং রাজনৈতিক সচলতা (political mobility)। এই কারণে, ওয়ালাৎজার যুক্তি দেন যে, তত্ত্ব হিসাবে উদারনৈতিকতাবাদের পর্যায়ক্রমিক ভাবে মাঝে মাঝে কৌমবাদী সংশোধন প্রয়োজন।

৪.০৫ কৌমবাদের প্রধান প্রবক্তাগণ (Leading Figures of Communitarianism)

কৌমবাদী 'আন্দোলন' উদারনৈতিক রাষ্ট্রতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কৌমবাদের থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। সকল কৌমবাদী তাত্ত্বিকেরা কৌমবাদী আন্দোলনের সংগে যুক্ত ছিলেন না। উদারনৈতিক, রক্ষণশীল ও বামপন্থী এই তিন ধরনের কৌমবাদী অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব। রলসীয় উদারনীতিবাদের সমালোচনায় কৌমবাদের তাত্ত্বিক প্রবক্তাদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কৌমবাদী দার্শনিকদের মধ্যে চারজন তাত্ত্বিকের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা হলেন অ্যালাসডেয়ার ম্যাকইনটায়ার, মাইকেল স্যান্ডেল, মাইকেল ওয়ালৎজার এবং চার্লস টেলর। রলসীয় উদারনীতিবাদের সমালোচনায় এদের যুক্তিবিন্যাস ও সিদ্ধান্ত এক নয়। কিন্তু তাঁরা সকলেই একটি বিষয়ে সহমত প্রকাশ করেন যে, রলসীয় উদারনীতিবাদ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তা এবং সাম্প্রতিক বিশ্বের কল্যাণ বিচারের ক্ষেত্রে কৌমের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে নি।

ড্যানিয়েল বেল রলসীয় উদারনীতিবাদের কৌমবাদী সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হল ঃ ব্যক্তিসত্তা (self) বিশ্বজনীনতা (universalism) অণুত্ববোধ (atomism)।

প্রথমত, মাইকেল স্যান্ডেল যুক্তি দেন যে, মানুষ তাদের সকল সামাজিক সম্পর্ক নিজে পছন্দ করে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পিতামাতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতির মনোভাব ইত্যাদি। ব্যক্তি ব্যক্তিগত পছন্দের ভিত্তিতে পরিবার বা নেশনের সদস্য নয়, যেমনভাবে তারা তাদের জীবনসঙ্গীকে পছন্দ করে।

দ্বিতীয়ত, মাইকেল ওয়ালৎজার-এর বক্তব্য হলো, মানুষ মাত্রই তার নিজস্ব সামজিক শিকড় খুঁজতে চায় যাতে সে তার সহ-নাগরিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের যথাযথ অর্থ খুঁজে পায়। মানুষের নিজস্ব জীবনচর্চায় এবং সহমতের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভাব ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে তার ধারণা গড়তে পারে। সেকারণে দার্শনিকেরা ইতিহাসভিত্তিক সামাজিক আদর্শ ও সংখ্যার সাহায্য নিয়ে তাঁদের তত্ত্ব নির্মাণ করেন, এবং ন্যায়নীতির কোন বিশ্বজনীন ধারণা অনুসরণ করেন না।

তৃতীয়ত, চালর্স টেলর রলসীয় উদারনীতি সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি জানিয়েছেন এই কারণে যে তা রাষ্ট্রিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সামাজিক-রাজনীতিক স্বাধীনতা খর্ব করে। রলসীয় উদারনীতি আর্থিক ভোগ্যবস্তু যেভাবে বন্টন করতে চায় তার নৈতিক বৈধতা নিয়েই টেলর প্রশ্ন তুলেছেন, কারণ তিনি মনে করেন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ও আইনের মাধ্যমে ন্যায়নীতিসম্মত বন্টন ব্যবস্থায় কৌমের আত্মসত্তা, পারস্পরিক বন্ধুত্ব অথবা ঐতিহ্যের অস্মিতা নষ্ট হয়ে যায়।

মূল কথা হলো, কৌমবাদী দার্শনিকদের আশংকা এইখানে যে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অতিসক্রিয়তার ফলে আর্থনীতিক প্রতিযোগিতা, এমন কি পরিবারগত ও সামাজিক বন্ধন, সীমিত এবং ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁরা তখনই এবং ততটুকুই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ অনুমোদন করেন যখন রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের মাধ্যমে কৌম মনোভাব জাগিয়ে তোলা বা তার শক্তিবৃদ্ধি করার চেষ্টা হয়। কিন্তু রাষ্ট্র যখনই 'সাধারণ মঙ্গল' (common good) কিসে হবে সে ব্যাপারে কর্তত্ববাদী মনোভাব বা নীতি গ্রহণ করে তখনই কৌমবাদী দার্শনিকরা প্রবল আপত্তি জানান।

যাহোক, কৌমবাদী দর্শন অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই দর্শনের প্রধান চার প্রবক্তার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সাহায্য করবে। এখানে তাঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

অ্যালাসডেয়ার ম্যাকইনটায়ার (Alasdair Macintyre) (জন্ম ঃ ১৯২৯) স্কটিশজাত নৈতিক দার্শনিক অ্যালাসডেয়ার ম্যাকইনটায়ার নয়া-ধ্রুপদী এবং উদারনৈতিক-বিরোধী কৌমবাদী দর্শনের প্রবক্তা। তাঁর মতে, উদারনীতিবাদ সামাজিক ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তির অনুধাবন করতে অক্ষম। ম্যাকইনটায়ারের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ঃ **আফটার ভার্চু (After Virtue) (1981)** হুজ জাস্টিস? হুইচ র‍্যাশনালিটি? **(Whose Justic? Which Rationality? (1988)**।

ম্যাকইনটায়ারের বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু হল পশ্চিমী নৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির উৎপত্তি, বিকাশ ও অবক্ষয়। তিনি নৈতিক দর্শনের নানা বিষয়াদি ব্যাখ্যা করেন। তিনি তাঁর বিশ্লেষণে সাধারণভাবে উদারনীতিবাদের এবং বিশেষ করে রলসের বক্তব্যের উল্লেখ করেন।

তিনি মনে করেন যে, ব্যক্তির পরিচিতির ক্ষেত্রে কৌমজীবনের যে গুরুত্ব রয়েছে উদারনীতিবাদ তাকে গুরুত্ব দেয় না। আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রে বিভিন্ন বিরোধী নৈতিক অবস্থান থেকে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এই বিতর্কের কোনও যৌক্তিক সমাধান সম্ভব নয়। কারণ, প্রত্যেকের মত তার নিজস্ব যুক্তির দ্বারা সমর্থিত হয়। তাঁর মতে ব্যক্তির ইচ্ছাসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফল হল নৈতিক তর্ক। কিন্তু যে ভাষায় এই তর্ক চলে তাতে মনে হতে পারে যে, এর মীমাংসা হচ্ছে। নৈতিক দর্শনের ধারাকে অনুসরণের মাধ্যমে তিনি একে আখ্যা দেন 'ইমোটিভিজম'। এই দর্শন অনুসারে নৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটে।

ব্যক্তিগত পছন্দ-অপচ্ছন্দের প্রকাশ যা তার স্বেচ্ছাপ্রসূত সেটা চূড়ান্ত অর্থে ব্যক্তিসত্তার নৈতিক অবস্থান বলে গণ্য হয়। যুক্তিগত উপায়ে এর নায্যতা অন্যের কাছে প্রমাণ করা যায় না। ম্যাকইনটায়ার একে 'ইমোটিভিষ্ট সেলফ' বলে আখ্যা দেন। কোনও সামাজিক প্রেক্ষিতের মধ্যে এই সত্তা দেখতে পাওয়া যায় না। এই ব্যক্তিসত্তা সামাজিক বিশিষ্টতা-বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে বিমূর্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সব কিছুকে বিচার করে। এই ব্যক্তিসত্তা হল 'সামাজিক দায়ভারমুক্ত' (unencumbered self)।

ম্যাকইনটায়ার 'Virtue'-এর ধারণা উপস্থিত করেন। মানব জীবনের কিছু নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। 'ভারচু' হচ্ছে সেই চারিত্রিক গুণ যার মাধ্যমে মানুষ পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয়। অ্যারিস্টটল মনে করতেন যে, নগররাষ্ট্রের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করার মধ্য দিয়ে মানুষ এই চারিত্রিক গুণ অর্জন করতে পারে। ম্যাকইনটায়ার অ্যারিস্টটলীয় নীতিশাস্ত্রের পুর্ননির্মাণে প্রয়াসী হন। তিনি তিনটি ধারণার কথা বলেন। সেগুলি হল ঃ অনুশীলন (practice), মানবজীবনের আখ্যানগত ঐক্য (Narrative unity of human life), এবং ঐতিহ্য (tradition)।

সমাজে প্রতিষ্ঠিত এমন এক সহযোগিতামূলক কার্য যার মাধ্যমে কার্যের উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাকে বলে 'অনুশীলন'। 'ভারচু' হল সেই গুণ যার মাধ্যমে কোনও অনুশীলনের অন্তর্গত উদ্দেশ্যকে সাধিত করা যায়। আখ্যানগত ঐক্য হল ব্যক্তিজীবনের ইতিহাসরূপে ব্যক্তির কোন কাজ বা আচরণকে ব্যাখ্যা করা। আর ঐতিহ্য হল ব্যক্তির সামাজিক উত্তরাধিকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঐতিহ্য গড়ে ওঠে অনুশীলনের মাধ্যমে। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে তা সঞ্চারিত হয়। কৌমবোধ এই ঐতিহ্যের মধ্য থেকে সৃষ্ট। এই তিনটি ধারণার মাধ্যমে ম্যাকইনটায়ারের কৌমবাদী চিন্তাটা পতিভাত হয়। তিনি বলেন, রলসের চিন্তায়

সমাজ গৌণ, ব্যক্তি মুখ্য। ম্যাকইনটায়ার অনুশীলন, আখ্যানগত ঐক্য ও ঐতিহ্য এই তিনটি পারস্পিরিক সম্পর্কিত ধারণার উপর মুখ্য গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা স্পষ্টতঃ তাঁকে একজন কৌমবাদী তাত্ত্বিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

মাইকেল স্যান্ডেল (Michael Sandel) (জন্ম ঃ ১৯৫৩) মাইকেল স্যান্ডেল আমেরিকান রাষ্ট্রদার্শনিক তাত্ত্বিক এবং রলসীয় উদারনীতিবাদের একজন খ্যাতনামা কৌমবাদী সমালোচক। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সামাজিক দায়ভারমুক্ত ব্যক্তিসত্তার (unencumbered self) কঠোর সমালোচক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হল—Liberalism and the Limits of Justice (1982) এবং Democracy's Discontent (1996)।

স্যান্ডেল উদারনীতিবাদের কৌমবাদী সমালোচক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Liberalism and the Limits of Justice (1982) রলসীয় উদারনীতিবাদ সম্পর্কে তাঁর সমালোচনার ফসল। এখানে স্যান্ডেল-এর বক্তব্য কৌমবাদী অবস্থান থেকে রলসের সমালোচনা সবচেয়ে সৃষ্টিশীল। স্যান্ডেল রলসের ন্যায়নীতির ধারণার সমালোচনা করেন। রলস-বর্ণিত প্রারম্ভিক অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ঘটে। রলসের 'ব্যক্তি' তার লক্ষ্য নিজে ঠিক করে। এই লক্ষ্য ব্যক্তির সাথে যুক্ত বা বিযুক্ত হয় স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের মাধ্যমে। স্যান্ডেল মনে করেন এটা সঠিক নয়। স্বাধীন ইচ্ছার মাধ্যমের পরিবর্তে কোনও গভীর আত্মোলব্ধির মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবনের লক্ষ্যের সাথে যুক্ত হয়। রলসের প্রারম্ভিক অবস্থানে ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন অবস্থান সম্পর্কে স্যান্ডেল অবাক হন। রলসীয় ব্যক্তিসত্তার ধারণাকে স্যান্ডেল অপরিণত বলে আখ্যায়িত করেন।

স্যান্ডেল মনে করেন যে, ব্যক্তিসত্তা গঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে যে সব আনুগত্য, লক্ষ্য, বিশ্বাস-জড়িত সেগুলি ছাড়া ব্যক্তিকে ভাবা যায় না। এইগুলি নিয়ে ব্যক্তি বেঁচে থাকে। এই আনুগত্যগুলি ইঙ্গিত দেয় যে, ব্যক্তি সমাজের কাছে দায়বদ্ধ।

রলস্ সমাজকে পারস্পরিক সুবিধার ওপর নির্ভরশীল সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা রূপে চিহ্নিত করলেও তিনি বিচ্ছিন্ন মানুষের ছবি উপস্থিত করেন, যে মানুষ সমাজ সম্পর্কে চিন্তিত নয় এবং দায়বদ্ধ নয়। রলস মানুষের সামাজিক দায়ভারমুক্ত ব্যক্তিসত্তার (unencumbered self) চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু স্যান্ডেল মনে করেন মানুষের ব্যক্তিসত্তা হলো 'embedded self'। তাই স্যান্ডেল মনে করেন যে, প্রকৃত উদারনীতিবাদে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা যায় না, ন্যায়নীতি হলো উদারনীতিবাদের সীমিত ধারণা।

চার্লস টেলর (Charles Taylor) (জন্ম ঃ ১৯৩১) একজন প্রখ্যাত কানাডিয়ান রাষ্ট্র দার্শনিক। তিনি রোমান ক্যাথলিক। তিনি মূলতঃ self বা ব্যক্তি সত্তা নির্মাণে মনোযোগ দেন। তিনি ব্যক্তিকে 'embodied individual' বলে চিত্রিত করেন। ব্যক্তিদের পরিচিতি বৃহতিকারে নির্ধারিত হয় তারা

যেখানে বাস করে তার ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং ভাষাগত প্রেক্ষিতে। অন্য কৌমবাদীদের সঙ্গে তাঁর অমিল এই অর্থে যে, তিনি সমাজ নয়, ব্যক্তিকে নৈতিক কার্যের উৎস রূপে গণ্য করেন। টেলরের প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থগুলির নাম Philosophical Papers (1985), **Sources of the Self** (1989), এবং Philosophical Arguments (1995)।

টেলরের চিন্তায় প্লেটো থেকে উত্তর-আধুনিকতাবাদ পর্যন্ত পশ্চিমী নৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি রলস্‌কে প্রান্তিক ভাবে ছুঁয়ে গেছেন। স্যান্ডেল বা ম্যাকইনটায়ারের মতো তিনি উদারনীতিবাদকে পুরোপুরি বাতিল করেন নি। উদারনীতিবাদের অনেক দাবীকে তিনি বিবেচনার যোগ্য মনে করেন।

টেলর উদারনীতিবাদের কৌমবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে মানুষ আত্মসমীক্ষাকারী (self-interpreting) প্রাণী। ভাষাগত কৌমজীবন থেকে মঙ্গলসম্পর্কিত ধারণা বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আসক্তি গড়ে ওঠে। টেলরের চিন্তার দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হল যে, নৈতিক বিচার ও সহজাত জ্ঞান যুক্তিসংগত ব্যাখায় সক্ষম।

টেলর এক নৈতিক পরিসরের (moral space) কথা বলেন যেখানে দাঁড়িয়ে ব্যক্তি সিদ্ধান্ত করেন কোনটা ভালো, কোনটা মূল্যবান ইত্যাদি। তাঁর মতে নৈতিক কাঠামো কৌম জীবন থেকে উদ্ভূত হয়।

টেলর সামাজিক জীবনে মূল্যবোধের পূর্ণমূল্যায়ণে অতিশয় মঙ্গল ('হাইপার গুড')-এর ধারণা ব্যবহার করেন। তিনি মনে করেন, প্রায়োগিক যুক্তির (practical reasoning) মাধ্যমে এই পুর্নমূল্যায়ণ ঘটে।

টেলর রলসকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন যেখানে রলস্ ব্যক্তি অধিকারকে মঙ্গলের বা কল্যাণের উপরে অগ্রাধিকার দেন। টেলর যুক্তি দেন যে, বিভিন্ন মূল্যবোধের প্রতি রলস্ নিরপেক্ষ নন। রলসের তত্ত্বে মঙ্গল বা কল্যাণের এক সূক্ষ তত্ত্ব (a thin theory of good) দেখা যায়। টেলর মনে করেন যে, রলসীয় উদারনীতিবাদ মূল্যবোধের প্রতি নিরপেক্ষ নয়। রলস ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেন। এটা মনে হয় যে, রলসের বিবেচনায় 'হাইপার গুড' হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য।

মাইকেল ওয়ালৎজার (Michael Walzer) (জন্ম ঃ ১৯৩৫) ওয়ালৎজার একজন মার্কিন রাষ্ট্রনৈতিক তাত্ত্বিক। তিনি কৌমবাদী ও বহুত্ববাদী উদারনৈতিকতাবাদের রূপ বিশ্লেষণ করেন। তিনি ন্যায়নীতির কোনো সর্বজনীন তত্ত্ব করেন না। এর পরিবর্তে তিনি জটিল সাম্যের ('complex equality')-র পক্ষে যুক্তি দেন। তাঁর মনে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক মঙ্গল বন্টনের জন্য বিভিন্ন নিয়ম বা নীতি প্রয়োগ করা উচিত। ওয়ালৎজারের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম ঃ Spheres of Justice, A Defence of Pluralism and Equity (1983) এবং Interpretation and Social Criticism (1987)।

ওয়ালৎজারের রলসীয় উদারনীতিবাদের সমালোচনার স্বর ইতিপূর্বে অন্যান্য কৌমবাদী দার্শনিকদের ভাষা থেকে আলাদা। ওয়ালৎজার প্রাথমিকভাবে রলসের ব্যক্তিসত্তার ধারণাকে সমালোচনা করতে আগ্রহী নন। তিনি পশ্চিমী সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বর্ণনাতে আগ্রহী নন যা থেকে সাধারণভাবে উদারনীতিবাদের এবং নির্দিষ্টভাবে রলসের সমালোচনা করা যেতে পারে। ওয়ালৎজার তাঁর **স্ফীয়ার অব্ জাস্টিস** গ্রন্থে বরং রাজনৈতিক তত্ত্বে কী পদ্ধতি (methodology) উপযুক্ত হবে তার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি রলসের বন্টনমূলক ন্যায়েরনীতির (distributive justice) সমালোচনা করেন।

ওয়ালৎজারের যুক্তি স্পষ্ট হয় তার দাবীতে যা তিনি তাঁর স্ফিয়ারস অব জাস্টিস গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "different social goods ought to be distributed for different reasons, in accordance with different procedures, by different agents and all these differences derive from different understandings of the social goods themselves—the inevitable product of historical and cultural particularism."(p-6) সহজে বলা যায়, ওয়ালৎজার মনে করেন যে, বিভিন্ন প্রাথমিক সামাজিক মঙ্গলের বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়। ওয়ালৎজার রলসের বিরুদ্ধে 'methodological abstraction' বা পদ্ধতিগত বিমূর্ততার অভিযোগ উত্থাপিত করে বলেন সামাজিক মঙ্গলের বন্টন কৌম ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে, এই কারণে তা প্রেক্ষিত অনুসারে এক কৌম থেকে অন্য কৌমে পরিবর্তিত হয়। সকল কৌমের ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য সামাজিক ন্যায়নীতির কোনো সর্বজনীন ধারণা থাকতে পারে না।

৪.০৬ কৌমবাদী বক্তব্যের মূল্যায়ন (Assessment of Communitarianism)

গুরুত্বপূর্ণ কৌমবাদী দার্শনিকদের অবদান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার সময় নিম্নপ্রদত্ত বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য মনে রাখা দরকার ঃ

(১) কৌমবাদী দার্শনিকবৃন্দ নিজেরা উদারনৈতিকতাবাদের কোনো বিকল্প মতাদর্শ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

(২) তাঁরা সঠিকভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশে কৌম জীবনের গুরুত্বকে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁরা কৌম জীবনের দুর্বলতাগুলিকে নিরীক্ষণ করেন নি। কেমন করে গোষ্ঠী জীবন ব্যক্তিকে অবদমিত করে এবং কেমন করে ব্যক্তির অনন্যতাকে অস্বীকার করে কৌম জীবন তা তাঁদের আলোচনায় অনুপস্থিত।

(৩) E. Laclau এবং C. Mouffe তাঁদের Hegemony and Socialist Strategy : Towards a Radical Democratic Politics (1985) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কৌমবাদীদের ব্যাখ্যাতে সমাজ কাঠামোর মধ্যে ক্ষমতা সম্পর্কের (power relations) কোন উল্লেখ নেই। ক্ষমতার সংগ্রাম সর্বজনীন। ক্ষমতাসম্পর্কহীন সামাজিক ব্যবস্থার ধারণা অবাস্তব।

(৪) ব্যক্তির নৈতিক জগৎ কৌম ঐতিহ্যের দ্বারা নির্মিত হয়। এই ঐতিহ্য ক্ষমতা লাভের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়। কৌমবাদীরা এই গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষিতের দিকে দৃষ্টি দেন নি।

(৫) W. Kimlicka তার Contemporary Political Philosophy : An Introduction (1990) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কান্টীয় উদারনীতিবাদীরা কোনও বিচ্ছিন্ন সত্তা সৃষ্টি করেন নি, তাঁরা কৌমের অভ্যন্তরে ঐতিহ্য ও মূল্যবোধকে প্রশ্ন করার ব্যক্তি অধিকারকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। সকল সমাজেই (উন্নত বা উন্নয়নশীল) বিভিন্ন মাত্রায়, বিভিন্ন ভাবে কৌম ঐতিহ্যের দ্বারা ব্যক্তির উপর অত্যাচার বাস্তব ঘটনা। কৌমবাদীরা সমাজ জীবনের এই ঘটনায় নীরব।

(৬) Laclau এবং Mouffe যুক্তি দেন যে, ব্যক্তি দুর্নীতিগ্রস্ত ও নৈতিকভাবে অধঃপতিত কৌম ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে যখন সে অন্য কোনো ঐতিহ্য থেকে প্রতিরোধ করার রসদ জোগাড়ে অনুপ্রাণিত হয়। প্রতিরোধের এই বিকল্পনীতি প্রাধান্য বিস্তারকারী মূল্যবোধের মাধ্যমে তৈরী হয় Laclau এবং Mouffe 'দি কনস্টিটিউটিভ আউটসাইড' বলে বর্ণনা করেছেন।

(৭) পশ্চিমী সমাজদর্শনে কৌমবাদী ব্যাখ্যান আশাব্যঞ্জক নাও হতে পারে, কিন্তু পুঁজি ও কৌমের মধ্যেকার সংগ্রামে কৌমজীবনের প্রতি আকুল আকাঙ্খা অনুভত হয়।

(৮) নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে ম্যাকানটায়ার যে নৈতিক ঐতিহ্যের সমর্থন করেন ইতিহাসগতভাবে তা কেবলমাত্র পুরুষদের জন্য।

৪.০৭ উপসংহার (Conclusion)

উদারনীতিবাদের সমালোচনামূলক আখ্যান হিসাবে কৌমবাদ সম্পর্কে কোন নির্দ্দিষ্ট উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব নয়। এটা একটা সমস্যা যে, বিভিন্ন মানুষের কাছে 'উদারনীতিবাদ' ও 'কৌমবাদ' বিভিন্ন অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয়। 'উদারনৈতিক' শব্দটির অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ব্রিটেনে ভিন্ন। উপরে বর্ণিত চারজন কৌমবাদী তাত্ত্বিকের আলোচনায় 'কৌমবাদ' সম্পর্কিত বক্তব্যেও সর্বাংশে সাদৃশ্য দেখা যায় না। তাঁর আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে কৌমবাদী সমালোচনা ছাড়াও আরও নানাধরণের সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায়। যথা—রক্ষণশীল, মার্কসবাদ, নারীবাদ, এবং এমনকি নোজিকের ব্যক্তিমুক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। প্রকৃতপক্ষে, উদারনীতিবাদের পরিমার্জিত রূপ হিসাবে নোজিকের ব্যক্তিমুক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে সর্বাপেক্ষ ভালোভাবে বোঝা যায়। উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে কৌমবাদের সমালোচনা সাম্যগত দিক বা বন্টনগত দিক অপেক্ষা উদারনীতিবাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত দিকের উপর অধিক দৃষ্টি দেয়।

Mulhall এবং Swift তাঁদের Liberals and Communitarians (1992) শীর্ষক গ্রন্থে যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, "... the communitarian critique of liberatism might be thought of in terms of Sandelian terms : 'it is an attempt to identify the limits of the attractiveness and worth of autonomy, not an attempt to deny that attractiveness and worth altogether."

৪.০৮ গ্রন্থসূচী

১. A. Swift,	Political Philosophy. (2001)
২. A. Heywood,	Political Theory : An Introduction
৩. S, Mulhall and A. Swift,	Liberals and Communitarians (1992)
৪. G. F. Gaws and C. Kukathas (eds),	Handbook of Political Theory
৫. H. Tam,	Communitarianism : A New Agenda for Politics and Citizenship (1998)
৬. S. Avineri and A. de-Shalit (eds),	Communitarianism and Individualism (1992)
৭. E. Kamenka (ed),	Community as a Social Ideal (1982)
৮. D. Bell,	Communitarianism and Its Critics (1993)
৯. M. Daly,	Communitarianism (1990)
১০. W. Kymlicka,	Contemporary Political Philosophy : An Introduction.
১১. M. Walzer,	"The communitarian critique of Liberalism", *Political Theory*, Vol. 18(1), February 1990.
১২. Asok Kumar Mukhopadhyay,	Robert Nozick: the Exponent of Liberal Political Philosophy, (in Bengali), The calcutta journal of Political Studies (New series), Calcutta University, April 2003–March 2005.

৪.০৯ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Suggested Questions)

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্নসমূহ ঃ

১। 'কমিউনিটারিয়ানইজম' (কৌমবাদ) শব্দটির সংজ্ঞা দাও।

২। "Communitarianism was an intellectual response to the growing crisis in the western liberal societies"— উক্তিটি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করো।

৩। ড্যানিয়েল বেল রলসের উদারনীতিবাদের কৌমবাদী সমালোচনা হিসাবে যে তিনটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেছেন সেগুলি কী কী?

৪। 'সোশ্যাল ক্যাপিটাল' সম্পর্কে Robert Putnam-এর ধারণার সঙ্গে কৌমবাদের দার্শনিক সম্পর্ক কি?

৫। কৌমবাদের প্রধান চার প্রবক্তার নাম লেখো। তাঁদের বক্তব্যের মূল বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ কর।

দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক (প্রবন্ধাকার) প্রশ্নসমূহ ঃ

১। উদারনীতিবাদের সমালোচকরূপে কৌমবাদের উত্থানের পটভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

২। উদারনীতিবাদের সমালোচকরূপে কৌমবাদ সম্পর্কে সুচিন্তিত টীকা লেখো।

৩। কৌমবাদী দার্শনিকরূপে ম্যাকানটায়ারের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা কর।

৪। উদারনীতিবাদের সমালোচকরূপে স্যান্ডেলের মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

৫। কৌমবাদী দার্শনিক হিসাবে টেলর-এর দৃষ্টিভঙ্গীর মূল বিষয়াদি চিহ্নিত কর।

৬। ওয়ালৎজার তাঁর 'স্ফিয়ারস অফ জাস্টিস' গ্রন্থে যে সকল যুক্তি দিয়েছেন তা ব্যাখ্যা কর।

৭। দার্শনিক মতবাদ রূপে কৌমবাদের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন কর।

একক—১ ❑ বহুত্ববাদ (Pluralism)

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ বহুত্ববাদ—সংজ্ঞা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

১.২ উদারনীতিবাদ ও বহুত্ববাদ

১.৩ রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতা ও বহুত্ববাদ

১.৩.১ রাষ্ট্র সম্পর্কে বহুত্ববাদী ধারণা

১.৩.২ সাইফার মডেল (Cipher Model)

১.৩.৩. নিরপেক্ষ রাষ্ট্র মডেল (The Nautral State Model)

১.৩.৪ দালাল রাষ্ট্র মডেল (The Broker State Model)

১.৩.৫ সার্বভৌমিকতা ও বহুত্ববাদ

১.৪ গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদ

১.৫ বহুত্ববাদ ঃ রবার্ট ডাল-এর তত্ত্ব

১.৬ বহুত্ববাদের সমালোচনা

১.৭ উপসংহার

১.৮ গ্রন্থসূচী

১.৯ নমুনা প্রশ্নমালা

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে নিচে উল্লেখ করা বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে ঃ

(ক) বহুত্ববাদের সংজ্ঞা, চরিত্র ও প্রকারভেদ

(খ) উদারনীতিবাদ ও বহুত্ববাদের আন্তঃসম্পর্ক

(গ) রাষ্ট্র ও সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদী ধারণা

(ঘ) গণতন্ত্র সম্পর্কে বহুত্ববাদী ধারণা

(ঙ) রবার্ট ডাল-এর 'বহুতন্ত্র'-র ধারণা

(চ) বহুত্ববাদের সীমাবদ্ধতা ও গুরুত্ব

১.১ বহুত্ববাদ—সংজ্ঞা, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

'বহুত্ববাদ' বলতে সাধারণভাবে বোঝায় বিভিন্নতা (Diversity) ও বহুজনীনতা (Multiplicity)-র প্রতি বিশ্বাস (belief) ও অঙ্গীকারবদ্ধতা (Commitment)। অর্থাৎ, 'বহু'-র অস্তিত্ব-কে মেনে নেওয়া। বহুত্ববাদ এই ধারণাটি মূল্যবোধজনিত (normative) ও বর্ণনার্থক (descriptive) এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন—মূল্যবোধ-এর দৃষ্টিকোণ থেকে মনে করা হয় যে সমাজে বিভিন্নতা হল স্বাস্থ্যকর ও আকাঙ্খিত কেননা তা ব্যক্তির স্বাধীনতা সুরক্ষিত করে ; তর্ক-বিতর্ক, যুক্তি-প্রতিযুক্তির মাধ্যমে কোনও একটি বিষয়কে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। একটি বর্ণনার্থক ধারণা হিসাবে বহুত্ববাদ-এর একাধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, নৈতিক বহুত্ববাদ (moral pluralsim) বলতে বোঝায় নানা নৈতিক মূল্যবোধের সহাবস্থান। সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ (Cultural Pluralism) চিহ্নিত করে বিভিন্ন ধরণের জীবন যাপন প্রণালী ও সাংস্কৃতিক রীতি নীতি-কে। তেমনই, রাজনীতির ক্ষেত্রে বহুত্ববাদ-এর ধারণাটি ব্যবহৃত হয় রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রসঙ্গে। ক্ষমতা একটি সম্পর্কগত (relational) ধারণা। কোনও ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। রাজনৈতিক ক্ষমতার মূলে আছে সেই ধরনের সম্পর্ক যার সাহায্যে কেউ অন্যান্যদের আচরণকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। সমকালীন রাজনৈতিক ভাবনায় বহুত্ববাদের উদ্ভব একত্ববাদের (Monism) প্রতিক্রিয়া হিসাবে। একত্ববাদ 'এক'-এ বিশ্বাসী। বহুতে নয়। রাজনৈতিক বহুত্ববাদ সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও মতাদর্শগত চর্চায় ও অনুশীলনে বৈচিত্র্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করে।

রাজনীতির আঙিনায় বহুত্ববাদ মূলত আলোচনা করে রাজনৈতিক ক্ষমতার বণ্টনের চরিত্র নিয়ে। বহুত্ববাদ অনুযায়ী, সমাজে ক্ষমতা কোনও একটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে কেন্দ্রীভূত থাকে না। তা বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে থাকে সমাজের নানা অংশে ও স্তরে বিকেন্দ্রীকৃত ভাবে। তৈরি হয় ক্ষমতার একাধিক কেন্দ্র। বহুত্ববাদ-কে তাই সাধারণত গন্য করা হয় গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি তত্ত্ব (theory of group politics) হিসাবে। যে তত্ত্ব অনুযায়ী সমাজে বিভিন্ন সংগঠিত গোষ্ঠীগুলি তাদের সদস্যদের (ব্যক্তির) প্রতিনিধিত্ব করে, এবং এইসব গোষ্ঠীগুলির কোনও না কোনও ভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বহুত্ববাদের মূল ধারণাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল—

- প্রত্যেক ব্যক্তি/নাগরিক-ই কোনও না কোনও গোষ্ঠী/সংঘ-এর সদস্য; কেউ বা একই সঙ্গে একাধিক গোষ্ঠীর সদস্য।
- সাধারণভাবে গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একধরণের সমতা বিরাজ করে কারণ, প্রত্যেকেরই সরকারের

কাছে পৌঁছানোর সুযোগ (accers to government) রয়েছে এবং কেউই অন্যের তুলনায় প্রাধান্যকারী অবস্থান ভোগ করে না।

- গোষ্ঠীগুলির অভ্যন্তরীণ কর্মপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় সদস্যদের প্রতি নেতৃত্বের দায়বদ্ধতা।
- সমাজস্থ এই বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলির নিরিখে রাষ্ট্র-র অবস্থান নিরপেক্ষ।
- যদিও গোষ্ঠীগুলির নিজ নিজ চাহিদা ও স্বার্থ-এর মধ্যে পার্থক্য থাকে, তবু যে বিষয়ে তাদের মধ্যে সাধারণভাবে ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায় তা হ'ল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুস্থ ও অবাধ প্রতিযোগিতার গুরুত্ব।

এ কথা মনে রাখা দরকার, বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী আরও বেশ কয়েকটি নামে পরিচিত—যেমন, 'গণতান্ত্রিক', 'আচরণবাদী', 'ব্যক্তিত্ববাদী', বা 'ব্যবহারিকতাবাদী' দৃষ্টিভঙ্গী। প্রতিটি নাম-ই নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে কিছু বিষয়কে চিহ্নিত করে ও তাদের উপর জোর দেয়। অবশ্য 'বহুত্ববাদী'-ই হল এগুলির মধ্যে সবথেকে জনপ্রিয় ও ব্যবহৃত শব্দ, যা এই দৃষ্টিভঙ্গীর জরুরি ধারণাগুলির প্রতিনিধিত্ব করে। এই প্রসঙ্গে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে বহুত্ববাদ-এর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে রাজনৈতিক উদারনীতিবাদ-এর। এই এককে পরের অংশে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

১.২ উদারনীতিবাদ ও বহুত্ববাদ

একটি রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে উদারনীতিবাদ-এর মূল আলোচ্য বিষয় হল ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সীমিত রাষ্ট্র-র ধারণা। 'উদারপন্থী' বা Liberal শব্দটির অর্থ হল ব্যক্তির কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ না করা। কে বা কারা কবে এই হস্তক্ষেপ? করে রাষ্ট্র, চার্চ, ধর্ম ও সমাজের কর্তৃত্বময় রীতিনীতি বা সংস্কৃতি। বহুত্ববাদের উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় বিশিষ্ট উদারনৈতিক চিন্তাবিদ জন লক্ (১৬৩২-১৭০৪) ও মন্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৭৫)-র দর্শনে। লক্ বলেছিলেন, রাষ্ট্র গঠিত হওয়া উচিত শাসিতদের সম্মতির উপর ভিত্তি করে এবং রাষ্ট্রের হাতে চরম ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি ছিলেন ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিশেষ করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের ঐকান্তিক সমর্থক। মন্টেস্কুর ক্ষমতা পৃথকীকরণ তত্ত্ব একাধিক ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার উৎকর্ষের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। চরম ক্ষমতা বা একাধিপত্যের মতাদর্শের বিরোধিতা করে মন্টেস্কুর যে বক্তব্য, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই বহুত্ববাদের প্রথম প্রকাশ। এ ছাড়াও ছিল জেম্‌স ম্যাডিসন (১৭৫১-১৮৩৬) ও 'দি ফেডারেলিস্ট পেপারস' (১৮৮৭)-এর প্রভাব। 'দি ফেডারালিস্ট পেপারস'-এর রচয়িতাদের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের স্বৈরাচার বন্ধ করা। অর্থাৎ, জনপ্রতিনিধিদের তৈরি আইনের সমর্থন ছাড়াই ব্যক্তির স্বাভাবিক অধিকারের উপর রাষ্ট্রের যদৃচ্ছ হস্তক্ষেপ রোধ করা। তাঁরা তাই উপস্থাপিত করেন প্রাতিষ্ঠানিক বহুত্ববাদের এক তত্ত্ব। যার মূল বক্তব্য ছিল প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও

ভারসাম্যের সৃষ্টি করা। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য এবং সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার ধারণা পরবর্তীকালে মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আর্থার বেন্টলিকেও প্রভাবিত করে। তাঁর **দি প্রসেস অফ গভর্নমেন্ট** (১৯০৮) গ্রন্থে তিনি একাধিপত্যের মতাদর্শের তীব্র বিরোধিতা করেন ও গোষ্ঠীগুলিকে 'রাজনৈতিক জীবনের নতুন উপাদান' বলে বর্ণনা করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার একাধিক সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদের সমবেত প্রয়াসে ক্রমে বহুত্ববাদী মতাদর্শ গড়ে ওঠে ও বিকাশ লাভ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন অটো ভন্ গিয়ের্ক, এফ. ডব্লু মেইটল্যান্ড, লিও ডুগুইট, আর্নেস্ট বার্কার, আর. এম. ম্যাকাইভার, রবার্ট ডাল, ইসাইয়া বার্লিন। এইসব নানা চিন্তাবিদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবনার সূত্রগুলি কোনও নির্দিষ্ট ধারা গঠন না করলেও রাজনৈতিক ভাবনায় এক প্রবণতার জন্ম দেয়। বিভিন্ন এই সূত্রগুলিকে এক জায়গায় মেলায় এই ভাবনা যে, ব্যক্তির নিজস্ব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ তার মৌলিক অধিকারকে খর্ব করে।

বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশ লাভ করেছে সমাজ ও রাষ্ট্রের উদারপন্থী গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে। 'উদারপন্থা'র অর্থ ব্যক্তির 'নিজস্ব' ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করা, অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের থেকে স্বাধীনতা'। উদারপন্থার লক্ষ্য হল রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে বেঁধে রাখা ও জনগণের হাতে ক্ষমতা প্রদান। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে এক স্বাভাবিক টানাপোড়েন আছে। জনগণ চায় তাদের অধিকারের ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করে তুলতে। অপরদিকে রাষ্ট্র চায় গণতান্ত্রীকরণের চাপকে প্রতিহত করতে। এই বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য। কারণ বহুত্ববাদীরা মনে করেন যে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন ক্ষমতাবানদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তেমনই জনগণের অংশগ্রহণও সুনিশ্চিত করতে পারে। যদিও এলিট-পন্থীরা এই যুক্তি মানতে নারাজ। বহুত্ববাদ চায় রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ছড়িয়ে দিতে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারকে প্রতিরোধ করতে। বহুত্ববাদীদের মতে, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক পাল্টা শক্তির (countervailing force) অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তারা মনে করেন, এই ধরণের ব্যবস্থায় পুঁজি ও শ্রম—এই দুই প্রধান উৎপাদক শক্তির মধ্যে মোটামুটি একটি ভারসাম্য বজায় থাকে। পাল্টা শক্তি বলতে বোঝায় যে, এক ধরণের ক্ষমতার প্রয়োগ কিছু গোষ্ঠীর জন্ম দেয় যারা ওই ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। রাজনীতিকে বহুত্ববাদীরা গণ্য করেন এক প্রক্রিয়া হিসাবে যেটিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করা যায়। সরকার কাজ করে জনগণের সম্মতির উপর ভিত্তি করে এবং তার কাজের জন্য সে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। বিরোধী দলের দায়িত্ব সরকারের কার্যকলাপের উপর নজর রাখা এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সুরক্ষিত ও নিশ্চিত করা। বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণকে সুনিশ্চিত করে। ফলে সরকারের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় ও জনগণ ক্ষমতার অধিকারী হয়। বহুত্ববাদীদের মতে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাবনা, মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈচিত্র্যকে মান্য করে। বহুত্ববাদী ব্যবস্থায় তাই জনমতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১.৩ রাষ্ট্র সার্বভৌমিকতা ও বহুত্ববাদ

১.৩.১ রাষ্ট্র সম্পর্কে বহুত্ববাদী ধারণা

বহুত্ববাদের উদ্ভব ঘটেছিল রাষ্ট্র সম্পর্কে একত্ববাদী তত্ত্ব-র বিপরীত ধারণা হিসাবে। একত্ববাদের বিকল্প হিসাবে বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের এক নতুন ধারণা তৈরি করেছিলেন, যা গোষ্ঠী জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং কিছু কেন্দ্রীয় ক্ষমতারও অধিকারী হবে। বহুত্ববাদীরা সর্বশক্তিমান কোনও রাষ্ট্র-র ধারণা স্বীকার করেন না। প্যাট্রিক ডানলেভি এবং ব্রেন্ডন ও লিয়ারি থিওরিজ অফ দি স্টেট গ্রন্থে বহুত্ববাদী রাষ্ট্রের তিনটি সম্ভাব্য মডেলের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১.৩.২ সাইফার মডেল (Cipher Model)

বিগত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে মার্কিন বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রকে 'সাইফার প্রতিষ্ঠান', 'কোডিং মেশিন' বা 'ক্যাশ রেজিস্টার' আখ্যা দিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি নামেরই অর্থ এই যে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র সমাজের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ভারসাম্যের প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলন। রাষ্ট্রকে শুধুমাত্র এইসব গোষ্ঠীগুলির চাপের মুখোমুখি হতে হয় এবং যাদের চাপ সবথেকে বেশী, সেইসব গোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী রাষ্ট্র তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির হাতের ক্রীড়ানক ছাড়া রাষ্ট্র কিছুই নয়। রাষ্ট্রের কাজ শুধুমাত্র বিবাদমান গোষ্ঠীগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা করা। হাওয়া-মোরগ যেমন হাওয়ার গতির সঙ্গে সঙ্গে দিক বদল করে, বহুত্ববাদীদের মনে রাষ্ট্রও তেমনই 'বিক্ষিপ্ত আসাম্যগুলির' ('dispersed inegualities') ভারসাম্য পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। উদারপন্থী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠী সক্রিয় থাকে এবং নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় সাফল্য অর্জন করে থাকে। ডানেলভি ও ও'লিয়ামের মতে। রাষ্ট্রের সাংগঠনিক কাঠামো এই 'গতিশীল ভারসাম্যহীনতার' ('dynamic disequilibraium') প্রক্রিয়াকে প্রতিফলিত করে। রবার্ট ডহ্‌ল এই পরিস্থিতিকে 'বহুতন্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন। বহুতন্ত্রের অর্থ হল 'বহুর দ্বারা শাসন'। বহুতন্ত্র কিছু প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে, যারা ভোটদাতাদের ইচ্ছা ও স্বার্থের দিকে নজর দিতে শাসকদের বাধ্য করে। বহুত্ববাদীদের ভাষায় সাইফার মডেল যুদ্ধোত্তর উদারপন্থী-গনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বাস্তব পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে। এটা মনে করা হয় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল বহুতান্ত্রিক চাপকে উন্মুক্তভাবে কাজ করার অবকাশ দিয়েছে। বহুত্ববাদীরা মনে করেন যে, সাইফার রাষ্ট্র নাগরিকদের দাবীকে জনগণের কর্মসূচীতে রূপান্তরিত করে।

১.৩.৩ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র মডেল (Neutral State Model)

নাগরিক সমাজের পরিবর্তনশীল ভারসাম্যকে রাষ্ট্র শুধুমাত্র প্রতিফলিত করে—এই মতকে অনেক বহুত্ববাদী স্বীকার করতে চান না। বরং তাঁরা রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ ভূমিকা নেওয়ার দিকেই মত প্রকাশ করেন। ব্যবহারিকভাবে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার পক্ষেই তাঁদের প্রস্তাব পেশ করেন।

রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার তিন ধরণের অর্থ হতে পারে; (১) রাষ্ট্র ঘটনাবলীর নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে থাকতে পারে, (২) রাষ্ট্র আম্পায়ারের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, যার কাজ স্রেফ আইন অনুসরণ করা, অথবা (৩) রাষ্ট্র এক 'সক্রিয়' নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে পারে, যার সাহায্যে যথেষ্ট নিরপেক্ষ আচরণ সুনিশ্চিত করা যেতে পারে।

এ বার্চ ও তাঁর অনুগামীরা বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্র সর্বদাই শক্তিশালী চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্ব করে না। তাঁদের মতে রাষ্ট্র একইভাবে অসংগঠিত মানুষদেরও প্রতিনিধিত্ব করতে এবং জনসাধারণের স্বার্থে কাজ করতে পারে। স্থায়িত্ব ও বৈধতার জন্য সরকারের এই কাজগুলি সম্পন্ন করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। চার থেকে পাঁচ বছর পরে আবার ক্ষমতায় আসার জন্য রাজনীতিবিদেরা জনমতকে মান্য করতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনী জোট সংগঠিত চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি স্বার্থ ছাড়াও জনস্বার্থে কাজ করার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়। তাঁর 'দি প্রশেস অভ গভর্ণমেন্ট' (১৯৫১) গ্রন্থে ডি ট্রুম্যান বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রুজভেল্টের "নিউ ডিল পলিশি' সংখ্যালঘুদের সমর্থন আদায়ের এক প্রচেষ্টা। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর দাবিগুলি পর্যালোচনা করে যুক্তরাজ্যের আমলাতন্ত্র শেষ অবধি অসংগঠিত মানুষদের পক্ষেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এই কারণেই রাষ্ট্রকে বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যস্থতাকারী, ভারসাম্য প্রদানকারী ও ঐক্যসাধনকারী বলা যেতে পারে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র মডেল অবশ্যই প্রথম মডেলটির মতো যান্ত্রিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্বার্থকে প্রতিফলিত করে না। বরং সে এক নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির প্রস্তাবিত বিভিন্ন নীতির গুণাগুণ পরীক্ষা করে এবং শেষে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এটা স্পষ্ট যে এই অবস্থান সেই মার্কসবাদী মতের বিরোধিতা করে, যা বলে থাকে যে রাষ্ট্র পক্ষপাতদুষ্ট অথবা 'বুর্জোয়া শ্রেণীর কার্যনির্বাহী সমিতি' ('executive committee of bourgeoise')।

১.৩.৪ দালাল রাষ্ট্র মডেল (Broker State Model)

যে অন্যের হয়ে ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাকেই আমরা দালাল বলে থাকি। সে কিন্তু কোনও নিঃস্বার্থ মানুষ নয়, তার নিজস্ব স্বার্থ থাকে। দালাল রাষ্ট্র মডেল অনুযায়ী, রাষ্ট্রীয় কর্মচারী, সংস্থা ও নির্বাচিত প্রতিনিধি-সকলেরই নিজের স্বার্থ থাকে। কিছু কিছু বহুত্ববাদী, বিশেষত গোষ্ঠী তত্ত্বের প্রবক্তারা (group theorists) সাইফার ও নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, এই দুটি মডেলই অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে, যে সব নীতি গ্রহণ করা হয় সেগুলি হল রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভিতরে ও বাইরে স্বার্থকেন্দ্রিক সংঘাতের ফলাফল। দালাল তার মক্কেলের নিয়ন্ত্রণে থাকে ঠিকই, কিন্তু সে 'সাইফারের' থেকে বেশী স্বয়ংশাসিত ও কোনও 'সৎ দালালের' থেকে বেশী পক্ষপাতদুষ্ট ও ধান্দাবাজ। সে যান্ত্রিকভাবে নাগরিক সমাজকে প্রতিফলিত করেনা বা জনগণের স্বার্থ সিদ্ধিও করে না। নাগরিক সমাজে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির বিবাদমান স্বার্থকে আমলাতন্ত্র চতুরভাবে ব্যবহার করে। নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করতে সে 'বিভাজন ও শাসনের' (divide and rule) আশ্রয় নেয়। ডানলেভি এবং ও'লিয়ারিরমতে, "দালাল রাষ্ট্র নিষ্ক্রিয় বা নিরপেক্ষ কোনটাই নয়। এতে রয়েছে বহু

আনুষ্ঠানিক ও অনুপচারিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ, রয়েছে সফল, পরিত্যক্ত বা নবগঠিত জোট ও দর কষাকষি করে প্রসারিত হয়ে অ-রাষ্ট্রীয় (non-state) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির আন্ত-ক্রিয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা ঘটে একইরকম বহুমুখী ক্রিয়াকলাপ, জোট ও দর কষাকষির মধ্যে।"

১.৩.৫ সার্বভৌমিকতা ও বহুত্ববাদ

রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাসে পঞ্চদশ শতাব্দির আগে 'সার্বভৌমিকতা' ধারণাটির বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় না। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর চিন্তা ও মননের জগতে ক্রমে খ্রিস্টধর্মের প্রাধান্য বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পোপের প্রাধান্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। বড় হয়ে দেখা দেয় রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রশ্নটি। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গেটেল-এর মতে, সামন্তপ্রভু, রাজা ও পোপের লড়াইয়ের মধ্য দিয়েই সার্বভৌমিকতার আধুনিক তত্ত্বটি জন্ম লাভ করেছে। সার্বভৌমিকতার ধারণাটি প্রথম তাত্ত্বিক আকারে উপস্থাপিত করেন ষোড়শ শতাব্দির বিশিষ্ট ফরাসি রাষ্ট্র চিন্তাবিদ বোঁদা। তৎকালীন যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি চূড়ান্ত সার্বভৌম কর্তৃত্বের। বোঁদা তাই চেয়েছিলেন একটি সুশাসিত কমনওয়েলথ। তিনি তাঁর গ্রন্থ সিক্স বুক্স অন রিপাবলিক এ বলেছেন, সার্বভৌমিকতা হল "নাগরিক ও প্রজাবর্গের ওপর চূড়ান্ত ক্ষমতা যা আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়।" পরবর্তীকালে সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা গড়ে ওঠে হব্‌স, রুশো, বেন্থাম প্রভৃতির রাজনৈতিক দর্শনে। এই ধারা আইনগত দিক থেকে পরিপূর্ণতা লাভ করে জন অস্টিনের "লেকচার্স অন জুরিসপ্রুডেন্স" (১৮৩২) শীর্ষক রচনায়। তিনি পরিচিতি লাভ করেন সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হিসাবে। একত্ববাদ অনুযায়ী একটি স্বাধীন রাজনৈতিক সমাজে সার্বভৌম হল নির্দিষ্ট এবং চরম ক্ষমতা সম্পন্ন। সার্বভৌমের ইচ্ছা সীমাহীন, অবিভাজ্য ও অচ্ছেদ্য। সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সার্বভৌমের নির্দেশ বা আদেশই হল আইন। অস্টিন সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন, "যদি কোনও সমাজে নির্দিষ্ট কোনও উর্দ্ধতন মানবীয় কর্তৃপক্ষ অন্য কোনও উর্দ্ধতনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন না করে অথচ কোনও বিশেষ সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনুগত্য প্রাপ্ত হয়, তাহলে সেই সমাজের উক্ত নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ হল সার্বভৌম এবং উক্ত কর্তৃপক্ষসহ সমাজটি হল একটি রাজনৈতিক এবং স্বাধীন সমাজ।" একত্ববাদ মনে করে সার্বভৌমের ক্ষমতা হল চরম, অবাধ ও অসীম।

একত্ববাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা হিসাবে উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে বহুত্ববাদ একটি বৌদ্ধিক আন্দোলন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। শিল্পায়ন ও গণতন্ত্রের প্রসার ও তার ফলে নানাবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন, যেমন—নানা ধরণের স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন ও গোষ্ঠীর উদ্ভব, জনসাধারণের সামাজিক অস্তিত্ব ও আনুগত্যের ধরণের ক্ষেত্রে বদল, আন্তর্জাতিক আন্তঃনির্ভরশীলতা ও তার ফলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি—নির্মাণ করেছিল বহুত্ববাদের আবির্ভাব ও বিকাশের প্রেক্ষাপট। বিভিন্ন দেশের নানা চিন্তাবিদের অবদানে গড়ে ওঠে বহুত্ববাদী তত্ত্ব। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

অটো গিয়ার্কে, মেইটল্যান্ড, লিও দ্যুগুই, জি. ডি.এইচ. কোল, হ্যারল্ড ল্যাস্কি, ম্যাকাইভার, বার্কার প্রমুখ। বহুত্ববাদীরা নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে। তারা গুরুত্ব দেন রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর। বহুত্ববাদীদের মতে সমাজে অবস্থিত বিভিন্ন ধরণের সংঘ রাষ্ট্রের মতোই গুরুত্বপূর্ণ ও স্বাভাবিক। রাষ্ট্র ছাড়াও সমাজে রয়েছে নানা ধরণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি সংঘ, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান। মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের মতো এগুলিও সমানভাবে আবশ্যক। রাষ্ট্রের মতো এইসব বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাও নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে। হ্যারল্ড ল্যাস্কি-র মতে, মানুষের আনুগত্য যেহেতু বহুমুখী, সেই কারণে রাষ্ট্র এককভাবে চূড়ান্ত সার্বভৌমত্ব দাবি করতে পারে না। ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রের প্রতিই আনুগত্যশীল নয়। সে তার জীবনের বহুমুখী প্রয়োজনে সৃষ্ট বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিও আনুগত্য প্রদান করে থাকে। তাই বহুত্ববাদীদের মতে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কখনই চরম, সীমাহীন ও অবিভাজ্য হতে পারে না।

বহুত্ববাদীরা মূলত তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদী তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন—(ক) সামাজিক কাঠামো, (খ) আইন, এবং (গ) আন্তর্জাতিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক আইন। বহুত্ববাদীরা মনে করেন রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। সমাজের চরিত্র হল সংঘমূলক। বিভিন্ন সংঘ ও গোষ্ঠী স্বাধীন সত্ত্বাবিশিষ্ট ও যৌথ চেতনাসম্পন্ন। রাষ্ট্র মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু তার অন্তর্জীবনের বিকাশ ঘটাতে পারে না। বহুত্ববাদের মতে, আইন-কে কেবলমাত্র সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ বলে মেনে নিলে সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, ধর্মীয় অনুশাসন প্রভৃতির গুরুত্বকে উপেক্ষা করা হয়। সার্বভৌমের আদেশ ছাড়াও প্রতিটি সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি বা প্রথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকে। স্বয়ং সার্বভৌমও সেগুলিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব ও চরম বা অসীম নয়। বর্তমান বিশ্বে কোনও রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আইন, বিধিনিষেধ, চুক্তি ও বিশ্বজনমত উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করতে পারে না। আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য হিসাবেও একটি রাষ্ট্রের বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার সূত্রে আমরা সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদী ধারণার মূল বক্তব্যগুলি এইভাবে ক্রমানুসারে রাখতে পারি—(ক) সমাজ প্রকৃতিগতভাবে বহুত্ববাদী ও যুক্তরাষ্ট্রীয়, (খ) রাষ্ট্রর মতো অন্যান্য সামাজিক সংঘ ও গোষ্ঠীগুলিও ব্যক্তির জীবনে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ, (গ) ব্যক্তি শুধুমাত্র রাষ্ট্রের প্রতিই আনুগত্যশীল নয়; সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতা বিভাজ্য, এবং (ঘ) আইন সার্বভৌমের আদেশ নয়; আইন সামাজিক প্রয়োজন অথবা ব্যক্তির ন্যায়বোধের অভিব্যক্তি মাত্র।

এই আলোচনার গোড়ার দিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে বহুত্ববাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে রাজনৈতিক উদারনীতিবাদের। বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী বিকাশ লাভ করেছিল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রসারের অন্যতম ফল হল গণতন্ত্র সম্পর্কে বহুত্ববাদী তত্ত্বের উদ্ভব। এই এককের পরবর্তী অংশে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব গণতন্ত্র সম্পর্কে বহুত্ববাদী তত্ত্ব।

১.৪ গণতন্ত্র ও বহুত্ববাদ

গণতন্ত্র সম্পর্কে বহুত্ববাদী তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে। এই তত্ত্বটি বহুত্ববাদী রাষ্ট্রদর্শনেরই ফসল বলা যেতে পারে।

বহুত্ববাদীরা বহুত্ববাদের তত্ত্ব ও ব্যবহারকেই গণতন্ত্রের সারকথা (essence of democracy) বলে গণ্য করেন। তাদের মতে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীই হল গণতন্ত্রের সামাজিক ভিত্তি। তারা গণতন্ত্র বলতে বোঝেন এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গণতন্ত্রের অর্থ শুধুমাত্র জনগণের শাসন বা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়। গণতন্ত্র মানে এমনই এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে নানান বেসরকারি গোষ্ঠী, স্বার্থবাহী সংগঠন ও সেইসব সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিভাজিত হয়ে থাকে।

বহুত্ববাদী গণতন্ত্র গুরুত্ব আরোপ করে ব্যক্তিসমূহ ও তাদের অধিকারের উপর। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ, ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্রের বহুত্ববাদী ধারণা ব্যক্তিস্বার্থকে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে। বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের তত্ত্ব মূলত রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত্ত্ব। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ধারণার মতো বহুত্ববাদও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে। বহুত্ববাদ গুরুত্ব আরোপ করে রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উপরেও। তবে ব্যক্তির একক ও বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নয়। বহুত্ববাদ মনে করে, যা প্রয়োজন তা হল সমস্বার্থসম্পন্ন ও সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সংঘবদ্ধভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। কারণ, এই ধরণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা এবং ব্যক্তি স্বার্থকে রক্ষা করা সম্ভব। অর্থাৎ, বহুত্ববাদী তত্ত্ব গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকতার দিকটির পাশাপাশি নাগরিকদের সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

বহুত্ববাদের অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য হল, রাজনৈতিক ক্ষমতা সমাজে কেন্দ্রীভূত অবস্থায় থাকে না। তা ছড়িয়ে যাকে বিভিন্ন মাত্রায় সমাজের নানা স্তরে ও প্রান্তে। অর্থাৎ ক্ষমতা থাকে বিকেন্দ্রীকৃত অবস্থায়। সমাজে তৈরি হয় ক্ষমতার একাধিক কেন্দ্র। রাজনৈতিক ক্ষমতার বন্টনের এই বিশেষ চরিত্রটি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন প্রখ্যাত বহুত্ববাদী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট ডাল। তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোকপাত করব পরবর্তী অংশে।

১.৫ বহুত্ববাদ ঃ রবার্ট ডালের তত্ত্ব

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে দাবী করা হয়েছে যে সমাজে ক্ষমতা অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে কুক্ষিগত থাকে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে এই মতকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। এই চ্যালেঞ্জের শুরু ১৯০৮ সালে। এ বেন্টলের 'দি প্রসেশ অফ গভর্ণমেন্ট' প্রকাশিত হবার ফলে

চাপসৃষ্টিকারী রাজনীতি সম্পর্কে গবেষণা বৃদ্ধি পায়। বহুত্ববাদীরা গোষ্ঠী তত্ত্বে বেশী মাত্রায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং দাবী করেন যে আধুনিক সমাজে ক্ষমতা পরিব্যপ্ত হবার, অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাঁদের মতে, উন্নত বা অগ্রণী সমাজগুলির ইতিহাস হল সরল থেকে এক জটিল, বিভাজিত রূপে পরিবর্তনের ইতিহাস। শ্রম বিভাজনের ফলে সমাজ আরও বেশী করে বিভাজিত হয়ে পড়ে। সমাজে নতুন নতুন শিল্প ও বাণিজ্য নতুন নতুন বৃত্তির জন্ম দেয় ও তাদের নিজের নিজের সংস্থা গড়ে ওঠে। তাদের নিজস্ব স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এই সংগঠনগুলি সেই অনুযায়ী নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বিষয়ক তাত্ত্বিকেরা বলেন যে সমাজে নানা রকমের স্বার্থের অস্তিত্ব আছে, যাদের মধ্যে অনেকগুলিই নিজেদের সংগঠিত করে রাষ্ট্রকে তাদের দাবিগুলি মেনে নেবার জন্য চাপ দিতে থাকে। সুতরাং জনস্বার্থ বিষয়ক কাজকর্মের পরিচালনার কাজটি বিবাদমান স্বার্থবিশিষ্ট কিছু ব্যক্তি ও কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

বহুত্ববাদীরা দাবি করেন যে, সমাজে ক্ষমতা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, যেগুলি রাষ্ট্রের অধীন নয়। বহুত্ববাদ রাষ্ট্রবাদ ও কর্পোরেটবাদ, দুইয়েরই বিরোধিতা করে। রাষ্ট্রবাদী (statist) ব্যবস্থায় গোষ্ঠীগুলি তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের চাপে সমস্ত ধরনের সামাজিক স্বার্থই তাদের স্বশাসিত অবস্থাকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। এটা বহুত্ববাদের ঠিক বিপরীত পরিস্থিতি। এ কথা মনে রাখতে হবে যে একচ্ছত্রবাদ ও রাষ্ট্রবাদ, এই দুইকেই বহুত্ববাদ নাকচ করে। অন্যদিকে কর্পোরেটবাদী ব্যবস্থায় কোনও নির্দিষ্ট স্বার্থ ব্যক্ত করার বা রক্ষা করার দায়িত্ব ব্যাবসায়ী সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নের মতো কোনও সংস্থার। কর্পোরেটদের অবশ্য কিছু মাত্রা আছে। চরম মাত্রায় (দৃষ্টান্ত স্বরূপ ফ্যাসিবাদে) কর্পোরেটবাদ ও রাষ্ট্রবাদ একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়। অবশ্য অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্পোরেটবাদকে বহুত্ববাদের বিপরীতমুখী বলে ভাবা হয় না। বরং তা এমন এক পরিস্থিতিকে সূচিত করে যেখানে কিছু কিছু গোষ্ঠী রাষ্ট্রের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য (interlocking) সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এই কর্পোরেট সম্পর্ক স্থাপনে মধ্যস্থতা করে প্রতিষ্ঠানগুলি, যেখানে প্রশাসনিক কর্মচারীরা ও বিভিন্ন স্বার্থের গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিরা পরস্পরের কাছাকাছি আসে এবং কিছু বোঝাপড়া ও ছাড়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়। রাষ্ট্রকে দেখা হয় এক দায়িত্বশীল অছি (trustee) ও নিরপেক্ষ 'আমপায়ার' হিসাবে, যে বিবাদমান স্বার্থ ও প্রতিযোগী শক্তিগুলির মধ্যে এক দক্ষ মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে। সুতরাং উদারপন্থী রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বহুত্ববাদ এক পাল্টা প্রবণতার ব্যবস্থা হিসাবে দেখে। বহুত্ববাদী রাষ্ট্রকে বলা হয় এমন এক রাষ্ট্র "যেখানে সর্ব বিষয়ে দক্ষ ও সার্বিক কোনও ক্ষমতার উৎস নেই।" বার্কারের মতে, এ হল "ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গোষ্ঠীতে একত্রিত ব্যক্তিদের উচ্চতর কোনও গোষ্ঠীতে আরও বেশী সাধারণ লক্ষ্য নিয়ে এক সংযোগ।"

বহুতন্ত্র (Polyarchy) সম্পর্কে রবার্ট ডালের ধারণা ঃ

ধ্রুপদী এলিটতন্ত্রীরা সামাজিক কাঠামোকে একক কোনও পিরামিড হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। রবার্ট ডালের মতো 'বহুত্ববাদী এলিটতন্ত্রী' অবশ্য একে একাধিক পিরামিডের এক শৃঙ্খল বা সারি বলে অভিহিত

করেছেন। তাঁর 'হু গভর্ণস' (১৯৬২) গ্রন্থে এই মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন যে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে নীতি নির্ধারণের প্রতিটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে থাকা মানুষেরা সাধারণত কোনও একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন। নিউ হাভেন নামে একটি মার্কিন শহর সম্পর্কে গবেষণা চালাতে গিয়ে তিনি নীতি নির্ধারণের তিনটি ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করেন। এই ক্ষেত্রগুলি হল ব্যক্তি উচ্ছেদ করে নগর উন্নয়ন, জনশিক্ষা এবং স্থানীয় স্তরে দলীয় মনোনয়ন। তিনি দেখান যে, কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীরা অন্য ক্ষেত্রগুলিতে প্রভাবশালী ভূমিকা নেয়। অর্থাৎ তিনটি ক্ষেত্রে ক্ষমতা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর হাতে, যাকে স্বার্থের বহুত্ব বলা যেতেই পারে।

এই ভাবে ডাল এ কথা স্পষ্ট করে দিতে চান যে, প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা অসমভাবে বন্টন করা হয়ে থাকে। কোনও একক নেতাই বিভিন্ন বিষয়ে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করতে পারেন না। নিউ হাভেন সম্পর্কে তাঁর গবেষণার পর ডাল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোন যে, যারা দলীয় মনোনয়ন দেবার ক্ষেত্রে প্রভাবশালী, তারা আবার নগর উন্নয়ন বা শিক্ষার মতো ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম।

এখানে ডালকে উদ্ধৃত করা যাক ঃ "সংসক্তিপ্রবণ (cohesive) নেতৃমণ্ডলীর কোনও একক গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থান অধিকার করেছে নতুন এক ব্যবস্থা, যাকে নিয়ন্ত্রণ করছে নেতাদের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী ও যাদের প্রত্যেকেরই আছে শক্তি বা সম্পদের বিভিন্ন সমবায় বা হোল্টের নাগাল পাওয়ার ক্ষমতা।" অবশ্য এ কথা উল্লেখ করা জরুরী যে ডাল এ রকম ইঙ্গিত করেননি যাতে মনে হতে পারে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থগুলি সমান শক্তি নিয়ে লড়াই করছে। বরং এটাই সত্যি যে বিভিন্ন স্বার্থের শক্তির মধ্যে তারতম্য আছে। বিশেষত সম্পদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব খাটানোর ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ডাল মনে করেন যে আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গঠিত হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বী এলিটদের নিয়ে। এই ব্যবস্থাকেই তিনি বহুতন্ত্র (polyarchy) অ্যাখ্যা দিয়েছেন, যার অর্থ হল 'বহুর দ্বারা শাসন'। বহুতন্ত্রের ধারণার মধ্যে এই চিন্তাটি নিহিত রয়েছে যে পদ্ধতি বা পন্থা নিয়ে মতভেদ থাকলেও, সমাজের রূপ ও তার রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে মূল্যবোধ-ভিত্তিক ঐকমত্য আছে। কেউই ওই কাঠামোগুলি মৌলিক পরিবর্তনে আগ্রহী নয়। বহু সংগঠনের উপর জোর দেওয়ার অর্থ এই যে বহুতন্ত্রে কোনও শাসক শ্রেণী নেই, কাজেই ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও নেই।

১.৬ বহুত্ববাদের সমালোচনা

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্বের প্রতিক্রিয়া হিসাবে বহুত্ববাদ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ কথাও ঠিক বহুত্ববাদেরও নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সমালোচকেরা এরকমই কিছু বিষয় চিহ্নিত করেছেন, যা নিম্নে আলোচনা করা হ'ল।

প্রথমত, বহুত্ববাদীরা নৈতিক ও আইনগত ভাবনার মধ্যে এবং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য

করতে ব্যর্থ হয়েছেন। রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন নয়। সরকারের রিরোধিতা করার অর্থ রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা নয়।

দ্বিতীয়ত, বহুত্ববাদ-এ রয়েছে অন্তর্দন্দ্ব ও অস্পষ্টতা। বহুত্ববাদীরা ব্যক্তির জীবনে গোষ্ঠী ও সংঘের উপস্থিতিকে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে গণ্য করেন ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্র ও এইসব সংঘের পারস্পরিক সম্পর্ক তারা সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করতে পারেন নি, একদিকে তারা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে গোষ্ঠী ও সংঘগুলির পর্যায়ে নামিয়ে আনতে চেয়েছেন; অন্যদিকে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন সমাজে রাষ্ট্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে।

তৃতীয়ত, বহুত্ববাদ এক ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংঘ সমান্তরাল রেখায় চলে এবং তাদের সম্পাদিত কার্যকলাপ ও অনুসৃত স্বার্থগুলির মধ্যে কোনও সংঘাত ঘটে না। এই ধারণা সঠিক নয়। এটি সামাজিক বাস্তবতার পরিপন্থী। বরং বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সংঘের মধ্যে সংঘাতকে এড়ানোর জন্যই শক্তিমান রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়।

চতুর্থত, বহুত্ববাদী তত্ত্বে এক ধরণের স্ব-বিরোধিতা রয়েছে। রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমিকতাকে তারা অস্বীকার করেছেন, কিন্তু স্বীকার করে নিয়েছেন আইনের প্রয়োজনীয়তাকে।

পঞ্চমত, বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাসের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেও রাষ্ট্রের কোন্ কোন্ ক্ষমতার তারা বিরোধী, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে কোনও কিছু তাঁরা বলেননি।

ষষ্ঠত, আইন সম্পর্কে বহুত্ববাদীদের ধারণা সঠিক নয়। সামাজিক সংহতি, অধিকার বোধ বা ব্যক্তিগত বিবেক ইত্যাদির দ্বারা রাষ্ট্রীয় আইন প্রভাবিত হতে পারে ঠিকই। কিন্তু এগুলি কোনও সুনির্দিষ্ট ও আদালতে বলবৎযোগ্য আইনের জন্ম দেয় না। আইন মাত্রই বাইরের বা উপরের থেকে আরোপিত ও ব্যবস্থাপিত।

পরিশেষে, বহুত্ববাদের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হ্যারল্ড ল্যাস্কি ও সমালোচনা করেছেন যে এই তত্ত্বটির একটি প্রধান দুর্বলতা হল, তা রাষ্ট্রের শ্রেণিগত চরিত্রকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে নি।

১.৭ উপসংহার

নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বহুত্ববাদের গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না। বহুত্ববাদ এই বিষয়টির উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, আইনগত দিক থেকে অন্যান্য সংঘ অপেক্ষা রাষ্ট্র অধিক আনুগত্য দাবি করলেও নৈতিক অধিকার বা রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দিক থেকে রাষ্ট্র তা করতে পারে না। এমন একটি সময়ে রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে বহুত্ববাদের আবির্ভাব ঘটে, যখন সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে লঙ্ঘিত হচ্ছিল ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা। বিভিন্ন সংঘ, গোষ্ঠী প্রভৃতির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে বহুত্ববাদ গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। একত্ববাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদ ছিল এক সময়োচিত প্রতিবাদ। বহুত্ববাদ একচ্ছত্রবাদের বিরোধী এবং ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাধীনতায় বিশ্বাসী।

১.৮ গ্রন্থসূচী

১। দীপক কুমার দাশ (সম্পাদিত), *রাজনীতির তত্ত্ব কথা*, প্রথম পর্ব, ২০০৫, প্রকাশন একুশে, কলকাতা।

২। প্রলয়দের মুখোপাধ্যায়, *রাষ্ট্র ও রাজনীতি : তত্ত্ব ও মতবাদিক বিতর্ক*, ২০০৭, ডি পি এইচ সাব্‌স্ক্রিপশন সার্ভিসেস (প্রাঃ) লিঃ, কলকাতা।

৩। O. P. Gauba, *An Introduction to Political Theory*, 6th Edition, 2013, Macmillan Publishers India Ltd., Delhi.

৪। P. Dunleavy and B. O'leary, *Theories of the State*, 1987.

৫। A. Vincent, *The History of the State*, 1987, London, Basic Blackwell.

১.৯ নমুনা প্রশ্নমালা

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী ঃ

১। বহুত্ববাদী তত্ত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

২। সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বহুত্ববাদী ধারণা বিশ্লেষণ কর।

৩. একটি রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে বহুত্ববাদের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা নির্ণয় কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১। বহুত্ববাদের উদ্ভবের কারণ নির্দেশ কর।

২। গণতন্ত্র সম্পর্কে বহুত্ববাদী ধারণা আলোচনা কর।

৩। রকট ডাল-এর বহুতন্ত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। বহুত্ববাদের সংজ্ঞা নির্ণয় কর।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

১। Polyarchy ধারণাটি কে ব্যবহার করেছিলেন ? (ক) ল্যাস্কি, (খ) অস্টিন, (গ) রবার্ট ডাল
উত্তর ঃ (গ)

২। আর্নেস্ট বার্কার একজন
(ক) বহুত্ববাদী চিন্তাবিদ, (খ) একত্ববাদী চিন্তাবিদ, (গ) মার্কসীয় চিন্তাবিদ।
উত্তর ঃ (ক)

৩। বহুত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা চরিত্রগতভাবে—(ক). স্বৈরতান্ত্রিক, (খ) বহুতান্ত্রিক, (গ) গণতান্ত্রিক।
উত্তর ঃ (গ)

একক—২ ❑ ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্র (Consociational Democracy)

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের অর্থ ও প্রকৃতি

২.৩ ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

২.৪ ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের অনুকূল পরিস্থিতি

২.৫ পর্যালোচনা

২.৬ গ্রন্থসূচী

২.৭ নমুনা প্রশ্নমালা

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আমরা জানতে পারব "ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্র"-র ধারণাটি সম্পর্কে। ধারণাটি-র উদ্ভব, তার অর্থ ও প্রকৃতি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে। ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী; এই ধরণের গণতন্ত্র বাস্তবায়িত ও সফল হতে গেলে কী ধরণের পরিস্থিতি প্রয়োজন—এই বিষয়গুলি সম্পর্কেও আমরা এই এককটি থেকে ধারণা লাভ করব। পরিশেষে, এই এককটি আমাদের সামনে পেশ করবে ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্র সম্পর্কে এক সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

২.২ ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্র : অর্থ ও প্রকৃতি

সরকার বা শাসন ব্যবস্থার অন্যতম একটি রূপ গণতন্ত্র। জনগণের শাসন ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রের ভিত্তি হল মানব সমাজ, যেখানে মানুষ যৌথ সামাজিক জীবনযাপন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্বে সমাজ ও গণতন্ত্রের সম্পর্ককে গণতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্ব বা অস্থায়িত্বের অন্যতম নির্ণায়ক হিসাবে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, সামাজিক সমরূপতা ও রাজনৈতিক ঐক্যমতের পরিস্থিতিতেই একমাত্র স্থায়ী গণতন্ত্র

গড়ে উঠতে পারে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল, যে সব সমাজে শ্রেণী, জাতি, ধর্ম ইত্যাদির গভীর বিভাজন রয়েছে, সেই ধরণের বহুমাত্রক সমাজের পরিবেশ স্থায়ী গণতন্ত্রের পক্ষে অনুকূল নয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের কোনও কোনও তাত্ত্বিক—যেমন জন স্টুয়ার্ট মিল—বলেন যে, বহুজাতিক সমাজে গণতন্ত্র, 'প্রায় অসম্ভব' এবং বহুভাষী সমাজে তা 'সম্পূর্ণ অসম্ভব।'

গণতন্ত্রের এমত ধারণার এক পাল্টা দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবেই 'ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্র' বা Consociational Democracy-র ধারণার উদ্ভব। একটি বহুত্ববাদী ও বহুমাত্রিক সমাজেও যে স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ও টিকিয়ে রাখা সম্ভব, 'ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্র' তারই একটি সম্ভাব্য মডেলের কথা বলে। ক্ষমতা বন্টন বা Consociationalism-এর ধারণাটি প্রথম জনপ্রিয়তা লাভ করে প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যারেন্ড লিজফার্ট (Arend Lijphart)-এর গবেষণা ও আলোচনার মাধ্যমে। ১৯৬০-এর শেষভাগে স্ক্যানডিনেভিয়ান দেশগুলি (নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক) এবং নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়াম-এর রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে লিজফার্ট প্রথম ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্র-র ধারণাটি প্রয়োগ করেন। ''Typologies of Democratic Systems'' (1968), *The Politics of Accommodation : Pluralism and Democracy in the Netherlands* (1968), *Democracy in Plural Sociaties* (1977) ইত্যাদি বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধে ও গ্রন্থে লিজফার্ট ক্ষমতা বন্টনের ধারণাটি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। অবশ্য তিনি এই ধারণাটির প্রথম প্রবর্তক নন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা ক্ষমতা বন্টনের ধারণাটির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে এটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ১৯১৭ সালে নেদারল্যান্ডস-এর রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। বস্তুতপক্ষে, লিজফার্ট ক্ষমতা বন্টন সম্পর্কে তাঁর ধারণা নির্মাণে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন নেদারল্যান্ডসের রাজনৈতিক বাস্তবতার দ্বারা।

লিজফার্ট মনে করেন, বহুমাত্রিক সমাজে স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা ও টিকিয়ে রাখা কঠিন হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব নয়। ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্র বহুত্ববাদী সমাজের অন্তর্গত কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) প্রবণতার বিরুদ্ধে কাজ করে। এর মূলে থাকে জনগণের বিভিন্ন অংশের নেতাদের সহযোগিতামূলক মনোভাব ও আচরণ। ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের স্বরূপ প্রকৃত অনুধাবন করতে হলে তাকে স্থাপন করা প্রয়োজন সংখ্যাগরিষ্ঠতা নির্ভর গণতন্ত্রের বিপরীতে। এই দ্বিতীয় ধরণের গণতন্ত্রে ক্ষমতা কেন্দ্রভূত থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পন্ন (তা যত স্বল্প ব্যবধানেই হোক না কেন) দলীয় সরকারগুলির হাতে। এই ধরণের শাসনের বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, সামঞ্জস্যহীন নির্বাচনী ব্যবস্থা ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। অপরদিকে, ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের ভিত্তি হল ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়ার ধারণা। ক্ষমতা বন্টনের এই তত্ত্ব দাবি করে যে, গভীরভাবে বিভাজিত সমাজে ক্ষমতার বিভাজন গণতন্ত্রের এক প্রয়োজনীয় শর্ত। ক্ষমতা বন্টনমূলক রাষ্ট্র (consociational state) বলতে বোঝায় এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নানা বিভাজন—জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদিকে ভিত্তি করে। এতদ্‌সত্ত্বেও এই ধরণের রাষ্ট্রে স্থায়ী সরকার গড়ে ওঠে কারণ, তার মূলে থাকে এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময় ও সহযোগিতা।

২.৩ ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

লিজফার্ট ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। এগুলি হল—

(১) মহাজোট সরকার, যাতে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত—A Grand Coalition Government (between parties from different segments of society).

(২) বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বশাসন/খণ্ডিত স্বশাসন—Segmental Autonomy (in the cultural sector).

(৩) সমানুপাতিত্ব (রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও সরকারি চাকুরিতে)—Proportionality (in the Voting system and public sector employment).

(৪) সংখ্যালঘু/পারস্পরিক ভেটো (Minority/Mutual Veto).

তিনি বলেন, একটি বহুমাত্রিক ও বহু বিভাজিত সমাজে বিরাজ করে খণ্ডিত আনুগত্য। এইরকম একটি সমাজে কোনও সাধারণ জাতীয় আনুগত্য চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা সফল নাও হতে পারে। জাতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী না করে এই ধরণের প্রচেষ্টা বরং বিভিন্ন খণ্ডের নিজস্ব সংহতি এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসার ঘটনা বাড়িয়ে তোলে। ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রে এই বিপদের সম্ভাবনা হ্রাস পায় এবং রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়।

মহাজোট/মহাজোট সরকার

লিজফার্টের মতে ক্ষমতা বন্টন তত্ত্বের প্রথম ও সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, বহুমাত্রিক সমাজের প্রতিটি খণ্ডের রাজনৈতিক নেতারা এলিটরা এক মহাজোটের মধ্যে পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করবেন। ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্র জোর দেয় সংযুক্তি বা সম্মিলন (Coalescent)-এর উপর। একটি বহুমাত্রিক বা বহুত্ববাদী সমাজে ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীগুলি প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব সত্তাকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করে। এই ধরণের সমাজে সরকার-বনাম বিরোধীপক্ষ ধরনের রাজনীতি (অর্থাৎ, প্রতিপক্ষমূলক রাজনীতি)-র তুলনায় মহাজোটের রাজনীতি অধিক উপযোগী। লিজফার্ট মনে করেন, বাস্তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন তখনই সফল হতে পারে যখন যথেষ্ট পরিমাণে ঐক্যমত থাকে এবং সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের ব্যবধান খুব বেশি না হয়। বহুত্ববাদী সমাজের সামাজিক বিভাজনের চরিত্রই দীর্ঘ-মেয়াদি মহাজোটকে আবশ্যক করে তোলে। এই ব্যবস্থায় সমাজের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডই সরকারে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে এক পারস্পরিক সংযম ও বোঝাপড়ার পরিবেশ। একসঙ্গে সরকারে থাকার জন্য সুনিশ্চিত হয় দলগুলির রাজনৈতিক নিরাপত্তা। তাই, বলা যেতে পারে, প্রতিপক্ষমূলক রাজনীতি সমরূপ সমাজের জন্য বেশি উপযুক্ত। আর, বহুত্ববাদী সমাজের ক্ষেত্রে সহায়ক ও উপযোগী হল মহাজোটের রাজনীতি; যা ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

খণ্ডিত স্বশাসন

মানব সমাজে যেমন থাকে কিছু অভিন্ন স্বার্থের বিষয়, তেমনই থাকে এমন কিছু বিষয় যা কেবলমাত্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির সঙ্গেই সম্পর্কিত। একটি বহুত্ববাদ সমাজে এই বৈশিষ্ট্য অধিক লক্ষণীয়। তাই এই ধরণের সমাজে প্রয়োজন সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও শাসনের অধিকার-কে স্বীকার করে নেওয়া ও বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলিকে বিধি/আইন প্রণয়ন ও রূপায়ণের ক্ষমতা অর্পণ করা। কারণ এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে একধরণের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অনুভব (a sense of individuality)। খণ্ডিত স্বশাসন বহু-সাংস্কৃতিক সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্রকে তুলে ধরতে ও তাকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। লিজফার্ট মনে করেন, ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যর মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই বহুত্ববাদী প্রবণতা। যা, সমাজের গোষ্ঠীগত বিভাজনকে দুর্বল বা বিনষ্ট করার পরিবর্তে তাকে স্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম উপাদান হিসাবে গড়ে তোলে।

সমানুপাতিত্ব

ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি মহাজোটের ধারণাটিকেই আরও পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে তোলে। সমানুপতিত্বের ধারণা অনুযায়ী, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সমাজের সব গুরুত্বপূর্ণ খণ্ড বা গোষ্ঠীর শুধু প্রতিনিধি থাকলেই হবে না, তাদের প্রতিনিধিত্ব হতে হবে সমানুপাতিক। লিজফার্টের মতে, এই সমানুপাতের ভিত্তি হবে জনসংখ্যা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, কোনও একটি গোষ্ঠীর জনসংখ্যা যদি হয় সমাজের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ, তাহলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ও সরকারি চাকরিতে তাদের ৩০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব থাকবে। সমানুপাতের নীতের উদ্দেশ্য হল সরকারি চাকরি ও অপ্রতুল সামাজিক সম্পদকে সমাজের বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে বরাদ্দ করা। তাঁর মতের সমর্থনে লিজফার্ট পশ্চিম ইউরোপের একাধিক দেশের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন—যেমন, সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল কাউন্সিলের গঠন এবং অস্ট্রিয়াতে মহাজোটের মন্ত্রিসভা।

সংখ্যালঘু/পারস্পরিক ভেটো

এই মহাজোট সরকারের উদ্দেশ্য হল সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির স্বার্থ রক্ষা করা। একটি মহাজোটে যখন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন সব গুরুত্বপূর্ণ খণ্ডের নেতারাই উপস্থিত থাকেন। সংখ্যালঘুদের সেখানে নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে ঠিকই, কিন্তু এমনটা ঘটতেই পারে যে, সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সংখ্যা গুরুরাই এবং সংখ্যালঘুরা পরাজিত হচ্ছে ভোটে। অর্থাৎ, সংখ্যালঘুদের স্বার্থের সুরক্ষা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। সংখ্যা গুরুদের নেওয়া সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘুদের জরুরি স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে এবং ফলে, তা সংখ্যালঘুদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এই ধরণের উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যই সংখ্যালঘু বা পারস্পরিক ভেটোর ব্যবস্থা। এই ভেটোর সাহায্যে মহাজোটের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সম্ভাব্য আধিপত্য রোধ করা সম্ভব।

কেউ কেউ মনে করেন, সংখ্যালঘু ভেটোর একটি বিপজ্জনক দিক হল, এই ব্যবস্থা সংখ্যালঘুদের স্বৈরাচারের জন্ম দিতে পারে। এই ধরণের স্বৈরাচারের ফলে বিঘ্নিত হয় মহাজোটের অভ্যন্তরীণ 'এলিট সহযোগিতা'। লিজফার্ট অবশ্য এই ধারণার সঙ্গে একমত নন। তাঁর মতে, একাধিক কারণে স্বৈরাচারের বিপদ ঘটার সম্ভাবনা কম। প্রথমত, পারস্পরিক ভেটো সব সংখ্যালঘু গোষ্ঠীই প্রয়োগ করতে পারে; সুতরাং কোনও গোষ্ঠীই বারবার ভেটো প্রয়োগ করে নিজের স্বার্থহানি করতে চাইবে না। দ্বিতীয়ত, 'ভেটো' সম্ভাব্য একটি অস্ত্র—এই ধারণা এবং অনুভবই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির পক্ষে এক নিশ্চিন্ততা ও স্বস্তির কারণ। আর সবশেষে, প্রত্যেক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা খণ্ডই রাজনৈতিক অচলাবস্থা যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। সুতরাং, লিজফার্ট মনে করেন, সংখ্যালঘুর স্বৈরাচারের আশঙ্কা অমূলক।

লিজফার্ট বর্ণিত ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা উপরে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এই ধরনের একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন বাস্তবে ক্রিয়াশীল (operational) থাকে তখন সেখানে সাধারণভাবে নিম্নে উল্লিখিত রাজনৈতিক/প্রশাসনিক প্রক্রিয়া/কাঠামো-র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—জোট মন্ত্রিসভা, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, নিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদি।

ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদাহরণ হিসাবে লিজফার্ট বিশেষভাবে উল্লেখ করেন লেবানন, সাইপ্রাস, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, ফিজি ও মালয়েশিয়া-র রাজনৈতিক ব্যবস্থার। এর সবগুলিতেই যে ব্যবস্থাটি একই রকম সফল হয়েছে তা নয়। কোথাও কোথাও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাই লিজফার্ট অনুসন্ধান করেছেন ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যের পূর্বশর্ত বা তার অনুকূল পরিস্থিতি। এই এককের পরের অংশ আমরা তা আলোচনা করব।

২.৪ ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের অনুকূল পরিস্থিতি

বিভিন্ন দেশের ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার এক তুলনামূলক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে লিজফার্ট এই ধরণের গণতন্ত্রের অনুকূল পরিস্থিতিগুলি চিহ্নিত করেছেন। সেগুলি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(ক) রাষ্ট্রের প্রতি সার্বিক ভূখণ্ডব্যাপী আনুগত্য (Overarching territorial loyalty to the state) —এই ধরণের বড়ো মাপের আনুগত্যের ছত্রছায়ায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন হ্রাস পায়;

(খ) বহুত্ববাদী সমাজের খণ্ডগুলির মধ্যে ক্ষমতার একাধিক ভারসাম্য (a multiple balance of power);

(গ) এলিট সহযোগিতার ঐতিহ্য (tradition of elite accommodation)—সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভাজন থাকলেও সংযম ও বোঝাপড়ার মনোভাব নিয়ে গোষ্ঠী নেতারা/এলিট-রা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রকে কার্যকরী করে তুলতে পারেন;

(ঘ) প্রত্যেক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই অপর গোষ্ঠীর থেকে বিচ্ছিন্নতা (segmental isolation of ethnic communities)—এই বিচ্ছিন্নতার ফলে পারস্পরিক যোগাযোগ সীমিত থাকে এবং গোষ্ঠী বিবাদের সম্ভাবনা হ্রাস পায়;

(ঙ) সমাজের প্রত্যেক অংশে অল্প সংখ্যক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব (a small number of political parties in each segment)।

(চ) রাষ্ট্রের ভৌগোলিক আয়তন ও জনসংখ্যা সীমিত, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর চাপ কমাতে সহায়ক (small size of the territory and small population size, reducing the policy load); এবং

(ছ) একটি বহুদলীয় ব্যবস্থা (a moderate multi party system)।

লিজফার্ট মনে করেন, ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যর জন্য উপরি উক্ত বিষয়গুলি উপযোগী হলেও "অপরিহার্য বা যথেষ্ট নয়" (these conditions are neither indispensable nor sufficient to account for the success of consociationalism)। মূল কথা হল, এই বিষয়গুলি বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ও তাদের নেতা/এলিটদের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই এলিট সহযোগিতা একটি বহুত্ববাদী সমাজে ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ও তাকে শক্তিশালী করে তুলতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়।

২.৫ পর্যালোচনা

একটি ক্ষমতা বন্টনমূলক শাসন ব্যবস্থায় সমাজের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীসহ সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। এই ব্যবস্থার সমর্থকরা মনে করেন, একটি গভীরভাবে বিভাজিত (deeply divided) সমাজে সংঘাত নিরসনের (conflict management) সংহতি কারক (integrationist) পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনায় ক্ষমতা বন্টনমূলকর শাসন অনেক বেশি বাস্তবসম্মত।

একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ক্ষমতাবন্টন মূলক শাসন বিশেষ উপযুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যখন গোষ্ঠীগত এবং আঞ্চলিক বিভাজনগুলির সমাপতন (overlap) ঘটে, তখন যুক্তরাষ্ট্রীয়তা খণ্ডিত স্বশাসনের ধারণাকে কাজে পরিণত করার এক উপযোগী সাংবিধানিক উপায়ে পরিণত হয়। খণ্ডিত স্বশাসনকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণার সাধারণীকরণ বলা যেতে পারে। যেখানে আঞ্চলিক স্বশাসনের যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বহুত্বকে উৎসাহ যোগায় ও টিকিয়ে রাখে।

সমাজবন্টনমূলক গণতন্ত্রের কিছু ত্রুটি ও দুর্বলতাও রয়েছে। সেগুলি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। লিজফার্ট এই ব্যবস্থার দুটি প্রধান দুর্বলতাকে চিহ্নিত করেছেন ঃ

(১) ক্ষমতাবন্টনমূলক গণতন্ত্র সবসময় যথেষ্ট মাত্রায় গণতান্ত্রিক হয়ে উঠতে পারে না; এবং

(২) ক্ষমতাবন্টমূলক গণতন্ত্র স্থায়ী ও দক্ষ সরকার গঠনে যথেষ্ট ভাবে সক্ষম নয়।

ক্ষমতা বন্টনমূলক গণতন্ত্রে মহাজোট-এ অনিবার্য ভাবে হয় ক্ষুদ্র বা দুর্বল বিরোধীপক্ষ থাকে, নয়তো আইনসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিরোধীপক্ষই উপস্থিত থাকে না। সেকারণেই ক্ষমতাবন্টনমূলক গণতন্ত্র তুলনামূলকভাবে কম গণতান্ত্রিক।

ক্ষমতাবন্টনমূলক গণতন্ত্রের আরেকটি ত্রুটি হল এই যে, সমাজের বিভিন্ন খণ্ডের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গোষ্ঠী জীবনের জন্ম দেয়, যা ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী। এই ধরনের ব্যবস্থায় "ব্যক্তিদের" সাম্য সুনিশ্চিত হয় না।

এছাড়া ক্ষমতাবন্টনমূলক মডেলে 'এলিট' শ্রেণিকে অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য গোষ্ঠীর 'নিষ্ক্রিয় ও শ্রদ্ধাবনত' ভূমিকার কথা বলা হয়।

লিজফার্ট মনে করেন, প্রাচ্যের উন্নয়নশীল দেশগুলির খণ্ডিত সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতাবন্টনমূলক গণতন্ত্রের অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করে। সামাজিক বিভাজনের গভীরতার কথা মনে রেখে এইসব দেশে "সরকার-বনাম বিরোধীপক্ষ"-র গণতান্ত্রিক মডেল পরিত্যাগ করে ক্ষমতাবন্টমূলক মডেল নিয়ে চিন্তাভাবনা করাই, তাঁর মতে, অধিক যুক্তিযুক্ত। উন্নয়নশীল বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সমাজ সমরূপ নয়। সেখানে রয়েছে ভাষা, ধর্ম, জাতি, ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে নানা স্বতন্ত্র সামাজিক গোষ্ঠী। এই দেশগুলির পক্ষে উপযুক্ত হল ক্ষমতাবন্টনমূলক গণতন্ত্র পাশ্চাত্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার গণতন্ত্রের মডেল নয়। একসময় মনে করা হোত, একমাত্র সমরূপ সমাজেই স্থায়ী গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। বহুত্ববাদী সমাজ গণতান্ত্রিক স্থায়িত্বের উপযুক্ত নয়। ক্ষমতাবন্টনমূলক গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা (পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে উভয় গোলার্ধেই) এই ধারণা ভুল প্রমাণিত করেছে। একাধিক বহুমাত্রিক ও বহুসাংস্কৃতিক দেশে স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২.৬ গ্রন্থসূচী

১। Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies, 1989.

২। Arend Lijphart, "The Puzzle of Indian Democray: A consociational Interpretetion" 1996, American Political Sciene Revew, Vol. 90, No. 2.

৩। A. Lijphart & S. I. Wilkinson, "India, consociational Theory and Ethnic Violence", 200, Asian Survey, Vol. 40. No. 5.

২.৭ নমুনা প্রশ্নমালা

১। ক্ষমতাবন্টনমূলক গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাও ও তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

২। ক্ষমতাবন্টনমূলক গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৩। ক্ষমতাবন্টনমূলক গণতন্ত্রের অনুকূল পরিস্থিতিগুলি চিহ্নিত কর।

একক—৩ ❑ এলিট তত্ত্ব (Elite Theories)

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ 'এলিট'-এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

৩.২ এলিট তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য

৩.৩ এলিট তত্ত্বের বিভিন্ন প্রবক্তা ও তাঁদের বক্তব্য

৩.৩.১ ভিলফ্রেডো প্যারেটো

৩.৩.২ গেইতানো মস্কা

৩.৩.৩. রবার্ট মিশেল্‌স

৩.৩.৪ সি. রাইট মিল্‌স

৩.৪ এলিটবাদ ও গণতন্ত্র

৩.৫ এলিট তত্ত্বের সমালোচনা

৩.৬ উপসংহার

৩.৭ গ্রন্থসূচী

৩.৮ নমুনা প্রশ্নমালা

৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে আলোচিত হয়েছে 'এলিট' বলতে কী বোঝায় ও 'এলিট' কত ধরণের হয়; এলিট তত্ত্বের চারজন প্রধান প্রবক্তার বিশ্লেষণ; এলিটবাদ ও গণতন্ত্র-র আন্তঃসম্পর্ক; এবং পরিশেষে, এলিট তত্ত্বের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাগুলি।

৩.১ 'এলিট'-এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

ইংরেজি 'এলিট' শব্দটির উৎপত্তি ফরাসি ভাষা থেকে যার অর্থ সেরা (excelent), সর্বোৎকৃষ্ট বা সর্বোত্তম। ১৮২৩ সালে শব্দটি প্রথম ইংরাজিতে ব্যবহৃত হয়। এটি প্রয়োগ করা হয় সামাজিক গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে। উনবিংশ শতাব্দিতে এলিট বলতে মূলত বোঝায় স্তর অনুযায়ী সামাজিক মর্যাদা। বর্তমানে এই

শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেইসব সামাজিক গোষ্ঠীকে বোঝাতে যারা সমাজে উচ্চ মর্যাদা পেয়ে থাকেন। হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল বলেন, এলিট হল এক 'প্রভাবশালী' গোষ্ঠী, যাঁরা যা কিছু পাবার আছে তার বেশিরভাগই পেয়ে থাকেন। তাঁর মতে, "যাঁরা সবথেকে, বেশি পান তাঁরা এলিট, বাকিরা সাধারণ জনগণ।" এলিট বা 'প্রবর' সমাজে সর্বদাই সংখ্যালঘু অংশ, আর জনগণ হল সংখ্যাগরিষ্ঠ। রাজনীতির ক্ষেত্রে এলিট ধারণাটির ব্যবহার মূলত সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতার বন্টনের চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এলিট হল সেই সংখ্যালঘু গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতা যাদের হাতে। তাদেরই রয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃত ক্ষমতা। জনগণ এই এলিটদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। 'এলিট'-এর ধারণা আমাদের সাহায্য করে সমাজে রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাসের চরিত্রটি অনুধাবন করতে।

এলিটদের অভ্যন্তরে রয়েছে স্তর বিভাজন। উপরের স্তরটি সমাজের অন্যান্যদের কাছে তার গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি ব্যাখ্যা করে ও সেগুলির নায্যতা প্রতিপাদন করে। নিচের স্তরটিতে থাকে আমলাতন্ত্র—যার দায়িত্ব সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করা। এলিট হতে পারে কৌশলগত (strategic) ও খণ্ডিত (segmental)। যাদের বিচার, কাজ ও সিদ্ধান্ত সমগ্র সমাজের কাছে চরম গুরুত্বপূর্ণ, তাদের বলা হয় কৌশলগত এলিট। আর যারা সমাজের বিভিন্ন খণ্ড বা অংশের সঙ্গে জড়িত, তারা খণ্ডিত এলিট—যেমন, সাংস্কৃতিক এলিট, অর্থনৈতিক এলিট ইত্যাদি। সি. রাইট মিল্‌স মনে করেন, কৌশলগত এলিটের মধ্যেই থাকে আবার একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। তিনি এটিকে আখ্যা দিয়েছেন 'ক্ষমতার এলিট' (power elite)। উদাহরণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, সামরিক কর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা। তারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং তারাই প্রকৃত শাসক। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক টি. বি. বটোমর এলিটদের ভাগ করেছেন পাঁচটি শ্রেণীতে—(ক) বংশানুক্রমিক এলিট, (খ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী, (গ) বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী, (ঘ) উপনিবেশবাদী প্রশাসক, এবং (ঙ) জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব।

৩.২ এলিট তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য

সমাজে ক্ষমতার বন্টনের চরিত্র নিয়ে একাধিক রাজনৈতিক তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়। এলিট তত্ত্ব তার অন্যতম। এলিটবাদীরা মনে করেন যে প্রত্যেক সমজেই (সে সমাজে সরকারের রূপ বা ধরণ সেরকমই হোক না কেন) মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করে ও বাকিদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাঁদের মতে এটি কেবল সামাজিক বাস্তব-ই নয়, সমাজের পক্ষে এটি কাম্য-ও। প্রতিটি সমাজেই রয়েছে এইরকম কিছু গোষ্ঠী। রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রত্যেক সমাজেই অসমভাবে বন্টিত। এলিটতত্ত্ব সমাজের মানুষকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করে—সেরা (excellent) ও সাধারণ (ordinary) সমাজে তাদের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম দল (যারা সংখ্যালঘু) আধিপত্য বজায় রাখে দ্বিতীয়দের (যারা সংখ্যাগুরু) উপরে। এলিটবাদীরা এই সামাজিক বিভাজন-কে গণ্য করেন একটি স্বাভাবিক (natural) এবং কার্যকরী (functional) প্রক্রিয়া হিসাবে। তারা মনে করেন বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সামর্থ্য, সক্ষমতা ও বৌদ্ধিক পার্থক্যই এই বিভাজন সৃষ্টি করে। এলিট, অর্থাৎ সংখ্যালঘু শাসকেরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে। ক্ষমতা, সাংগঠনিক শক্তি, রাজনৈতিক দক্ষতা ও ব্যক্তিগত উৎকর্ষের সাহায্যের

এলিটরা ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। তাদের রয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—গোষ্ঠীচেতনা, সংহতি ও কাজ করার ইচ্ছা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজের অন্যান্যদের তুলনায় এলিটদের সুবিধাজনক অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে তোলে। এলিট তত্ত্বের মতে, "ক্ষমতাই ক্ষমতার জন্ম দেয়।" একবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেই এলিটরা পরিণত হয় এক রুদ্ধদ্বার গোষ্ঠীতে (closed group)।

৩.৩ এলিট তত্ত্বের বিভিন্ন প্রবক্তা ও তাঁদের বক্তব্য

৩.৩.১ ভিলফ্রেডো প্যারেটো (১৮৪৮-১৯২৩)

ইতালিয় সমাজতাত্ত্বিক প্যারেটো তাঁর The Mind and Society গ্রন্থে 'এলিট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন একটি উচ্চতর মানের সামাজিক গোষ্ঠী (a superior social group) কে বোঝাতে। অর্থাৎ, এমন ব্যক্তিরা যারা যে কোনও নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্কোর (score)-এর বা যোগ্যতার অধিকারী। তা হতে পারে ক্ষমতা, ধনসম্পদ বা জ্ঞান। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও এলিট-এর ধারণাটি প্যারেটো ব্যবহার করেছেন ধর্ম (যারা সবচেয়ে বেশি ধার্মিক), শিল্পকলা (শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা), ও নৈতিকতার (যারা সর্বাধিক নৈতিক উৎকর্ষ সম্পন্ন) সম্পর্কেও। সংক্ষেপে, এলিট হল সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে সেই সব মানুষ যারা উচ্চতম স্তরে অবস্থান করে। প্যারেটোর মতে প্রতিটি সমাজ 'সাধারণ জনগণ' ও 'এলিট' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে সব মানুষ সমান না হওয়ার কারণে প্রতিটি সমাজেই কিছু ব্যক্তি থাকেন যাঁরা অন্যান্যদের তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান ও দক্ষ। এই ধরণের ব্যক্তিদের নিয়েই গঠিত হয় 'এলিট শ্রেণী'। এলিট-রা সমাজে সংখ্যালঘু। কিন্তু তারাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের না আছে নেতৃত্বের গুণাবলি (leadership qualities), না তারা সামাজিক দায়িত্ব (responsibility) বহন করতে আগ্রহী। তারা মনে করে, সমাজ জীবনে এলিট-দের অনুসরণ করাই শ্রেয় ও নিরাপদ।

প্যারেটো এলিট-দের দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন —শাসক এলিট (governing elite) এবং অশাসক এলিট (non-governing elite)। শাসক এলিট হলেন তাঁরা যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। আর, 'অশাসক এলিট' হলেন সেইসব ব্যক্তিরা, যাঁরা সমাজে নেতৃস্থানীয় হলেও সাময়িকভাবে ক্ষমতার বাইরে আছেন। এই শ্রেণীটি সর্বদাই চেষ্টা করে যায় নিজেদের দক্ষতা ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে শাসক এলিটদের স্থানচ্যুত করতে এবং সেই স্থান নিজেরা দখল করতে। অর্থাৎ, তারা থাকেন ক্ষমতালাভের সুযোগের অপেক্ষায়। এই দু'ধরণের ব্যক্তিরা ছাড়া বাকিরা এলিট সমাজের বাইরে—অর্থাৎ তারা 'নন এলিট' (non-elite)। বস্তুত, এলিটদের আচরণের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হল শাসক ও অশাসক এলিটদের মধ্যে নিরন্তর প্রতিযোগিতা।

তাঁর প্রণীত **The Rise and Fall of Elites** গ্রন্থে প্যারেটো এলিট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিপাদ্য পেশ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের কাজকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যুক্তিসঙ্গত (logical) এবং আবেগপ্রবণ (sentimental) বা যুক্তিহীন। যুক্তিসঙ্গত কাজগুলি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে

কর্মপন্থা নির্দ্ধারণ করে এবং লক্ষ্যের সঙ্গে পন্থাকে যুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত করে। যুক্তিসঙ্গত কাজের শ্রেণীতে যেগুলি পড়ে না, তা সবই আবেগপ্রবণ কাজ। প্যারেটো মনে করেন, যুক্তিহীন কাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর সাহায্যে যারা এই ধরণের কাজ করেন তাঁদের অন্তঃস্তিত শক্তিকে (যেমন আবেগপ্রবণতা) ব্যাখ্যা করা যায়। যুক্তিহীন কাজের উৎস হল মানুষের অন্তঃকরণ। এইসব মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কে প্যারেটো রাজনৈতিক-সামাজিক বিশ্লেষণের প্রক্রিয়ায় তথ্য হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

প্যারেটো বলেন, ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ দু'ধরণের প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ—অবশিষ্ট (residues) ও 'সিদ্ধান্তমূলক' (derivative)। অবশিষ্ট বলতে বোঝায় ব্যক্তির অন্তর্গত আবেগ বা ভাবপ্রবণতা, যা তাকে যুক্তিহীন কাজগুলি করতে উৎসাহ দেয়। 'সিদ্ধান্তমূলক' হল যুক্তিহীন বা আবেগপ্রবণ কাজগুলির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা। প্যারেটো চিহ্নিত করেছেন ছয় ধরণের অবশিষ্ট—(১) সমন্তম এর প্রবৃত্তি এবং নতুন কিছু আবিষ্কার-এর প্রবণতা ও দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হওয়ার আগ্রহ (combination or a tendancy to invent and embark on adventures), (২) টিকে থাকা ও টিকিয়ে রাখার প্রবৃত্তি (perristence or preservation), (৩) অভিব্যক্তিপূর্ণতা (expressiveness), (৪) সঙ্গপ্রিয়তা (sociability), (৫) সততা (integrity) ও (৬) যৌনতা (sex)। এর মধ্যে প্রথম দুটি—অর্থাৎ সমন্বয়ের প্রবৃত্তি ও গোষ্ঠী বা সমষ্টির টিকে থাকার প্রবৃত্তি—প্যারেটোর মতে, সমাজে এলিটদের ভূমিকা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই দু'ধরণের 'অবশিষ্ট' প্রবৃত্তির মাধ্যমেই এলিটরা তাদের নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখে। এদের মধ্যে প্রথমটি কল্পনাভিত্তিক, আর দ্বিতীয়টি অনুসরণ করে সমষ্টিগত অস্তিত্বের প্রবৃত্তি। প্রথমটিতে আশ্রয় নেওয়া হয়, চাতুর্য ও ধূর্ততা-র। তাই এই ভিত্তিতে যারা কাজ করে প্যারেটো তাদের তুলনা করেছেন 'শৃগাল'-এর সঙ্গে (foxlike quality of cunningness)। আর, যারা দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করে তাদের আখ্যায়িত করেছেন সিংহ হিসাবে (lionlike courage, perristence and power)। প্যারোটে এই দুই শ্রেণির মধ্যে যে তুলনা করেছেন নিম্নের সারণির সাহায্যে তা স্পষ্ট করা যেতে পারে—

শ্রেণি—১	শ্রেণি—২
'সমন্বয়ের প্রবৃত্তি'	'সমষ্টির টিকে থাকার প্রবৃত্তি'
(শৃগাল সদৃশ)	(সিংহ সদৃশ)
বুদ্ধিমান	দৃঢ়মনা
কল্পনাবিলসী, সৃজনশীল	বিশ্বস্ত
কৌশল ব্যবহারে অভ্যস্ত	ন্যায়পরায়ণ
ঐক্যমতকামী	সংঘর্ষকামী
সমঝোতার পক্ষে	অনমনীয়
ধৈর্য্যশীল	অধৈর্য্য

প্যারেটো মনে করেন, সমাজে এলিটদের উদ্ভব হয় ব্যক্তিগত গুণ ও প্রবৃত্তির কারণে। এক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান মার্কসবাদীদের থেকে ভিন্ন—যাঁদের মতে শাসক শ্রেণী অর্থাৎ সমাজে কর্তৃত্বকারী গোষ্ঠী সমাজের

অর্থনৈতিক কাঠামোর সৃষ্টি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্যারেটোর মতে, শাসক ও অশাসক এলিটদের মধ্যে নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলে ক্ষমতা ধরে রাখা ও ক্ষমতার বৃত্তে প্রবেশ করার জন্য। অর্থাৎ এলিটদের অবস্থান পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে প্যারেটো ব্যাখ্যা করেছেন 'এলিটদের সঞ্চলন' (Circulation of Elites)-এর ধারণার মাধ্যমে। এই সঞ্চলন ঘটে এলিটদের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের কারণে। সঞ্চলন বলতে প্রথমত বোঝায় এলিট ও নন-এলিটদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়ত, এক এলিট গোষ্ঠীর স্থানে নতুন একটি এলিট গোষ্ঠীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠান। প্যারেটো বলেন, "The history of man is the history of the continuous replacement of elites : as one ascends, another declines". মানব সমাজের ইতিহাস হল নিরন্তর এক এলিট গোষ্ঠীর জায়গায় অন্য এলিট গোষ্ঠীর প্রতিস্থাপন ; একটি গোষ্ঠীর উত্থানের সাথে সাথে ঘটে অন্য গোষ্ঠীর অবনমন। তাঁর মতে, এলিটদের সঞ্চলনের মাধ্যমেই সমাজে পরিবর্তন সাধিত হয়। যে 'অবশিষ্ট' প্রবৃত্তিগুলি একসময় শাসক এলিটদের ক্ষমতা লাভ করতে সাহায্য করেছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কারণে যখন সেগুলির অনুপাত হ্রাস পেতে থাকে তখন শাসক গোষ্ঠীরও শক্তিক্ষয় হয়। তাদের সরিয়ে ক্ষমতা দখল করে নতুন এলিট গোষ্ঠী যাদের সদস্যরা আরও বেশি উৎকর্ষের অধিকারী। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে প্যারেটোর এই তত্ত্ব প্রকৃতিগতভাবে চক্রাকার বা cyclical। তাঁর মতে, সব সমাজই এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হয় এক চক্রাকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

৩.৩.২ গেইতানো মস্কা (১৮৫৮-১৯৪১)

প্যারেটোর মতে মস্কাও একজন প্রখ্যাত ইতালিয় সমাজতাত্ত্বিক। এলিট তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ **The Ruling Class** (1896)। মস্কা 'এলিট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন একটি রাজনৈতিক শ্রেণী বা শাসক শ্রেণীকে (political or ruling class) কে বোঝাতে। তাঁর মতে, প্রতি সমাজেই মানুষ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—শাসক (the rulers) ও শাসিত (the ruled)। শাসক শ্রেণী সর্বদাই সংখ্যালঘু। তারাই রাজনৈতিক ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারী। সব রাজনৈতিক দায়িত্ব এই শ্রেণীটিই পালন করে, ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখে এবং ক্ষমতায় থাকার সুবিধাগুলিও উপভোগ করে। বস্তুত, এই শাসক শ্রেণী নিয়ন্ত্রণ করে সমাজের বেশিরভাগ সম্পদ (weatlh), ক্ষমতা (power) ও সম্মান। দ্বিতীয় শ্রেণীটি—অর্থাৎ যারা শাসিত-সংখ্যাগুরু, কিন্তু তারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় প্রথম শ্রেণিটির দ্বারা। মস্কার মতে, যারা শাসিত তাদের সেই সামর্থ্য নেই যার সাহায্যে তারা শাসক শ্রেণীকে বদল বা প্রতিস্থাপন (replace) করতে পারে। তিনি বলেন, একটি সমাজে সরকারের রূপ যে রকমই হোক না কেন, একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীই সবসময় সব ধরণের ক্ষমতা ভোগ করে। এটিই শাসক শ্রেণী, এবং এই শাসক শ্রেণী একটি রাজনৈতিক শ্রেণি (political class)। তারা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলির স্বার্থর প্রতিনিধিত্ব করে। এই শাসকেরা শাসিতদের সম্মতি আদায় করার জন্য নিজেদের কার্যকলাপ ও শাসন প্রক্রিয়ার উপর আরোপ করে থাকে নৈতিক (moral) ও আইনি (legal) নীতিসমূহ।

প্যারেটো বুদ্ধিমত্তা (intelligence) ও বিশেষ কর্মদক্ষতা (talent)-কে এলিটদের বিশিষ্ট (outstanding) গুণাবলি হিসাবে গণ্য করেছিলেন। মস্কার মতে, শাসক শ্রেণী বা এলিটদের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা গুণ

হল তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা, যা তাদের অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। এলিটরা সংখ্যালঘু হওয়ার ফলে অন্যদের অপেক্ষা অধিক সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে। এলিটদের সংখ্যালঘুত্ব এবং সাংগঠনিক দক্ষতা তাদের ক্ষমতায় টিঁকে থাকতে সাহায্য করে। এলিটরা সর্বদাই সুসংগঠিত এবং সেই কারণে অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠর (unorganised majority) উপর তাদের আধিপত্য অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য। সংকটের সময় অসংগঠিত সংখ্যাগরিষ্ঠরা এলিট গোষ্ঠীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। মস্কা এলিট গোষ্ঠীকে উঁচু ও নীচু এই দুটি স্তরে (upper and lower strata) ভাগ করেছেন। উঁচু স্তরটিতে থাকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এবং নিচেরটিতে মতামত জ্ঞাপনকারী ও রাজনৈতিক কর্মীরা। এদের মধ্যে চলে নিরন্তর প্রতিযোগিতা। নিচের স্তর থেকেই মূলত সদস্যরা উচ্চ স্তরটিতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এই মতামত ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে মস্কা প্রকৃতপক্ষে এলিটদের সঞ্চলন-এর প্রক্রিয়ার কথাই বলেছেন। তার মতে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেকেলে (outmoded) এলিটরা স্থানচ্যুত হয় তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল (dynamic) এলিটদের দ্বারা। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের কখনোই সুযোগ ঘটে না ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার।

মস্কা কর্তৃত্বের প্রবাহের দুটি নীতি চিহ্নিত করেছেন—'অধোগামী বা স্বৈরাচারী নীতি' এবং 'উর্দ্ধগামী বা উদার নীতি'। একটি স্বৈরাচারী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত কোনও ব্যক্তি কর্মকর্তাদের নিয়োগ করেন ও তাদের কর্তৃত্ব প্রদান করেন। উদারনৈতিক ব্যবস্থায় শাসিতরাই নির্বাচিত করেন শাসকদের এবং তাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করেন। মস্কা অবশ্য বলেন যে, এই ধরণের নির্মাণ বাস্তব নয়। এটি ম্যাক্স ওয়েবার বর্ণিত 'Ideal Type' বা একটি 'আদর্শ বিশ্লেষণী নির্মাণ'-এর মতো। বাস্তবে আমরা যা দেখতে পাই, তা হল এই দুটি নীতির এক, মিশ্রণ। শাসক শ্রেণীর নিয়োগের ক্ষেত্রে 'অভিজাততান্ত্রিক' ও 'গণতান্ত্রিক' এই দুই ধরণের প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায়। যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অভিজাততন্ত্রের প্রাধান্য, সেখানে তৎকালীন শাসক শ্রেণীর সদস্যদেরই শাসক শ্রেণীতে নিয়োগ করা হয়। আর, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শাসিত শ্রেণীর মানুষ শাসক শ্রেণিতে নিযুক্ত হয়। চরম পরিস্থিতিতে এই দুই ধরণের প্রবণতার মধ্যেই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। অভিজাততন্ত্রে শাসক শ্রেণী সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে ; গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে শাসক শ্রেণীকে বিপ্লবের আশঙ্কার সম্মুখীন হতে হয়। মস্কা মনে করেন যে, জনসাধারণ কখনও কখনও তাদের অসন্তোষের কারণে শাসক এলিটকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও নেতৃত্ব দেয় নন-এলিট জনগণের মধ্য থেকেই এক সংগঠিত অল্প সংখ্যক মানুষের গোষ্ঠী, যারা শীঘ্রই এক নতুন শাসক শ্রেণী তৈরি করে। মস্কার এলিট তত্ত্ব সামাজিক বিভাজনকে (এলিট ও নন-এলিট বা জনসাধারণ এই দুই ভাগে) একটি স্বাভাবিক ক্রিয়ামূলক (functional) ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করে। তাঁর মতে, এই বিভাজন সমাজে কোনও ধরণের অন্যায্যতা (injustice) সৃষ্টি করে না। একটি সমাজ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রক্রিয়ায় এলিট ও জনসাধারণ একে অন্যের পরিপূরক।

৩.৩.৩ রবার্ট মিশেল্‌স (১৮৭৬-১৯৩৬)

জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ রবার্ট মিশেল্‌স এলিট তত্ত্বের একটি বিশেষ দিক বা মাত্রা (dimension)-এর উপর আলোকপাত করেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **Political Parties : A Sociological study of**

the oligarchical Tendencies of Modern Democracy (1911) তিনি উপস্থাপিত করেন এলিট সম্পর্কে 'গোষ্ঠী শাসনের লৌহকঠিন আইন' (Iron Law of oligarchy)-এর ধারণাটি। তাঁর মতে, প্রতিটি সামাজিক সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান—তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য (original aims) যাই থেকে থাকুক না কেন—শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয় একটি গোষ্ঠীতন্ত্রে। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তি সেই প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাশীল হয়ে ওঠে এবং তারা নিজেদের স্বার্থে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে। একটি সংগঠিত সমাজের কাঠামোই এলিট-এর জন্ম দেয়। মিশেল্‌স এর ভাষায়, "Who says organization, says oligarchy"। যে কোনও ধরণের সংগঠনেরই টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত নেতৃত্বের। সংগঠনের প্রকৃতি এমনই যে তা নেতাদের এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে ক্ষমতা ও সুবিধা প্রদান করে। অনুগামীরা এই নেতাদের নিয়ন্ত্রণও করতে পারে না বা তাদের কাছে কৈফিয়তও দাবি করতে পারে না। আধুনিক সমাজের বিশাল আয়তন ও জটিল চরিত্রের কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ যোগদান কঠিন হয়ে ওঠে। মিশেল্‌স-এর মতে, জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ রাজনীতির ব্যাপারে উদাসীন, পরিশ্রমবিমুখ ও আজ্ঞাবাহী মনোভাবাপন্ন (apathetic, indolent and slavish)। তারা চিরন্তনভাবে স্ব-শাসনের অনুপযুক্ত। সুতরাং এই জনগণ তাদের নেতাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তাদের সামাজিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন এই ধরণের নেতৃত্বের বাহক হিসাবে কাজ করে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ যোগদান সম্ভব হয় না বলেই প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠে। মিশেল্‌স মনে করেন, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন প্রক্রিয়ায় ক্রমে আমলাতন্ত্রীকরণ (bureaucratisation) ঘটে, যা প্রকৃত অর্থে অগণতান্ত্রিক। নানা কৌশলে, সমাজের স্বার্থকে বর্জন করেও, আমলাতন্ত্র ক্ষমতার উপর তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।

মিশেল্‌স-এর মতে, আমলাতন্ত্রীকরণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় মূলত দুটি কারণে—সাংগঠনিক ও মনস্তাত্ত্বিক। প্রতিটি সংগঠনেই যথাযথভাবে কার্য সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন হয় এক বিশেষ দক্ষতা, যা সাধারণ জনগণের মধ্যে অনুপস্থিত। যে কোনও একটি সংগঠন প্রাথমিকভাবে গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও, যত তা আকারে বড় হয় এবং তার জটিলতা বৃদ্ধি পায়, তত সেটির পরিচালন ভার স্থানান্তরিত হয়ে যায় বিশেষজ্ঞদের হাতে। নেতৃত্বের অপরিহার্যতা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যখন সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় আমলাতন্ত্রের হাতে। ক্রমে ক্রমে এই বিশেষজ্ঞ নেতৃত্ব হয়ে ওঠে সংগঠনের পক্ষে অপরিহার্য। যেমন ঘটে থাকে একটি রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে। নেতারাই দলের তহবিলকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রার্থী নির্বাচন, নির্বাচনী প্রচার, অর্থ সংগ্রহ, আনুকূল্য বিতরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ক্ষমতায় টিকে থাকার উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল তার সনাতনী বিশ্বাস, মতাদর্শের বিশুদ্ধতা পরিত্যাগ করে এক মধ্যপন্থা অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। ফলে শক্তিশালী হয়ে ওঠে আমলাতন্ত্র। ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলির, বিশেষত জার্মান সোশালিস্ট পার্টির কার্যক্রম ও কর্মপ্রণালীর পরিপ্রেক্ষিতে মিশেল্‌স রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কাঠামো সম্পর্কে এই ধরণের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। মনস্তাত্ত্বিক কারণটি হল রাজনীতি সম্পর্কে সাধারণ জনগণের অনাগ্রহ, উদাসীনতা, দক্ষতার অভাব ও নেতাদের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব। এই সবই গোষ্ঠীশাসনের ও আমলাতান্ত্রিকতার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

মিশেল্‌স-এর 'গোষ্ঠী শাসনের লৌহ কঠিন আইন'-এর ধারণা প্যারেটো ও মস্কা বর্ণিত এলিটদের সঞ্চলন-এর ধারণাকে নস্যাৎ করে। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী কোনও সমাজেই বা সমাজের কোনও সংগঠনেই পরিচালনার কাজটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় না। সব ধরণের সরকার বা শাসনব্যবস্থারই অন্তিম পরিণতি হল এক গোষ্ঠীশাসন বা oligarchy। মিশেল্‌স-এর এই তত্ত্বের সমালোচকরা অবশ্য মনে করেন যে 'লৌহ শাসনের আইন' সব ধরনের সংগঠনে একইভাবে প্রযোজ্য নয়। কোনও সংগঠনের সদস্যরা অন্য এক সংগঠনের সদস্যদের তুলনায় অধিক পরিমাণে সতর্ক, নিজের মতামত প্রকাশে দৃঢ় ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। কিছু সংগঠন চরিত্রগতভাবেই হতে পারে অন্য সংগঠনের থেকে বেশি গণতান্ত্রিক। যেমন, রাজনৈতিক দলের সদস্যরা অনেক বেশি সুযোগ ভোগ করে থাকে শ্রমিক সংঘের সদস্যদের তুলনায়। যাই হোক, মিশেল্‌স-এর এলিট তত্ত্ব-কে দেখা যেতে পারে তাদের প্রতি এক সতর্ক বার্তা হিসাবে যারা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিকীকরণের (democratisation of institutions)-এর প্রক্রিয়ায়।

৩.৩.৪ সি. রাইট মিল্‌স (১৯১৬-৬২)

মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক সি. রাইট মিল্‌স তাঁর **The power Elite (1956)** গ্রন্থে এলিট তত্ত্বের এক নতুন প্রতিবেদন পেশ করেন। শাসক শ্রেণী বা ruling class শব্দটির তুলনায় তিনি পছন্দ করেন ক্ষমতাশীল এলিট বা power elite-এর ধারণাটি। মার্কসীয় ধারণায় শাসক শ্রেণী বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাবান একটি শ্রেণীকে যারা সমাজে সবরকম রাজনৈতিক ক্ষমতারও অধিকারী। মিল্‌স-এর ক্ষমতাশীল এলিট-এর অন্তর্নিহিত অর্থ হল, এটি বিভিন্ন গোষ্ঠীর একটি সম্মিলন (combination) যারা সমাজ জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে উচ্চ পদমর্যাদা ভোগ করার সুবাদে সব ক্ষমতার অধিকারী। মিল্‌স তাঁর এলিট তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে। তাঁর মতে, সমাজে ক্ষমতা সংযুক্ত থাকে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এবং 'ক্ষমতাশীল এলিট' হল তারাই যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নির্দেশ জারি করার কেন্দ্রগুলির (command posts) দায়িত্বে থাকে। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন ধরণের ক্ষমতাশীল এলিট-কে চিহ্নিত করেছেন—(১) বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষপদে আসীন ব্যক্তিরা, (২) রাজনৈতিক নেতারা, (৩) সামরিক কর্তারা। এই তিনটি গোষ্ঠী একত্রে গঠন করে ক্ষমতাশীল এলিট। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক এই তিন ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালীরা একত্রে গঠন করে একটি সুসঙ্গতিপূর্ণ (cohesive) গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর অর্ন্তবন্ধন-এর কারণ হল সদস্যদের সামাজিক উৎসের সাদৃশ্য, প্রাতিষ্ঠানিক নৈকট্য ও সদস্যদের মধ্যে মুক্ত আন্তঃপ্রবাহ। আন্তঃপরিবর্তন ও প্রাতিষ্ঠানিক নৈকট্য যত বৃদ্ধি পায়, এলিট তত বেশি ঐক্যবদ্ধ হয়।

মিল্‌স-এর মতে, আধুনিক মার্কিন সমাজে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে। তিনি বলেন যে, বিংশ শতাব্দির প্রথম পঞ্চাশ বছরে মার্কিন সরকারের গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলি লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয় কীভাবে বড় ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সামরিক কর্তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছে। সাধারণভাবে অনেকের যে ধারণা আছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকৃত অবস্থায় নানা স্তরে ছড়ানো আছে মিল্‌স তার বিরোধিতা করেন তাঁর মতে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অবাস্তব। প্রকৃতপক্ষে সেখানে ক্ষমতা মুষ্টিমেয়র হাতে কেন্দ্রীভূত।

মিল্‌স এই ধারণার সঙ্গে একমত নন যে এলিটরা ক্ষমতা ভোগ করে কারণ তারা জনগণের চাহিদা ও স্বার্থ-র প্রতি সংবেদনশীল এবং সেগুলি পূরণ করতে সক্ষম। তাঁর মতে, তাদের ক্ষমতার উৎস সামাজিক কাঠামোর অভ্যন্তরে command post-গুলিতে তাদের অবস্থান। ক্ষমতাশীল এলিট এক আত্মসচেতন গোষ্ঠী যার সদস্যেরা পারস্পরিক সমঝোতা, সহনশীলতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে একে অপরকে সাহায্য করে থাকে তাদের পরস্পরের ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। সমাজের জনগণের কাছ থেকে শ্রদ্ধা আদায়ের জন্য ক্ষমতাশীল এলিটরা নিজেদের জনগণের সমক্ষে তুলে ধরে উচ্চ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হিসাবে। কিন্তু বাস্তবে তারা কদাচিৎ তাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।

এলিট তত্ত্বের যে ক'জন প্রধান প্রবক্তাদের বক্তব্য আমরা আলোচনা করলাম তা থেকে স্পষ্ট যে তাঁদের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নানা পার্থক্য থাকলেও কয়েকটি বিষয়ে তাঁরা একমত। তাঁরা সকলেই মনে করেন যে, সমাজে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র যাই হোক না কেন, প্রতিটি সমাজই শাসন করে এক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী অর্থাৎ এলিট। এলিট একটি আত্মসচেতন ও সুসংহত গোষ্ঠী। ক্ষমতার চরিত্র সঞ্চয়প্রবণ, অর্থাৎ ক্ষমতা আরও ক্ষমতার জন্ম দেয়।

৩.৪ এলিটবাদ ও গণতন্ত্র

গণতন্ত্র সম্পর্কে এলিটবাদী ধারণাকে গণ্য করা হয় প্রচলিত উদারনৈতিক মতবাদের সমালোচনা এবং একটি ভিন্নতর ধারণা গড়ে তোলার প্রয়াস হিসাবে। 'এলিট' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ বা প্রবর। এলিটবাদ অনুসারে আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকারগুলি এলিট গোষ্ঠীরাই পরিচালনা করে। প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী এলিটদের মধ্য থেকে একটিকে বেছে নেয়। গণতন্ত্র হল প্রকৃত অর্থে প্রবরদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা। এলিট তত্ত্বের এই বক্তব্য ধ্রুপদী উদারনৈতিক ধারণার থেকে স্পষ্টতই ভিন্নতর। উদারনীতি অনুসারে গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন। এলিটবাদ মনে করে জনগণের শাসনের ধারণাটি একটি অতিকথা (myth) বা উদ্ভট কল্পনা (merefiction)। প্রতিটি সমাজেই শাসন ক্ষমতা ভোগ করেন নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যালঘু ব্যক্তি—তারাই এলিট বা প্রবর। তারা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত এবং জনগণের স্বার্থেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অর্থাৎ গণতন্ত্র জনগণের জন্য শাসন, কিন্তু জনগণের দ্বারা শাসন নয়। রেমণ্ড এ্যারোন (Raymond Aron) যেমন বলেছেন, "It is quite impossible for the goverment of a society to be is the hands of any but few ..... there is goverment for the people ; there is no government by the people". রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণকেও এলিটবাদ অনুমোদন করে না। এলিট তত্ত্ব অনুযায়ী, জনসাধারণের কাজ হল প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে শাসকদের বা এলিটদের বেছে নেওয়া, এবং তারপর শাসনকার্যের ভার তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। নির্বাচনোত্তর পর্বে জনসাধারণকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে শাসকদের কোনওরকম নির্দেশ দেওয়া থেকে। এলিটবাদীরা গণতন্ত্রকে দেখেন এক সম্পাদিত ও সম্পূর্ণ (accomplished and complete) ব্যবস্থা হিসাবে, সাধারণ মানুষকে ক্ষমতা প্রদানের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসাবে নয়।

৩.৫ এলিট তত্ত্বের সমালোচনা

রাজনৈতিক তত্ত্বের আঙিনায় এলিট তত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও তা একাধিক সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছে। সেগুলি আমরা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরব।

রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে এলিটবাদ আধুনিক গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী। এলিটবাদীরা জোর দেন ব্যক্তিগত যোগ্যতার বৈষম্যের ওপর ; গণতন্ত্রের প্রবক্তারা গুরুত্ব দেন ব্যক্তিদের অন্তর্নিহিত সমতাকে।

এলিট তত্ত্ব যেভাবে এলিটদের একটি ঐক্যবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে প্রতিফলিত করে, সেটিও সর্বদা গ্রহণযোগ্য নয়। এলিটবাদীরা জনসাধারণকে আদৌ যুক্তিবাদী বলে মনে করেন না। তাদের মতে জনসাধারণ তথা নির্বাচকমণ্ডলী অযুক্তিবাদী (irrational) ও শিক্ষণের অতীত। জনগণ বা জনসমাজ সম্পর্কে এই অবজ্ঞা-র ধারণা এলিট তত্ত্বের এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাদের এই মনোভাব আদৌ বাস্তবসম্মত নয়।

এলিট তত্ত্ব কার্যত অসমতা ভিত্তিক সমাজের স্থায়িত্ব ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়। তাদের কাছে গণতন্ত্র হল সমাজের স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পদ্ধতি। এলিট তত্ত্বে অন্তর্নিহিত রয়েছে একধরণের রক্ষণশীল মানসিকতা।

৩.৬ উপসংহার

সমাজে ক্ষমতার বন্টনের (distribution of power) প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে তিনটি বিশ্লেষণী ধারাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রথম, সনাতনী গণতান্ত্রিক ধারণা যার মূল প্রতিপাদ্য হল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। দ্বিতীয় ধারাটি মনে করে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেও নির্ভর করতে হয় নেতৃত্বের উপরে। গণতন্ত্রকে মেনে নিতে হয় সমাজে নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা, সামাজিক সম্পদ ও ক্ষমতার অসম বন্টনের বাস্তবতাকে। তৃতীয় বিশ্লেষণটি হল এলিটবাদীদের যারা মনে করেন যে কোনও ধরণের সমাজ ও শাসনব্যবস্থাতেই সর্বদা একটি আধিপত্যকারী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী শাসন ক্ষমতা ভোগ করে। এটিই সামাজিক বাস্তব এবং সমাজের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। এই এককে এলিট তত্ত্বের আলোচনার মধ্য দিয়ে এই বক্তব্যই বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এলিট তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তারা সকলেই এ ব্যাপারে একমত। এলিটবাদ সমাজ, রাজনীতি ও গণতন্ত্র বিষয়ে বহুত্ববাদ (pluralism)-এর এক বিপরীত মডেল পেশ করে।

৩.৭ গ্রন্থসূচী

(১) O. P. Gauba, *An Introduction To Political Theory*, 6th Edition, 2013, MacMillan Publishers India Ltd. Delhi.

(২) Ali Ashraf and L. N. Sharma, *Political Sociology : A New Grammar of Polities*, 1983, Universities press (India) Ltd. Hyderabad.

(৩) T. B. Boltomore, *Elite and Society*, 1964, pengwin, London.

(৪) G. Parry, *Political Elites*, 1970, George Allen and Unwin, London.

৩.৮ নমুনা প্রশ্নমালা

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) এলিট তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য আলোচনা কর।

(২) 'এলিট'-এর সংজ্ঞা দাও। এলিটবাদ ও গণতন্ত্র-র আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

(৩) একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে এলিটবাদের মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

(১) প্যারেটো/মস্কা/মিশেল্‌স/সি. রাইট মিল্‌স-এর এলিট তত্ত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(২) 'এলিটের সঞ্চলন' বলতে কী বোঝায়?

(৩) 'গোষ্ঠী শাসনের লৌহ কঠিন আইন' কাকে বলে?

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

(১) এলিট তত্ত্ব সমাজে

(ক) সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনকে বোঝায়

(খ) সংখ্যালঘুর শাসনকে বোঝায়

(গ) সমস্ত জনগণের শাসনকে বোঝায়

উত্তর ঃ (খ)

(২) 'রেসিডিউ' ও 'ডেরিভেটিভ' ধারণাটি ব্যবহার করেন ঃ

(ক) প্যারোটো

(খ) মার্কস

(গ) মস্কা

উত্তর ঃ (ক)

(৩) দি পাওয়ার এলিট গ্রন্থটির প্রণেতা

(ক) মস্কা

(খ) মিশেল্‌স

(গ) সি. রাইট মিল্‌স

উত্তর ঃ (গ)

একক—৪ ❑ বহুসংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism)

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ বহুসংস্কৃতিবাদ-এর অর্থ ও ধারণাটির উদ্ভব

৪.২ বহুসংস্কৃতিবাদের গুরুত্ব

৪.৩ বহুসংস্কৃতিবাদের কয়েকজন প্রধান প্রবক্তা ও তাদের বক্তব্য

৪.৩.১চার্লস টেইলর

৪.৩.২ উইল কিম্‌লিকা

৪.৩.৩. আইরিস ইয়ং

৪.৩.৪ভিখু পারেখ

৪.৪ বহুসংস্কৃতিবাদের মূল্যায়ন

৪.৫ গ্রন্থসূচী

৪.৬ নমুনা প্রশ্নমালা

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটির আলোচিত হবে 'বহুসংস্কৃতিবাদ' বলতে কী বোঝায় ; ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছিল কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে ; রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে বহুসংস্কৃতিবাদের গুরুত্ব। সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করা হয়েছে বহুসংস্কৃতিবাদের প্রধান কয়েকজন প্রবক্তার বক্তব্য। সবশেষে এই ধারণাটির একটি মূল্যায়ন উপস্থাপিত করা হয়েছে।

৪.১ বহুসংস্কৃতিবাদ-এর অর্থ ও ধারণাটির উদ্ভব

সাম্প্রতিক কালে সারা পৃথিবী জুড়ে বহুসংস্কৃতিবাদ বা Multiculturalism রাজনীতির আলোচনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হিসাবে বিকাশ লাভ করেছে। পৃথিবীর প্রায় সব জাতিরাষ্ট্রেই আজ সমাজের চরিত্র বহুসাংস্কৃতিক (multicultural)। অর্থাৎ, সমাজবদ্ধ জনগণের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সংস্কৃতির ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। তাদের মধ্যে বিরাজ করে নানা ভিন্নতা। বহুসংস্কৃতিবাদ-এর নীতি এই সকল রকম

ভিন্নতাকে স্বীকার করার ও মান্যতা দেওয়ার কথা বলে। বহুসংস্কৃতিবাদ এ কথাও বলে, যে কোনও একটি বিশেষ সংস্কৃতি অন্যান্য সংস্কৃতির তুলনায় উচ্চতর (superior) বা নিম্নতর (inferior) নয়। একটি সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সহাবস্থান করবে এবং নিজ নিজ গোষ্ঠীর উন্নতি সাধন করবে, বহুসংস্কৃতিবাদের কাছে সেটিই কাম্য। ব্যক্তির স্বাধীনতার এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় শর্ত। জোসেফ্ র‍্যাজ (Joseph Raz) যেমন তাঁর 'Multiculturalsim : A Liberal Perspective' (1994) প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য (autonomy) নিবিড়ভাবে সংযুক্ত তার সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার সঙ্গে। একজন ব্যক্তি যে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অঙ্গ, সেই সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নতি ঘটলে ব্যক্তির জীবনও উৎকর্ষ লাভ করে। সুতরাং ব্যক্তির আত্ম-সংসাধন (sulf-fulfilment)-এর সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক পরিচয়-এর চেতনা (sense of identity) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বহুসংস্কৃতিবাদ হল এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতি যা একটি দেশের জাতীয় মূলস্রোতে বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে স্থান করে দেওয়ার ও তাদের মধ্যে সমন্বয়বিধানের উপর জোর দেয় এবং মনে করে, যে এজন্য দু'ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন—(১) বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর একে অন্যের প্রতি সহনশীলতা, যাতে প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে নিরাপত্তা ও আত্মসম্মান ; এবং (২) রাষ্ট্রের কর্তব্য এটি নিশ্চিত করা যে প্রতিটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যরাই যাতে নাগরিক হিসাবে সমান অধিকার ভোগ করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথাযথ প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়।

বহুসংস্কৃতিবাদ-এর ধারণাটির পূর্বসূরী হিসাবে গণ্য করা হয় বহুত্ববাদ বা pluralism কে। যদিও বহুত্ববাদ-এর সূত্রগুলি বিশেষ সুগ্রথিত ছিল না। উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই ধারণাটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বহুত্ববাদ এই মতামত ব্যক্ত করে যে মার্কিন সমাজে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে—জিউইশ-আমেরিকান, আইরিশ-আমেরিকান প্রভৃতি—বৃহত্তর মার্কিন সমাজের ন্যায্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা উচিৎ ; তাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তাকে যথাযথ স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেওয়া উচিৎ। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে 'melting pot' ও 'salad bowl'-এর বিপরীতধর্মী ধারণা দুটি। প্রথম ধারণাটি অনুযায়ী, মার্কিন সমাজ ও সংস্কৃতি হল নানা ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণের এক আধার (melting pot)। যেখানে বহুধরণের সংস্কৃতি মিলে মিশে গিয়ে একটিই সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়। তা হল মার্কিন সংস্কৃতি। দ্বিতীয় ধারণাটি মনে করে, এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর স্বকীয়তা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ফলে এই ধারণাটি জোর দেয় সার্বিকভাবে মার্কিন সমাজের অন্তর্গত হয়েও যাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলি তাদের অনন্যতা বজায় রাখতে পারে সেই বিষয়টির উপর। 'স্যালাড' নামক খাদ্যবস্তুটি যেমন একাধিক উপাদান দিয়ে তৈরি হয়, অথচ তাতে, প্রত্যেকটি উপাদানকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়। সেই কারণেই 'Salad Bowl'-এর উপমা। এই ধারণাই প্রশস্ত করেছিল 'ব্যক্তিসত্তার পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতি' বা identity politics-এর ধারণার বিকাশ প্রক্রিয়া। ধারণাগতভাবে এটির নৈকট্য রয়েছে বহুসংস্কৃতিবাদ-এর সঙ্গে। যদিও বহুসংস্কৃতিবাদ শব্দটি ব্যবহৃত হয় আরও বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে নানান ধরণের গোষ্ঠীকে বোঝাতে—যেমন, অভিবাসী, বিদেশি, বিবাদী চরিত্রের মানুষ (deviant) ইত্যাদি।

বহুত্ববাদ সমাজের, বিশেষ করে একটি গণতান্ত্রিক সমাজের, বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় চরিত্রের প্রতি দিক্‌নির্দেশ করে। এই ধরণের সমাজে বিভিন্ন ধরণের সংঘ বা গোষ্ঠী (পাড়া-ভিত্তিক গোষ্ঠী, শ্রমিক সংঘ, জীবিকা-ভিত্তিক গোষ্ঠী, ধর্মীয় সংস্থা ইত্যাদি) ব্যক্তি মানুষের বিভিন্ন ধরণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বা সরকারি নীতি (public policy)-কে দেখা হয় বিভিন্ন স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর (autonomous groups) মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা ও মত বিনিময়ের ফসল হিসাবে। প্রখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট ডাল ও নেল্‌সন পল্‌সবি এই মতের সমর্থক। তাঁদের মতে এটি গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য আবশ্যিক। বহুসংস্কৃতিবাদ জোর দেয় এক বিশেষ নৈতিক মূল্যবোধের উপর। যার লক্ষ্য সমাজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু মানুষের পারস্পরিক বর্তমান ও সম্ভাব্য সংঘাতের নিরসন।

৪.২ বহুসংস্কৃতিবাদের গুরুত্ব

বহুসংস্কৃতিবাদ একটি সমাজস্থ বিভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করে। প্রতিটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকেই দেখে থাকে সমান শ্রদ্ধার সাথে। একটি বহুসাংস্কৃতিক সমাজে শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখার জন্য যা প্রয়োজন তা হল, প্রতিটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীই যেন যথাযথ স্বীকৃতি পায়, সমান নাগরিক হিসাবে প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার ভোগ করে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথার্থভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। এইসব চাহিদার প্রতি সাড়া দেওয়াই হল বহুসংস্কৃতিবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সাম্প্রতিক সময়ে গণতন্ত্রের মত বহুসংস্কৃতিবাদ ও বর্তমানের বাস্তব। একটি বৈচিত্র্যময় ও বহুসাংস্কৃতিক দেশ যদি বহুসংস্কৃতিবাদের ধারণা অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় তবে তা চরম পরিণতি হিসাবে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যেতে পারে। বর্তমান বিশ্বে ইউগোস্লাভিয়া বিখণ্ডিত হয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, ম্যাসিডোনিয়া ও বস্‌নিয়া-হার্জেগেভিনা-র সৃষ্টি (১৯৯১-৯২) ও পরবর্তী সময়ে সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো (২০০৬) ও কসোভো (২০০৮)-র আবির্ভাব এই প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য বহন করে। সাম্প্রতিক সময়ে গণতান্ত্রিক সমাজগুলিতে ছোট বড় নানা ধরণের সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই ধরণের বহুসাংস্কৃতিক সমাজে সংখ্যালঘু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একধরনের নিরাপত্তার বোধ সিঞ্চন (infuse) করা বিশেষ প্রয়োজন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যরা যদি সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়, তাহলেই একমাত্র সামাজিক ন্যায় (social justice) প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠরা ক্ষমতায় আসীন হয়। এই ক্ষমতা ও প্রাধান্য লাভের দরুণ তারা সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করতে পারে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে। অর্থাৎ, সংখ্যার নিরিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর অসম প্রতিনিধিত্বের কারণে কিছু গোষ্ঠীর উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। তাদের পরিচিতি বা identity-র বিষয়টি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। বহুসংস্কৃতিবাদের বিভিন্ন প্রবক্তা উপর্যুক্ত বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেছেন। এই এককের পরবর্তী অংশে আমরা এমনই চারজনের বিশ্লেষণ সংক্ষেপে আলোচনা করব।

৪.৩ বহুসংস্কৃতিবাদের কয়েকজন প্রধান প্রবক্তা ও তাদের বক্তব্য

৪.৩.১ চার্লস টেইলর

টেইলর একজন কানাডিয় রাজনৈতিক দার্শনিক। ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত তাঁর 'The Dymamics of Democratic Exclusion' প্রবন্ধে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, গণতান্ত্রিক সমাজে 'নতুন আগন্তুকদের আগমন' (new arrivals) কী ধরণের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে সেই বিষয়টির উপর। তিনি উল্লেখ করেন, গণতান্ত্রিক সমাজগুলি আজ চরিত্রগতভাবে বহুসাংস্কৃতিক। এই ধরণের সমাজে নতুন আগত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির উপর যদি সদৃশীকরণ বা অঙ্গীভূতকরণ (assimilation)-এর নীতি বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে ঐ সংস্কৃতিগুলির নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ, একটি বিশেষ সংস্কৃতি জোর করে অন্য সংস্কৃতিগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং অন্য সংস্কৃতিগুলিকে বাধ্য করা নির্দিষ্ট একটি সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হতে বা সদৃশ হয়ে উঠতে-এটি কখনওই কাম্য নয়। এই প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। একটি বহুমাত্রিক সমাজ যদি তার গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখতে চায়, তবে তাকে স্বীকার করে নিতে হবে সমাজস্থ সাংস্কৃতিক ও জাতিগত বৈচিত্র্য। এই শর্তপূরণ করতে গেলে, টেইলর-এর মতে, একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটানো দরকার।

কানাডা-র উপর গবেষণার সূত্রে টেইলর দেখিয়েছেন সাম্প্রতিক সময়ে ইংরাজি-ভাষী কানাডিয় নাগরিক ও কিউবেক্ প্রদেশের ফরাসি-ভাষী কানাডিয় জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ও সম্পর্কের বিষয়টি। দুই পক্ষই সামাজিক সাংস্কৃতিক নানা ক্ষেত্রে পারস্পরিক পার্থক্য-র বিষয়গুলি বিশেষভাবে তুলে ধরতে আগ্রহী। টেইলর এই প্রক্রিয়াকেই বলেছেন গণতান্ত্রিক সমাজে 'new arrivals' দের চ্যালেঞ্জ; যা ক্রমবর্ধমান বিশ্বের সব গণতন্ত্রেই। বস্তুত, বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক পরিযান (migration) প্রতিটি সমাজকেই ক্রমশ করে তুলছে 'বহুসাংস্কৃতিক' এই পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক সদৃশীকরণ ক্রমে পরিণত হচ্ছে একটি অস্থায়ী (unsustainable) প্রক্রিয়া হিসাবে। আজ নারীবাদী, সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, সমকামী, বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী প্রত্যেকেই অন্তর্ভুক্ত হতে চায় সমাজের মূলস্রোতে। নিজেদের স্ব স্ব গোষ্ঠীগত পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখে। অর্থাৎ, এই অন্তর্ভুক্তি মানে বাধ্যতামূলক assimilation নয়। যারা 'নতুন আগত' তাদের যুক্তি, এই পৃথিবী সমস্ত মানুষের। ভৌগোলিক সীমারেখায় বেষ্টিত কোনও একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে কেবলমাত্র সেইসব মানুষেরই অধিকার থাকে যারা সেখানে জন্মগ্রহণ করে একথা ঠিক নয়। অভিবাসী (immigrant) জণগণেরও সেই ভূখণ্ডে সমান অধিকার। তাই তারা একটি দেশের আদি অধিবাসীদের (জন্মসূত্রে) সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে অঙ্গীভূতকরণের বিরুদ্ধে।

৪.৩.২ উইল কিম্‌লিকা

টেইলর-এর মতো আর এক কানাডিয় রাজনীতি বিজ্ঞানী কিম্‌লিকা তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ **Multicultural Citizenship : A Liberal Theory of Minority Rights (1995)**-তে আলোচনা করেছেন একটি

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব-র সমস্যাটি নিয়ে। সমাজে মোট জনসংখ্যার মধ্যে কোনও একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জনসংখ্যা কত সেই অনুপাতেই কি বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বর সুযোগ থাকা উচিত? না কি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির অধিকমাত্রায় প্রতিনিধিত্ব প্রয়োজন? এই সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রচেষ্টায় কিম্‌লিকা নির্মাণ করেছেন তাঁর 'mirror representation' বা 'প্রতিবিম্বিত প্রতিনিধিত্ব'-র তত্ত্বটি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, আইনসভায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করবে সেইসব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যরাই। তাছাড়া, আইনসভার অন্যান্য সদস্যরা, যারা এইসব গোষ্ঠীভুক্ত নয়, তাদেরও দায়িত্ব হল এই গোষ্ঠীগুলির স্বার্থর প্রতিনিধিত্ব করা। অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে, কিম্‌লিকা চান প্রতিনিধিত্ব-র ব্যক্তিতান্ত্রিক মডেল (indivdualist model of representation)-এর পরিবর্তে গোষ্ঠীগত প্রতিনিধিত্বর এক নতুন ব্যবস্থা। তিনি মনে করেন, mirror respresentation-এর তত্ত্বটি প্রয়োগ করার আগে তিনটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা খুব জরুরি—(১) কোন্ গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্ব ঘটা উচিত? (২) আইনসভায় কোনও একটি গোষ্ঠীর কতগুলি আসন থাকা প্রয়োজন? এবং (৩) গোষ্ঠীগুলির যারা প্রতিনিধিত্ব করবেন তাঁরা কাদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে যে সব সমস্যা উদ্ভূত হয়, কিম্‌লিকা সেগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেগুলি বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন।

কিম্‌লিকা বলেন, যদি সমাজস্থ সমস্ত ধরণের গোষ্ঠীকেই অনুমতি দেওয়া হয় তাদের নিজ নিজ স্বার্থ ও চাহিদাকে তুলে ধরার, তাহলে উদ্ভুত হবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি ও সমর্থনের জন্য অন্তহীন দাবি দাওয়া। আর যাদের স্বার্থ যথাযথভাবে প্রতিফলিত বা পূর্ণ হবে না তাদের মধ্যে দেখা দেবে তিক্ত অসন্তুষ্টি। তাঁর মতে, কোনও একটি গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব-র সুযোগ দেওয়ার আগে দেখে নেওয়া দরকার তাদের ক্ষেত্রে নিম্নোল্লিখিত দুটি শর্ত বা মানদণ্ড পূরণ হচ্ছে কি না—(১) সেই গোষ্ঠীর সদস্যরা কি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নিয়মিতভাবে নানাবিধ অসুবিধা ও লোকসানের শিকার? এবং (২) সেই গোষ্ঠীটি কি স্ব-শাসন দাবি করে? স্ব-শাসনের দাবি জানিয়ে থাকে মূলত জাতীয় সংখ্যালঘু (national minorities) গোষ্ঠীগুলি। বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই তা লক্ষ্য করা যায়। 'নিয়মিতভাবে অসুবিধার শিকার' হওয়ার বিষয়টি আরও জটিল। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীকে গণ্য করা যেতে পারে নিপীড়িত (oppresed) হিসাবে। উদাহরণ হিসাবে কিম্‌লিকা মার্কিন সমাজের উল্লেখ করেছেন, যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ, আমেরিকার আদিবাসী, মহিলা, স্প্যানিশ-ভাষী আমেরিকান, এশিয়-আমেরিকান, সমকামী, শ্রমিক শ্রেণী, দরিদ্র মানুষ, বৃদ্ধ নাগরিক, প্রতিবন্ধী এই তালিকাভুক্ত। সমাজে যে গোষ্ঠীগুলি দীর্ঘদিন ধরে নানা অসুবিধা ভোগ করছে তারা সকলেই সবসময় গোষ্ঠীগত প্রতিনিধিত্বর পক্ষে সায় দেয় না। বহু অভিবাসী গোষ্ঠী বিদ্যমান রাজনৈতিক দলগুলির (যারা ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধনকে তাদের উদ্দেশ্য বলে দাবি করে) ছত্রচ্ছায়ায় থেকেই তাদের স্বার্থ পূরণকে প্রাধান্য দেয়। নিজেদের গোষ্ঠীর জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্ব তারা চায় না।

কোনও একটি গোষ্ঠীর আসন সংখ্যার বিষয়ে কিম্‌লিকা দুটি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন—(১)

সমাজের মোট জনসংখ্যার মধ্যে গোষ্ঠীটির জনসংখ্যা কত সেই অনুপাতে আসন থাকা—অর্থাৎ, mirror representation-এর সাধারণ নীতি অনুযায়ী এবং (২) যে গোষ্ঠীগুলি প্রান্তিকতম এবং সবথেকে অসুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার অনুপাতের থেকেও প্রয়োজন হলে বেশি সংখ্যায় আসন সংরক্ষিত রাখা। প্রথম সম্ভাবনা বা নীতিটি, কিম্‌লিকা-র মতে সর্বদা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর অন্তর্নিহিত একটি ধারণা হল, উদাহরণস্বরূপ, মহিলারাই কেবলমাত্র মহিলাদের স্বার্থের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, বা প্রান্তসীমায় থাকা মানুষেরা তাদের নিজেদের। এই ধারণাটি ভ্রান্ত। সুযোগ্য নেতৃত্ব বিভিন্ন গোষ্ঠীর নানাবিধ স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম।

পরিশেষে, জনপ্রতিনিধিরা শুধুমাত্র সেই জনগোষ্ঠীর কাছেই দায়বদ্ধ থাকবেন আইনসভায় যাদের স্বার্থের তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন, এই প্রস্তাবটিও যুক্তিপূর্ণ নয়। এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে নানা ধরণের মানুষ, যারা একত্রে একটি কন্‌স্টিটুয়েন্সি গঠন করে, তাদের প্রতিনিধিত্বর প্রক্রিয়াটি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রতিটি গোষ্ঠী বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক পৃথক কন্‌স্টিটুয়েন্সি গড়ে তোলা বাস্তবসম্মত নয়। কিম্‌লিকার মতে, একটি জাতি রাষ্ট্রে জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধ থাকতে হবে সমস্ত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর প্রতি। কারণ, তার ফলেই সম্ভব জাতীয় স্বার্থ ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

৪.৩.৩ আইরিস ইয়ং

সদৃশীকরণ বা অঙ্গীভূতকরণ (assimilation) মডেল এর একজন সমালোচক হিসাবে আমেরিকান চিন্তাবিদ আইরিস ম্যারিয়ন ইয়ং বহুসংস্কৃতিবাদ-এর বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর অন্যতম প্রখ্যাত গ্রন্থ Justice and the politics of Difference (1990)। ইয়ং মনে করেন, সদৃশীকরণ-এর মডেলটি এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেয় যে, কোনও একটি বিশেষ গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও রীতিনীতি-ই হল আদর্শ ও সর্বজনীন ; এবং সেই কারণে অন্যান্য গোষ্ঠীকে দেখা হয় বিবাদী চরিত্র (deviant) ও 'অপর' বা 'অন্য' (other) হিসাবে। এর ফলে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী নিপীড়নের শিকার হয়। গণতান্ত্রিক রাজনীতির উচিত এই প্রবণতাকে দূর করা। লক্ষ্য হওয়া উচিত নিপীড়িত মানুষদের সাহায্য করা যাতে তারা নিজেদের স্বকীয় পরিচিতি ও অবস্থান বজায় রাখতে পারে।

অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকা সামাজিক গোষ্ঠীগুলির অধিকার সুরক্ষিত ও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইয়ং জোর দেন পার্থক্য-র রাজনীতি বা politics of difference-এর উপর। তাঁর মতে, ব্যক্তিসত্ত্বার পরিচয় ভিত্তিক রাজনীতি' (identity politics) ও পার্থক্যর রাজনীতি একে অন্যের বিরোধী নয়। বস্তুত তারা একই মুদ্রার দুটি পিঠ। সমাজে অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকা একটি গোষ্ঠী অন্যান্য গোষ্ঠীর থেকে নিজেদের 'পার্থক্য' (difference) বজায় রাখার জন্যই তাদের পরিচয় (identity)-এর স্বাতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে চায়। পার্থক্যর রাজনীতির অন্তর্নিহিত অর্থই হল স্বাধীনতা (liberation) বা মুক্তি (emancipation)। এর মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে 'গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ' (democratic cultural pluralism)। ইয়ং

স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, একটি আদর্শ সমাজ কখনও গোষ্ঠীগত পার্থক্যকে অস্বীকার করে না। সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন নানা গোষ্ঠী যখন একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে এবং পার্থক্য-র মধ্যেই তাদের পারস্পরিক অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয়, তখন তাদের মধ্যে বিরাজ করে একধরণের সমতা। পার্থক্যর রাজনীতি এক ধরণের গোষ্ঠী সংহতির চেতনা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ইয়ং মনে করেন, সাম্প্রতিক কালে আধুনিককরণ ও নগরায়ন-এর প্রক্রিয়া সমাজে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে সঙ্গতি বা একরূপত্ব (uniforming) গড়ে তুলতে সাহায্য করে না। ব্যক্তিরা সাধারণত তাদের সামাজিক গোষ্ঠী পরিচয় বিসর্জন দেয় না। প্রাতিষ্ঠানিক কিছু সমতা বিরাজ করলেও সমাজে সুবিধাজনক ও অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকা গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পার্থক্যর অবসান ঘটে না ; তা চলতেই থাকে। কিছু গোষ্ঠী সবসময়ই চিহ্নিত হয়ে থাকে 'বিবাদী' বা 'অপর' হিসাবে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতিগত পার্থক্য—ভাষা, জীবনযাপন প্রণালী, আচার আচরণ, মূল্যবোধ, সমাজবীক্ষা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে—একটি আধুনিক সমাজেও বিদ্যমান। সদৃশীকরণ-এর নীতি সমাজে সকলের জন্য একটিই মাপকাটি নির্মাণ করতে আগ্রহী। বহুসংস্কৃতিবাদ এই প্রবণতার বিরোধিতা করে।

৪.৩.৪ ভিখু পারেখ

ভিখু পারেখ সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার বিষয়টি বহুত্ববাদী পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। বহুসংস্কৃতিবাদ সম্পর্কে তিনি বিশদে আলোচনা করেছেন তাঁর **Rethinking Multiculturalism : Cultural Diversity and Political Theory (2002)** গ্রন্থে। তিনি মনে করেন, রাজনৈতিক দর্শনের সুদীর্ঘ সনাতনী ধারা এবং সাম্প্রতিক উদারনীতিবাদ একধরণের 'নৈতিক একত্ববাদ' ('moral monism') কে সমর্থন করে। এটি এমন একটি ধারণা যার মধ্যে প্রবণতা রয়েছে কেবলমাত্র এক ধরণের জীবনযাত্রা ও এক ধরণের মূল্যবোধকেই শ্রেষ্ঠ ও সঠিক হিসাবে স্বীকার করে নেওয়ার, আর অন্যান্যগুলিকে পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত হিসাবে গণ্য করার। পারেখ এই দৃষ্টিভঙ্গীকে বর্জন করেন। তাঁর মতে, বহুত্ববাদী পরিপ্রেক্ষিতই হল বর্তমান যুগের বহুসাংস্কৃতিক সমাজের চরিত্র অনুধাবন করার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী।

বহুসংস্কৃতিবাদ, পারেখের দৃষ্টিতে, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা বলে। এইসব বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজস্ব চাহিদা, দাবি দাওয়া কী হবে বা হওয়া উচিত, তা কোনও একটি একক সংস্কৃতির মানদণ্ডে নির্ধারিত হতে পারে না। তা গড়ে ওঠা প্রয়োজন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে খোলাখুলি কথাবার্তা ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে। তিনি এই পারস্পরিক মত বিনিময়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, সমাজে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাকে আমাদের সকলেরই মান্যতা দেওয়া উচিত এবং তা সর্বসমক্ষে স্বীকার করা প্রয়োজন।

পারেখের বহুসংস্কৃতিবাদের তত্ত্ব 'প্রকৃতিবাদ' (naturalism) ও 'সংস্কৃতিবাদ' (culturalism) দুটিকেই বর্জন করে। প্রকৃতিবাদ অনুসারে, সব ব্যক্তি মানুষেরই চরিত্র সাধারণভাবে স্থায়ী বা fixed এবং সংস্কৃতি

হল কেবল আপতিক (incidental)। অন্য দিকে, সংস্কৃতিবাদ দাবি করে মানব চরিত্র নির্মিত হয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এবং বিভিন্ন মানুষের মধ্যে খুব কম বিষয়েই মিল লক্ষ্য করা যায়। পারেখ মনে করেন, এই দুটি ধারণাই পক্ষপাতদুষ্ট। তাই তিনি জোর দেন মানব চরিত্রের মিলের দিকগুলি এবং তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্যর মধ্যে পারস্পরিক কথোপকথন (dialogue) ও মত বিনিময়ের উপর। কারণ এর মাধ্যমেই আজকের দিনের বহুসাংস্কৃতিক বিশ্বে বিভিন্ন ধরণের সংস্কৃতির মধ্যে একটি যথাযথ ভারসাম্য সৃষ্টি করা ও তা বজায় রাখা সম্ভব।

ভিখু পারেখ বিশ্বাস করেন, আমরা এমন কিছু নৈতিক মূল্যবোধ (moral values) গড়ে তুলতে পারি যা সমস্ত মানুষের কাছে শ্রদ্ধার সঙ্গে গৃহীত হবে। ব্যক্তির গুণাবলীকে স্বীকার করা, তার আত্মসম্মানকে মর্যাদা দেওয়া, মানব কল্যাণ ও ব্যক্তির মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করা এবং সমতা প্রতিষ্ঠা করা—এইগুলি একান্তভাবে প্রয়োজন। আমাদের সেই মূল্যবোধগুলিকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন যা যে কোনও সমাজে সুখী জীবন বা good life গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। সেইসব মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে সুসংহত করা দরকার বিশ্বব্যাপী ঐক্যমত। পারেখের এই বক্তব্যর উপর ভিত্তি করে বলা হয়ে থাকে তাঁর বহুসংস্কৃতিবাদের ধারণা যেন অনেকটাই মানবতাবাদ (humanism) ও রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়ী সর্বজনীনতা (synthetic universalism)-এর ধারণার কাছাকাছি।

৪.৪ বহুসংস্কৃতিবাদের মূল্যায়ন

বহুসংস্কৃতিবাদ সাম্প্রতিককালের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাগুলির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ্যে তুলে ধরে। বর্তমানের বহুসাংস্কৃতিক সমাজে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের জন্ম দেয় এবং সেই শাসন ব্যবস্থা সমাজস্থ নানা সাংস্কৃতিক ও জাতিগোষ্ঠীর বিভিন্নতাকে বিলোপ করে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তবায়িত করতে হলে প্রয়োজন একত্রে বসবাসকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে স্বীকার করে নেওয়া এবং সেগুলিকে সুরক্ষিত রাখা। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের উল্লিখিত সমস্যাটি শুধুমাত্র পশ্চিমি দুনিয়ার দেশগুলিতে সীমাবদ্ধ নয়। ভারতবর্ষের মত একটি বহুসাংস্কৃতিক সমাজেও গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলির স্ব স্ব পরিচয় বজায় রাখা।

অবশ্য এ কথাও মনে রাখা দরকার যে 'পার্থক্য'-র উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিলে এবং সমাজের প্রচলিত রীতিনীতিকে সর্বদা বর্জন করলে, কোনও কোনও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা ও বঞ্চনার সমস্যা দেখা দিতে পারে। যারা মূলস্রোতের (mainstrcam) সংস্কৃতিকে বাতিল করে তাদের সমস্ত উদ্যম ব্যয় করে নিজের ভাষা ও নিজের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য, তারা কোনও এক সময়ে গিয়ে হয়তো অনুভব করবে যে তাদের জন্য জীবিকা, ব্যবসা, পেশাগত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ইত্যাদির দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। কারণ, এ কথা অবশ্যই স্মরণে থাকা প্রয়োজন যে মূলস্রোতের সংস্কৃতি সর্বদাই আধিপত্যকারী সংস্কৃতি নয়—mainstream culture is not always the dominant culture''।

৪.৫ গ্রন্থসূচী

(১) O. P. Gauba, *Political Ideas and Ideologies*, 2013, 2nd edition, New Delhi, MacMillan India.

(২) Rajeev Bhargav, Asok Acharya (eds.), *Political Theory : An Introduction*, 2008, New Delhi, Pearson Longman.

(৩) C. W. Watson, *Multiculturalism*, 2002, Viva Books, New Delhi.

(৪) Andrew Vincent, *Modern Political Idedogies*, 1992, Oxford, Blackwell.

৪.৬ নমুনা প্রশ্নমালা

দীর্ঘ প্রশ্নাবলী ঃ

(১) বহুসংস্কৃতিবাদ বলতে কী বোঝায়? এই ধারণাটির গুরুত্ব আলোচনা কর।

(২) বহুসংস্কৃতিবাদ-এর ধারণাটি বিশ্লেষণ কর ও তার মূল্যায়ন কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

(১) বহুসংস্কৃতিবাদ সম্পর্কে টেইলর/কিম্‌লিকা/ইয়ং/ভিখু পারেখ-এর বক্তব্য আলোচনা কর।

(২) বহুসংস্কৃতিবাদ-এর উদ্ভবের প্রেক্ষাপটটি চিহ্নিত কর।

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

(১) বহুসংস্কৃতিবাদ-এর পূর্বসূরী হিসেবে গণ্য করা হয়—

(ক) বহুত্ববাদকে, (খ) একত্ববাদকে, (গ) উদারনীতিবাদকে

উত্তর ঃ (ক)

(২) **The Dynamics of a Democratic Exclusion** গ্রন্থটির প্রণেতা ঃ

(ক) কিম্‌লিকা, (খ) ভিখু পারেখ, (গ) টেইলর

উত্তর ঃ (গ)

(৩) 'Mirror Representation' নীতিটির প্রবর্তক

(ক) ইয়ং, (খ) কিম্‌লিকা, (গ) ভিখু পারেখ

উত্তর ঃ (খ)

একক—১ ❑ আধিপত্য ঃ আন্তোনিও গ্রামশি (Hygemony : Antonio Garamsci)

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ আধিপত্য, পুরসমাজ এবং বিপ্লবের কৌশল

১.৪ 'আধুনিক নৃপতি' এবং আধিপত্যের ধারণা

১.৫ নমুনা প্রশ্ন

১.৬ গ্রন্থসূচী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটবে :

(ক) গ্রামশির পরিকাঠামো আধিপত্যের ধারণার একটি সম্যক পরিচিতি দেওয়া হবে।

(খ) আধিপত্য, পুরসমাজ ও বিপ্লবের কৌশলের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে একটি পরিচিতি ঘটবে।

(গ) গ্রামশির নৃপতি ও আধিপত্যের ক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ে বক্তব্যের একটি পরিচয় দেয়া হবে।

১.২ ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ের এক বিখ্যাত ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামশি। রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাবে পশ্চিম ইউরোপে মার্কসবাদের যে ধারার উৎপত্তি হয় যা পশ্চিমী মার্কসবাদ হিসেবে খ্যাত, সেই ঐতিহ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গ্রামশি। মার্কসবাদের এই ধারা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক পর্বে গড়ে ওঠা নির্ধারিত মার্কসবাদের বিপরীতে, আত্মগত মনোভাব, সচেতনতা, উপরিকাঠামোর মত বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্বে গ্রামশির অবদান গড়ে উঠেছে মূলতঃ আধিপত্য, আধুনিক নৃপতি, নিষ্ক্রিয় বিপ্লব, বিপ্লবের কৌশলের মত বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে। এই ধারণাগুলি সম্পর্কে গ্রামশির উদ্ভাবনী সংযোজন রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসীয় চিন্তাধারাকে আরও প্রশস্ত করেছে।

গ্রামশি ছিলেন উপরিকাঠামোর তাত্ত্বিক এবং মার্কসীয় তত্ত্বে দৃষ্টবাদ ও নির্দিষ্টবাদের সমালোচক। ১৯২১ সালে গড়ে ওঠা ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির অনতম প্রতিষ্ঠাতা গ্রামশি ছিলেন একাধারে একজন সক্রিয় কর্মী ও বুদ্ধিজীবী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ও তার পরবর্তী অধ্যায়েও গ্রামশি তৎকালীন ইতালির সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এবং এমন কিছু ঘটনার সাক্ষী ছিলেন যার পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর মার্কসবাদ সম্পর্কে এক বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। যেমন—প্রথমতঃ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইতালির পরাজয়, যার ফলে রাষ্ট্র ও সমাজে চূড়ান্ত সঙ্কট সৃষ্টি হয়

ও তার ফলে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে ক্রমাগত উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়; ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর ইতালির জনগণকে বিকল্প বৈপ্লবিক ধারায় সংগঠিত করার ব্যাপারে সোসালিস্ট পার্টির ব্যর্থতা; ইতালিতে ফ্যাসিবাদের দ্রুত প্রভাব বৃদ্ধি এবং মানবচেতনাকে নিজস্বার্থে ব্যবহার করে ১৯২৬ সালে ফ্যাসিবাদীদের ক্ষমতা দখল; ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থতা, বিশেষতঃ PCI ফ্যাসিবাদের চ্যালেঞ্জের মুখে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে, ব্যর্থ হল। গ্রামশির এই সকল ধারণা সমূহের এক জটিল রূপের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রিজন নোটবুকস (Prison Notebooks)-এ (১৯২৬-১৯৩৭)। মুসোলিনী ক্ষমতায় আসার পরে তিনি গ্রেপ্তার হন। গ্রামশি ইতালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের কারণ ও বিকাশ, জনগণের সম্মতি নিশ্চিতকারী চার্চ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত ক্ষেত্রগুলিকে অর্থাৎ পুরসমাজকে দক্ষতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টির ব্যাখ্যা করেন। এখানেই PCI এর একটি প্রভাবশালী অংশের, যার পুরোধা ছিলেন আমাদিও বরদিগা (Amadeo Bordiga)। তাঁর মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। গ্রামশির মতে ইতালিয় জনমানসে ফ্যাসিবাদের যে ভিত্তি প্রোথিত হয়েছিল, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য সমাজের উপরিকাঠামো স্তরে এক সাংস্কৃতিক, বৌদ্ধিক কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে বরাদিগা এই অভিমতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। কারণ তিনি মনে করতেন ইতালিতে ফ্যাসিবাদ প্রকৃতপক্ষে জনসমর্থনহীন এক দুর্বল, অস্থিতিশীল শক্তি। তাই তিনি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে অক্টোবর বিপ্লবের ধারায় বিদ্রোহ গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। এই বিষয়গুলির আলোকেই গ্রামশি মার্কসবাদের এক বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রামশি তাঁর 'প্রিজন নোটবুকস' (Prison Notebooks) গ্রন্থে এই বিকল্প মার্কসবাদকে 'ফিলসফি অফ প্র্যাক্সিস' (Philosophy of Praxis) নামে আখ্যা দিয়েছিলেন। চেতনা বাস্তব জগতের-ই ফসল—এই প্রচলিত মার্কসবাদী ধারণাকে তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। তিনি মানুষের স্ব-ইচ্ছা, আত্মগত দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনার ক্রিয়াশীল ভূমিকার উপর জোর দিয়েছেন।

পরবর্তী অংশগুলিতে তাঁর এই ধারণাগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

১.৩ আধিপত্য, পুরসমাজ এবং বিপ্লবের কৌশল

গ্রামশির কাছে আধিপত্য হল একটি শ্রেণীর বৌদ্ধিক, নৈতিক নেতৃত্ব যারা শাসিতের সম্মতি লাভ করতে সক্ষম। তাই তাদের আধিপত্য রক্ষার জন্য হিংসা ও বল প্রয়োগের প্রয়োজন আবশ্যিক হয় না। পশ্চিমের দেশগুলিতে পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতি শ্রেণী ক্ষমতায় এসেছে, এবং তাদের শাসন ঐতিহাসিকভাবে বৈধতা লাভ করেছে। আধিপত্য প্রাথমিকভাবে সমাজের উপরিকাঠামোর উপাদানগুলিতে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। কারণ—যে প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের মানস ও চেতনা গঠনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সমাজের সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রভাবিত করতে পারলে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থায়িত্ব লাভ করে। সুতরাং আধিপত্য আধুনিক পুঁজিবাদের এক কৌশল। এই প্রেক্ষিতেই গ্রামশির কাছে পুরসমাজের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এতদিন পুরসমাজকে গণপরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন, একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত পরিসর হিসেবেই দেখা হত। পুরসমাজ ছিল রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণমুক্ত, ব্যক্তির নিজস্ব অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র। গ্রামশি এই ধারণাকে বর্জন করেন নি, বরং পুরসমাজের ক্ষেত্রটিকে আরও প্রসারিত করেছেন। পুরসমাজকে পরিবার, চার্চ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-এর মত সমাজের উপরিকাঠামোর উপাদানগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রকৃতিগতভাবে ব্যক্তিগত হলেও

রাষ্ট্রের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। গ্রামশির মতে আধিপত্যের লক্ষ্য এই পুরসমাজ। কারণ—বলপ্রয়োগের বদলে বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মত উপরিকাঠামোর উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই জনসাধারণের কাছে পৌঁছানো সম্ভব।

সনাতনী মার্কসবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র একটি দমনপীড়নমূলক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা চালায়। সুতরাং, একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রাম, বিদ্রোহের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের পতন ঘটানো সম্ভব। গ্রামশি তাঁর পুরসমাজের ধারণার মাধ্যমে মার্কসবাদে এক নতুন সংযোজন আনেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় গ্রামশি বলপ্রয়োগের ভূমিকাকে কোনোভাবেই হ্রাস করেন নি। কিন্তু পুঁজিবাদের অস্তিত্ব রক্ষায় দমনপীড়নই প্রধান নয়, সম্মতিই এর ভিত্তি যা পুরসমাজে আধিপত্য লাভের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। সুতরাং, গ্রামশির মতানুযায়ী আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্মতি ও বলপ্রয়োগ, দমনপীড়ন ও আধিপত্যের এক সংমিশ্রিত রূপ। অর্থাৎ—রাষ্ট্র = রাজনৈতিক সমাজ (বল) + পুরসমাজ (সম্মতি)। রাষ্ট্র ও সমাজের এই নতুন ব্যাখ্যা গ্রামশির বিপ্লবের কৌশল সম্পর্কিত অভিনব ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। সনাতনী মার্কসবাদ অনুযায়ী একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব, কারণ রাষ্ট্র বুর্জোয়া শ্রেণীর দমনপীড়নের হাতিয়ার। গ্রামশি এই ব্যাখ্যার পরিবর্তন করেন। গ্রামশি দেখান যে, যেখানে আধিপত্য নেই, পুরসমাজ অনুপস্থিত, এই কৌশল শুধুমাত্র সেখানে সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—জার শাসিত রাশিয়ায় রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, পুরসমাজের কোনো মূল্য নেই ফলস্বরূপ সেখানে সম্মতির কোনো স্থান ছিল না। গ্রামশি তাই 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্যের বিভাজন করেছেন। 'প্রাচ্যের' দেশগুলিতে পুরসমাজের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আধিপত্যও প্রায় অস্তিত্ববিহীন। রাষ্ট্র দমনপীড়নের মাধ্যমেই শাসনকার্য পরিচালনা করে। অপরপক্ষে, যে সব দেশে পুরসমাজের উপস্থিতি লক্ষ্যনীয়, রাষ্ট্র সম্মতির ভিত্তিতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সেখানে সক্ষম হয়েছে। গ্রামশি এই দেশগুলিকে 'প্রতীচ্য' প্রতীচ্য আখ্যা দিয়েছেন। এই 'প্রাচ্য'—'পাশ্চাত্য' বিভাজন অনুযায়ী প্রয়োগের বিষয়টি গ্রামশির কাছে গুরুত্বপূর্ণ। 'প্রাচ্য'-এর ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহের বিষয়টি প্রয়োগযোগ্য। কারণ প্রাচ্যে রাষ্ট্র দমনপীড়নের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। তাই একমাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের পতন ঘটানো সম্ভব। অন্যদিকে, 'প্রতীচ্যে' বিদ্রোহের পূর্বে পুরসমাজের উপস্থিতির বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই দেশগুলিতে রাষ্ট্র জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত বিপ্লবকে ফলপ্রসূ করে তুলবে না। রাষ্ট্র এখানে পুরসমাজ দ্বারা সুরক্ষিত। সুতরাং, বিপ্লবকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পুরসমাজকে আয়ত্তে এনে গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্র একটি দুর্গ, দুর্গকে যেমন পরিখা বেষ্টন করে রাখে, তেমনই রাষ্ট্রও পুরসমাজের পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। সুতরাং, রাষ্ট্রকে দখল করার পূর্বে তার বেষ্টনকে আয়ত্তে আনা প্রয়োজন। সুতরাং, এটি একটি দীর্ঘ যুদ্ধ। মতাদর্শের যুদ্ধ, সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। এটি এমনই কৌশল গ্রামশি যাকে 'অবস্থানভিত্তিক যুদ্ধ' (War of Position) হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। গ্রামশির মতে ইতালিতেও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই, আধিপত্যের প্রসঙ্গ ব্যতিরেকে হবে না।

এখানে দুটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। প্রথমত, গ্রামশির মতে আধুনিক রাষ্ট্রের দুটি উপাদান—বলপ্রয়োগ ও সম্মতি। উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু একমাত্র শেষ বিচারে বলপ্রয়োগ সবকিছু নির্ধারণ করে—পেরি অ্যান্ডারসন (Parry Anderson)-এর মত তাত্ত্বিকরা গ্রামশির এই অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করেন। অ্যান্ডারসন

মনে করেন দমনপীড়ন ও বলপ্রয়োগের যে ভিত্তির ওপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত, গ্রামশি সেই বিষয়টির গুরুত্ব হ্রাস করেছেন। আসলে গ্রামশি বুর্জোয়া শ্রেণী আধিপত্যের কৌশল গ্রহণ করে কীভাবে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে সেই ব্যাখ্যায় মনোযোগী। গ্রামসীয় অভিমতে কোনো একটি নির্দিষ্ট কৌশল সর্বপ্রকার সমাজ নির্বিশেষে চিরকালীন নয়। দ্বিতীয়ত আধিপত্য যদি জনগণস্বীকৃত এক বৌদ্ধিক, নৈতিক নেতৃত্ব হয়, তাহলে বলা যায় ফ্যাসিবাদ কখনই আধিপত্য লাভ করে নি। ফ্যাসিবাদ সুকৌশলে পুরসমাজের প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধীনস্থ করেছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিবাদ ছিল 'আধিপত্যবিহীন শাসন', গ্রামশি যাকে 'নিষ্ক্রিয় বিপ্লব' আখ্যা দিয়েছেন। এই 'নিষ্ক্রিয় বিপ্লব' বিপ্লবের স্লোগান ও ভাষা ব্যবহার করে প্রকৃত বিপ্লবের পথ রুদ্ধ করে। একে 'উপর থেকে বিপ্লব' বলা যায় যা নিচু থেকে প্রকত বিপ্লব হতে দেয় না। এইভাবেই গ্রামশি দেখিয়েছেন গ্যারিবল্ডি (Garibaldi) ১৮৭১ সালে ইতালিতে হওয়া রিসর্জিমেন্টো-র (Risorgimento) (ইতালির ঐক্যবদ্ধকরণ) অন্যতম নেতা হওয়া সত্ত্বেও, কীভাবে তিনি ও তাঁর Action Party ইতালিয় কৃষক শ্রেণীকে অনুপ্রাণিত করতে এবং প্রকৃত কৃষক বিপ্লব গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সুতরাং রিসর্জিমেন্টো-র মাধ্যমে গঠিত ইতালি প্রকৃতপক্ষে একটি দুর্বল রাষ্ট্রের জন্ম দেয় এবং সেই রাষ্ট্র তার সাধারণ জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সর্বৈবভাবে ব্যর্থ হয়। ঠিক একইভাবে বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মান জাতিরাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। 'পরোক্ষ/নিষ্ক্রিয়' বিপ্লবের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ব্যতীত সমাজের গঠনগত ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিদ্যমান ছিল 'সম্মতিবিহীন শাসনব্যবস্থা'। এটি অনস্বীকার্য যে গ্রামশি শুধুমাত্র পুররসমাজের ধারণাই নয়, রাষ্ট্রের সংকীর্ণ ধারণাকেও প্রসারিত করেছিলেন, যা রাষ্ট্র সম্পর্কিত ঐতিহ্যবাহী/প্রথাগত মার্কসবাদী ধারণাকেও প্রশস্ত করে।

এই প্রেক্ষিতেই গ্রামসি আধিপত্য রক্ষায় বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গটির অবতারণা করেন। বুদ্ধিজীবীরা মানুষের মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক চেতনা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গ্রামশি আবার বুদ্ধিজীবীদের দুভাগে বিভক্ত করেছেন—সনাতনী বুদ্ধিজীবী (traditional intellectuals) ও জৈবিক বুদ্ধিজীবী (organic intellectuals)। সনাতনী বুদ্ধিজীবীরা এই কার্যটি কোনো আদর্শের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হয়েই সম্পাদন করে থাকেন। কিন্তু গ্রামশির লক্ষ্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পতনের জন্য একটি শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লব। তাই গ্রামশি গুরুত্ব দিয়েছেন জৈবিক বুদ্ধিজীবীদের ওপর, যাঁরা একটি বিপ্লবের প্রতি আদর্শের এবং যে কোনো পরিস্থিতিতেই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে দাঁড়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। গ্রামশির মতে একমাত্র জৈবিক বুদ্ধিজীবীরাই প্রলেতারিয়েতদের স্বার্থ তুলে ধরতে সক্ষম। শ্রমিক শ্রেণীর আধিপত্য লাভের সংগ্রামে তাঁদের ভূমিকা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

১.৪ আধুনিক নৃপতি (প্রিন্স) এবং আধিপত্যের ধারণা

গ্রামশি ছিলেন একাধারে একজন চিন্তাবিদ্ ও সমাজ সংগঠক এবং ১৯২৬ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার সময় পর্যন্ত PCI দলের সাধারণ সম্পাদক। মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম লক্ষ্য ছিল নতুন আঙ্গিকে বৈপ্লবিক দলের ধারণাটিকে দেখা। গ্রামশি আধিপত্যের সঙ্গে তাঁর এই ধারণাটি সংযুক্ত করেন। তিনি দেখান যে বুর্জোয়া আধিপত্যের বিপরীতে কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি বিকল্প আধিপত্য গড়ে তুলতে

হবে। এই আধিপত্য শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর আধিপত্য নয়, এই আধিপত্য বৌদ্ধিক, নৈতিক আধিপত্য। এই আধিপত্য হবে সমগ্র সমাজের 'জাতীয় ও জনগণের সমগ্র চেতনার' প্রতীক। এই আধিপত্যসৃষ্টিকারী দল ম্যাকিয়াভেলির নৃপতি-এর ভূমিকা পালন করবে, তাই গ্রামশি এটিকে 'আধুনিক নৃপতি' হিসেবে অভিহিত করেছেন। ম্যাকিয়াভেলি যেমন নৃপতির ধারণা তুলে ধরেছিলেন, যার নেতৃত্বে ইতালি সামাজিকভাবে, নৈতিকভাবে এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে বিকশিত হবে, একইভাবে গ্রামশির মতে কমিউনিস্ট পার্টিকেও এই নৃপতির ভূমিকা পালন করতে হবে। তাই দমনপীড়নের ভিত্তিতে পরিচালিত না হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি প্রকৃত আধিপত্য সৃষ্টিকারী শক্তি হিসেবে ইতালিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

১.৫ নমুনা প্রশ্ন

দীর্ঘ প্রশ্নমালা ঃ

(১) আধিপত্যের ধারণা প্রসঙ্গে গ্রামশির বিপ্লবের কৌশলের বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

মধ্যম প্রশ্নমালা ঃ

(১) কীভাবে গ্রামশি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণাটি প্রসারিত করেছেন তা বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা ঃ

(১) "অবস্থানভিত্তিক যুদ্ধ" বলতে কী বোঝেন?

(২) "নিষ্ক্রিয় বিপ্লব" বলতে কী বোঝায়?

১.৬ গ্রন্থসূচী

A. Tom Bottomore et al (eds) : *A Dictionary of Marxist Thought*. Second edition (Oxford : Blackwell, 1991). The entries on "Gramsci" and "Hegemony".

B. L. Kolakowski : *Main Currents of Marxism*. Vol. III (Oxford & New York : Oxford University Press, 1978)

C. David McLellan : *Marxism after Marx. An Introduction*. Indian edition (London & Basingstoke, 1979)

D. Martin Carnoy : *The State and Political Theory* (Princeton : Princeton University Press, 1984)

E. Joseph D. Femia : *Gramsci's Political Thought*. (Oxford : Clarendon Press, 1987)

একক—২ ❑ মতাদর্শ ঃ লুই আলথুসার (Ideology : Louis Althuser)

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.৩ আলথুসারের পদ্ধতি

২.৪ মতাদর্শ প্রসঙ্গে আলথুসার

২.৫ মতাদর্শ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আলথুসারের মতামত

২.৬ নমুনা প্রশ্ন

২.৭ গ্রন্থসূচী

২.১ ভূমিকা

এই এককটি পাঠ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটবে :

(ক) ভূমিকাতে মতাদর্শ সম্পর্কে আলথুসারের ধারণার একটি সামগ্রিক পরিচিতি দেওয়া হবে।

(খ) আলথুসারের পদ্ধতি।

(গ) মতাদর্শ বিষয়ে আলথুসারের ভাবনা।

(ঘ) মতাদর্শ ও রাষ্ট্র প্রসঙ্গে আলথুসারের বক্তব্য।

২.২ ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ফরাসী মার্কসবাদ-এর একজন অন্যতম পৃথিকৃৎ লুই আলথুসার। গ্রামশির মতই আলথুসারও উপরিকাঠামোর তত্ত্বের বিশ্লেষক এবং মার্কসীয় নির্ধারণবাদী তত্ত্বের কঠোর বিরোধী। কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে গ্রামশি ও আলথুসার বিংশ শতকের মার্কসবাদের দুটি ভিন্ন ধারাকে বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রামশি লুকাচ, মার্লো পন্তি ও সার্ত্র-মার্কস-এর মানবিক ঐতিহ্যের দিকটি তুলে ধরেছেন। তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গী মার্কসের হেগেলীয় উৎসমুখ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে গুরুত্ব পেয়েছে হেগেলের সচেতনতা, বিষয়ীবাদিতার মত বিষয়গুলি। আলথুসার মার্কসবাদের এক কাঠামোবাদী ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন যেখানে মার্কসীয় উপস্থাপনায় বিষয়ীবাদী যুক্তিসমূহ, সচেতনতা, মানবতার মত বিষয়গুলিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে। আলথুসার মার্কসবাদকে 'তাত্ত্বিক প্রতিমানবতাবাদ' (theoretical antihumanism) হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যার তাত্বিক ভিত্তিভূমি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। আলথুসারের দৃষ্টিভঙ্গিতে মার্কসবাদের হেগেলীয় ঐতিহ্যকে এবং বিজ্ঞান হিসেবে মার্কসবাদের নির্ধারণবাদী বা শুধুমাত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গীকে অস্বীকার করা হয়েছে। মার্কসবাদের কাঠামোবাদী নির্মাণে ফ্রয়েড এবং পরিকাঠামোগত ভাষাতাত্ত্বিকদের (structural linguistics) দ্বারা আলথুসার প্রভাবিত হন।

আলথুসার রাষ্ট্র ও মতাদর্শ ভাবনায় অতিনির্ধারণবাদী (Overdetermination)-এর মত ধারণার আলোচনার মাধ্যমে মার্কসবাদকে নতুনভাবে পর্যলোচনা করেছিলেন। এইভাবেই আলথুসার বিংশ শতকে মার্কসবাদের এক নতুন দিক উন্মোচন করেছিলেন।

আলথুসার মতাদর্শ, উপরিকাঠামোর স্বতন্ত্রতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ১৯৬০-এর দশকে তাঁর সমসাময়িক ফরাসী দার্শনিকদের (জাঁ পল সার্ত্র, মার্লো পন্তি, রজার গারুদি) লেখায় মার্কসবাদের মানবতাবাদী ধারায় মানুষ, সচেতনতা, বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছিল। আলথুসার এই বিষয়গুলির পরিবর্তে বিজ্ঞান ও কাঠামোগত দিকের ওপর আলোকপাত করতে চেয়েছিলেন, যার সূত্র 'পরিণত মার্কস'-এর রচনা থেকে পাওয়া যায়। মার্কসের 'ক্যাপিটাল' (Capital) গ্রন্থটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। আলথুসার যে সব গ্রন্থসমূহে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, সেগুলি হল—For Marx (একাধিক রচনাসমগ্র), Reading Capital (এই বইটি E. Balibar-এর সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত) এবং On Ideology and Ideological State Apparatuses.

আলথুসারের মার্কসবাদ বুঝতে গেলে দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে—

প্রথমত, ১৯৫০-১৯৬০-এর দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপে মার্কসবাদের মানবতাবাদী ঐতিহ্য বিকাশলাভ করে। এই ধারায় আত্মগত বিষয় (subjectivity), ইচ্ছা, সচেতনতার মত বিষয়গুলি গুরুত্ব লাভ করে। আলথুসার মার্কসবাদের এই মানবতাবাদী ব্যাখ্যার আপোশহীন সমালোচক ছিলেন। মানবতাবাদী মার্কসবাদের উদ্ভবের কারণ হিসেবে দুটি বিষয়কে বলা যায়—(১) মার্কসের প্রথমদিকের বিভিন্ন রচনার আবিষ্কার, (২) ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির বিংশতিতম পার্টি কংগ্রেসের সময় ইউরোপীয় মার্কবাদকে স্তালিনের প্রভাবমুক্ত করার ফলে মানবতাবাদী মার্কসবাদ জন্ম লাভ করে। গ্রামশি এবং আলথুসার বিংশ শতকে মার্কসবাদের দুটি ভিন্ন ধারাকে উপস্থাপন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, আলথুসার বিজ্ঞান ও উরিকাঠামোর ভিত্তিতে যে মার্কসবাদের সূচনা করেছিলেন তা হেগেলীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মানবতাবাদী মার্কসবাদের থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল। আলথুসারের এই দৃষ্টিভঙ্গী কাঠামোবাদ থেকে উদ্ভূত এবং ভাববাদের বিপরীতে প্রতিষ্ঠিত। কাঠামোবাদী তত্ত্বে বলা হয় যে কোনো কিছুর অর্থ কখনই বিষয় দ্বারা ব্যক্ত শব্দসমূহ থেকে উদ্ঘাটন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ভাষার অদৃশ্য ও নৈর্ব্যক্তিক গঠনের মধ্যে দিয়ে বিষয়ের প্রকৃত অর্থ ব্যক্ত হয়। বিষয়ের স্বতন্ত্রতার পরিবর্তে কাঠামোবাদের লক্ষ্য কাঠামোর স্বাতন্ত্র। অর্থাৎ, উৎপাদনের কাঠামোর নিরিখে বিষয় ও তার চেতনাবোধ নির্ধারিত হয়। এটিই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল বক্তব্য। আলথুসারের কাছে এটিই বিজ্ঞানের পদ্ধতি যার উপস্থিতি পরিণত মার্কসের লেখাতে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রাথমিক সূত্রের ভিত্তিতেই আলথুসার তাঁর 'কাঠামোবাদী মার্কসবাদের' ধারণা গড়ে তোলেন। রাষ্ট্র, মতাদর্শ ও আলথুসারের পদ্ধতি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পরের অংশে করা হল।

২.৩ আলথুসারের পদ্ধতি

হেগেল তাঁর সামগ্রিকতার ধারণায় দাবী করেন বিশেষ (Particulars) আত্মা, অনন্ত (Spirit/

Absolute/Idea) প্রভৃতি সর্বব্যাপী ভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। আলথুসার হেগেলের সামগ্রিকতার ধারণার বিরোধিতা করেন। আলথুসার-এর মতে উপরিকাঠামো শুধুমাত্র একটি স্বতন্ত্র সত্তাই নয়, এর বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এক জটিল পরস্পরবিরোধী অবস্থান বিদ্যমান। তাই তাঁর মতে এই জটিল, দ্বান্দ্বিক উপরিকাঠামোকে অর্থনৈতিক বিরোধের ফলশ্রুতি হিসেবে ব্যাখ্যা না করে উপরিকাঠামোর অভ্যন্তরস্থিত বহুমুখী দ্বন্দ্বের প্রকাশ হিসেবে ব্যাখ্যা করাই শ্রেয়। অর্থাৎ, বাস্তবকে ব্যাখ্যা করতে গেলে বিষয়ের বহুমুখীতার প্রেক্ষিত থেকে বিচার করতে হবে। আলথুসার বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন অতিনির্ধারণবাদ হিসেবে। এই ধারণাটি ঐতিহ্যবাদী মার্কসবাদের নির্ধারণবাদের ধারণা থেকে পৃথক। এই স্বতন্ত্র পরিকাঠামো, যার মধ্যে বহুমুখী দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, আলথুসারের মার্কসবাদী ধারণায় তাকে 'কাঠামো' বলা হয়েছে। এই কাঠামোর মধ্যেই উৎপাদন সম্পর্ক নির্ণীত হয়।

আলথুসার যেভাবে মানবতাবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদী ধারণাসমূহকে অস্বীকার করেছিলেন সেই প্রেক্ষিতেই তাঁর বিজ্ঞানসম্মত সত্য ও জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিকে বিচার করতে হবে। মানবতাবাদের যে প্রকাশ মার্কসের প্রথম দিকের রচনায় ও পরবর্তীকালে সার্ত্র, মার্লো-পন্তি ও গারুদির রচনায় পাওয়া যায়, যেখানে সচেতনতা, বিষয়গত ধারণা ও ইচ্ছাশক্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, আলথুসার তার সমালোচনা করেন। আলথুসারের মতে মার্কসবাদের মানবতাবাদী ধারণার মূল লক্ষ্য হল মানবসত্তা, প্রলেতরিয়েতের শ্রেণী সচেতনতা ইত্যাদি। অভিজ্ঞতাবাদ জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়, আলথুসার যার সমালোচনা করেছিলেন। কারণ তাঁর মতে কোনো বস্তুকে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। আলথুসারের মতে জ্ঞান হল একটি তাত্ত্বিক চর্চা।

আলথুসার এটিকে 'তাত্ত্বিক অভ্যাস' (Theoretical Practice) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে এই 'তাত্ত্বিক অভ্যাস'-এর তিনটি উপাদান বিদ্যমান। সাধারণত্ব—১, সাধারণত্ব—২, সাধারণত্ব—৩। সাধারণত্ব—১ হল তাত্ত্বিক অভ্যাস/উৎপাদনের কাঁচামাল, মূল ধারণা ও তার অব্যবহিত উদ্দেশ্য। সাধারণত্ব—২ হল তাত্ত্বিক উৎপাদনের হাতিয়ার (problematic) যার সাহায্যে তাত্ত্বিক কাঁচামালকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে রূপান্তরিত করা হয়। এই দুটি পদ্ধতি অবলম্বনের পর যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লব্ধ হবে তাকে আলথুসার সাধারণত্ব—৩ বলেছেন। এই পদ্ধতির মধ্যে দিয়েই সাধারণত্ব—১ যা আলথুসারের ভাষায় "বাস্তব সত্য" Concreate real সাধারণত্ব—৩ অর্থাৎ "বাস্তব চিন্তা" বা "concreate in-thought"-এ রূপান্তরিত হয় এবং ফলস্বরূপ প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব হবে। অভিজ্ঞতাবাদী ধারণায় জ্ঞান 'বাস্তব সত্যের' মধ্যে থেকেই নির্ধারিত হয়, যেহেতু অভিজ্ঞতাবাদীরা 'জ্ঞান' (বাস্তব-চিন্তা) ও জ্ঞানলব্ধ বস্তুর (বাস্তব সত্য) মধ্যে কোনো পার্থক্য স্থাপন করেন না। আলথুসার অভিজ্ঞতাবাদীদের এই বিষয়টিরই বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে 'পরিণত মার্কসের' লেখায় যেমন—ক্যাপিটাল (Capital) গ্রন্থে এই পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এই বিষয়টিই 'পরিণত মার্কস' থেকে 'অপরিণত মার্কসকে' পৃথক করে। প্রাথমিকভাবে মার্কসের লেখায় মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেলেও 'পরিণত মার্কসের' লেখাতেই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রেক্ষিতেই আলথুসার মার্কসবাদকে 'তাত্ত্বিক প্রতিমানবতাবাদ' আখ্যা দেন।

২.৪ মতাদর্শ প্রসঙ্গে আলথুসারের অভিমত

সনাতনী মার্কসবাদে যেভাবে মতাদর্শকে বর্ণনা করা হয়েছিল, অর্থাৎ একটি কৃত্রিম সচেনতা বা নিছক অর্থনৈতিক ভিত্তির প্রতিফলন, আলথুসার তার বিরোধিতা করেছিলেন। আলথুসারের মতে, 'মতাদর্শের স্বতন্ত্র' একটি ক্ষেত্র আছে, একটি নিজস্ব কাঠামো আছে। ফলস্বরূপ, তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন—"Ideologies interpellate individuals as subjects." অর্থাৎ ব্যক্তিকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে মতাদর্শের প্রশ্ন উত্থাপনের প্রক্রিয়া। এর তিনদিক আছে। প্রথমত, মতাদর্শ মানবিক বিষয়সমূহ দ্বারা নির্ধারিত শুধুমাত্র সচেতনার বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত, মতাদর্শের একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। ফলত মতাদর্শ বিভিন্ন পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে, আলথুসার যাকে মতাদর্শগত apparatus বা যন্ত্র হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জটিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, তাদের রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান থেকে মতাদর্শের জন্ম হয়। এইভাবেই মতাদর্শের এক স্বতন্ত্র কাঠামো প্রস্তুত হয় এবং আলথুসারের মতে এই স্বতন্ত্র কাঠামোই মানুষের চেতনা গঠন করে এবং মানুষ মতাদর্শের বিষয়ে পরিণত হয়। এর থেকেই বলা যায় যে মতাদর্শ কোনো একটি সৃষ্ট বস্তু নয়, তার নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। সমাজের বিভিন্ন সমিতি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মতাদর্শ মানুষের মনে প্রবেশ করে ও সেই মতাদর্শ অনুযায়ী মানুষকে গড়ে তোলে (interpellates)। তৃতীয়ত, মতাদর্শ একটি পরিকাঠামোগত উপাদান হিসেবে মানুষকে এমনভাবে গড়ে তোলে যাতে পুঁজিবাদী উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় ও চেতনার স্তরে পুনরুৎপাদিত হয় (reproduction of capitalism)।

২.৫ মতাদর্শ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আলথুসারের অভিমত

আলথুসার মতাদর্শের 'আপেক্ষিক স্বাতন্ত্রের' বিষয়টির অবতারণা করে রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্বে অভিনবত্ব আনতে সক্ষম হয়েছেন। মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করলে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করা যায় এবং দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রতিষ্ঠা হয়। আলথুসার এই মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের (State apparatus) মধ্যে তিনি বিভাজন করেন। তাঁর মতে বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেই বিপ্লবী শক্তির ক্ষমতা অর্জন নিশ্চিত হয় না, কারণ—রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রযন্ত্র দুটি পৃথক বিষয়। এক্ষেত্রে আবার তিনি বিভাজন করেছেন—'দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র' (Repressive State Apparatus (RSA) এবং 'মতাদর্শগত রাষ্ট্রযন্ত্র (Ideological State Apparatus) (ISA)। আলথুসারের মতে 'দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্র' পুলিশ, সেনাবাহিনী ইত্যাদি নিয়ে সংগঠিত। অপরদিকে 'মতাদর্শগত রাষ্ট্রযন্ত্র' বিভিন্ন মতাদর্শগত কাঠামো দ্বারা সংগঠিত। এই মতাদর্শগত কাঠামো শিক্ষা ব্যবস্থা, পরিবার, বিভিন্ন আইনবিষয়ক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠনের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাধান্যকারী শ্রেণীর মতাদর্শের বাহক হিসেবে মানুষের চিন্তনে, মননে সক্রিয় থাকে। সুতরাং, নিছক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করে না। কারণ 'দমনমূলক রাষ্ট্রমন্ত্র' দখল করলেও 'মতাদর্শগত রাষ্ট্রযন্ত্র'-এর সঠিক পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তার মাধ্যমে

বুর্জোয়া মতাদর্শ প্রোলেতারিয়েতের রাষ্ট্রকে তার অভ্যন্তর থেকে আঘাত করে যাবে। আলথুসারের মতে এই 'মতাদর্শগত যন্ত্র' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা তিনি স্বতন্ত্র মতাদর্শের ক্ষেত্র থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। 'মতাদর্শগত যন্ত্রকে' তিনি শ্রেণীসংগ্রামের এক মুখ্য পরিসর হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে যেটি মূল্যবান। আলথুসার এ ক্ষেত্রে লেনিনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। লেনিন ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ার সর্বহারা শ্রেণীর অর্জিত রাষ্ট্রক্ষমতা সুরক্ষিত করার জন্য ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে 'মতাদর্শগত রাষ্ট্রযন্ত্রকে' বৈপ্লবিকভাবে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

২.৬ নমুনা প্রশ্ন

দীর্ঘ প্রশ্নমালা ঃ

(১) মতাদর্শ সম্পর্কে আলথুসারের অভিমত ব্যাখ্যা করুন।

মধ্যম প্রশ্নমালা ঃ

(১) 'আলথুসারের মানবতাবাদ অস্বীকার করার বিষয়টির সঙ্গে তাঁর কাঠামোবাদের প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কীভাবে সম্পর্কিত?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা ঃ

(১) আর. এস. এ (R.S.A) বলতে কী বোঝায়?

(২) 'অতিনির্ধারণবাদ' বলতে কী বোঝেন?

২.৭ গ্রন্থসূচী

A. David MeLellan : *Marxism after Marx : An Introduction*. Indian edition (London & Basingstoke, 1979)

B. Tom Bottomore et at (eds) : *A Dictionary of Marxist Thought*. The entires on "Althusser" and "Structuralism". Second edition (Oxford : Blackwell, 1991)

C. Martin Carnoy : *The State and Political Theory* (Princeton : Princeton University Press, 1984)

D. John Lechte : *Fifty Key Contemporary Thinkers : From Structuralism to Postmodernity* (Oxford & *New York : 1994*)

একক—৩ ❑ রাষ্ট্র সম্পর্কিত হাতিয়ারবাদী অভিমত ঃ র‍্যালফ মিলিব্যান্ড (Instrumentalist view of state : Ralfh Miliband)

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সম্পর্কে মিলিব্যান্ড
৩.৪ নমুনা প্রশ্ন
৩.৫ গ্রন্থসূচী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটবে ঃ

(ক) ভূমিকাতে রাষ্ট্র প্রসঙ্গে মিলিব্যান্ডের ভাবনার একটি সামগ্রিক পরিচয় দেখা হবে।

(খ) পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রসঙ্গে বিলিব্যাঙ্কের বক্তব্য।

৩.২ ভূমিকা

এই এককে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশিষ্ট ব্রিটিশ মার্কসবাদী তাত্ত্বিক র‍্যালফ মিলিব্যান্ড-এর ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। আধুনিক রাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যাখ্যা এবং পশ্চিমী উদারনীতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কিত নাস্তিক্যবাদী মতামতের জন্য মিলিব্যান্ড সুপরিচিত। মিলিব্যান্ড রাষ্ট্রকে ব্যাখ্যা করেছেন ধনতন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থের নিরীখে। মার্কসীয় রাজনৈতিক তত্ত্বে তাঁর এই অবদান রাষ্ট্র সম্পর্কিত হাতিয়ারবাদী মতামত হিসেবে সুপরিচিত। এই বিষয়টিই তাঁকে নিকোস পুলানৎজাস-এর কাঠামোবাদের বিপরীত অবস্থানে নিয়ে যায়। মিলিব্যান্ড এই সময়ের সেইসব অল্পসংখ্যক মার্কসবাদী লেখকদের মধ্যে একজন, যাঁরা রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াইয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মিলিব্যান্ড ছিলেন ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এক আপোসহীন সমালোচক এবং সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। মিলিব্যান্ডের মতানুযায়ী বিশ্ববিপর্যয়েও সমাজতন্ত্রই একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প। ই. এস. উডের মতে মিলিব্যান্ডের বৌদ্ধিক ধারার স্বাতন্ত্র্য তাঁর বক্তব্যের ক্ষেত্রে অপরিহার্য দিক এবং এই বিষয়টিই সমাজতান্ত্রিক বামপন্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে উঠেছে। মিলিব্যান্ডের এই চিন্তাধারা এমনকি ১৯৯১-এ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতনের পরও অব্যাহত থাকে। ১৯৯০ সালে 'সোস্যালিস্ট রেজিস্টার'-এ মিলিব্যান্ড লেখেন 'আধিপত্য বিরোধী লড়াই-এর চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল সমাজতন্ত্রকে যুগের সাধারণ জ্ঞানে পরিণত করা। অর্থাৎ, এর সঙ্গে দুটি বিষয় জড়িত। প্রথমত প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক সমালোচনা এবং দ্বিতীয়ত একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সামাজিক বিন্যাস শুধুমাত্র কাম্যই নয় তা অর্জন করাও সম্ভব—এই ধারণাকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করা।

এই চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই ১৯৬৯ সালে 'দি স্টেট ইন ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি' (The State in Capitalist Society) গ্রন্থে মিলিব্যান্ড ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে গড়ে তোলেন এবং পরবর্তীকালে এই সূত্রেই তিনি পুলানৎজাস-এর সঙ্গে/বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন যা মিলিব্যান্ড-পুলানৎজাস

বিতর্ক নামে সুপরিচিত। এই বিতর্কে পুলানৎজাস-এর কাঠামোবাদী অবস্থানের বিপরীতে মিলিব্যান্ড হাতিয়ারবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পরের অংশে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে মিলিব্যান্ডের ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

৩.৩ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে মিলিব্যান্ডের মতামত

রাষ্ট্র সম্পর্কে মিলিব্যান্ডের ধারণাকে রাষ্ট্র সম্পর্কিত প্রচলিত বহুত্ববাদী তত্ত্বগুলির এক পর্যালোচনা হিসেবে দেখা যেতে পারে। ই. এস. উড-এর মতে, এই পর্যালোচনা রাষ্ট্রকে সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হিসেবে চিহ্নিত করে ও ফলস্বরূপ 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' ও 'রাজনৈতিক আবরণ' ইত্যাদি অস্পষ্টতা দূর করে রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক আলোচনার এক, হয়ত বা একমাত্র কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে উন্মোচিত করে। রাজনৈতিক আলোচনায় বহুত্ববাদী বা আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে অনেকগুলি কারণের ফলশ্রুতি হিসেবে ব্যাখ্যা করায় প্রয়াসী, যা ধনতান্ত্রিক শোষণের বিষয়টাকে আড়াল করতে সাহায্য করে। উড-এর মতে "ধনতন্ত্রের চরিত্র পরিবর্তন, সুদূর অতীতে তার উৎস অনুসন্ধান করে বিভিন্ন মানবিক সম্ভাবনার প্রতিষ্ঠা, বিরোধী রীতিনীতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক মতাদর্শের সংঘাত ইত্যাদি বিষয়ে ই. পি. থম্পসনের (E. P. Thompson) মত মার্কসবাদী ইতিহাসবিদ্ বহু উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। কোনো কোনো মার্কসবাদী দার্শনিক সমাজতান্ত্রিক জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology),নীতিশাস্ত্রের (Ethics) ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু ধনতন্ত্রের রাজনৈতিক ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করা, তার অভ্যন্তরে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের পথ নিরূপণ করা, ধনতন্ত্রের শ্রেণীচরিত্র এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা এবং যে প্রাচীর তুলে এক আরও মানবিক ও গণতান্ত্রিক সামাজিক বিন্যাস ও তা সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলির পথে বাধার সঞ্চার করে—এ বিষয়ে সুসম্বদ্ধ অনুসন্ধানের কৃতিত্ব মিলিব্যান্ডের এককভাবে প্রাপ্য। মিলিব্যান্ড বিশ্বাস করতেন যে, সমাজতন্ত্র এমনই এক লক্ষ্য, যা একজীবনকালে অর্জন করা যায় না। মিলিব্যান্ড তাঁর শেষ গ্রন্থ 'সোশ্যালিজম ফর এ স্কেপটিকাল এজ' (Socialism for a sceptical Age)-এ বলেছেন, লক্ষ্য হিসেবে নয়—লক্ষ্যের জন্য এক সংগ্রাম হিসেবেই সমাজতন্ত্রকে দেখা বাঞ্ছনীয় এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর মনোভাব আদৌ নৈরাশ্যবাদী নয়, বরং তাঁর ধারণা দৃঢ়, যে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম অবশ্যই করা যায় এবং শেষে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়াও সম্ভব। সুতরাং, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর আপোসহীন সমলোচনা এবং গণতন্ত্র, সমতাবাদ ও সহযোগিতার মত সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নীতিগুলির ওপর তাঁর অবিচল সমর্থনের পটভূমিতেই মার্কসবাদী রাজনৈতিক তত্ত্বে তাঁর অবদানকে বিচার করা উচিত।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে মিলিব্যান্ডের অবস্থানকে সাধারণভাবে হাতিয়ারবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, যার উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর 'দি ষ্টেট ইন ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি' The State in Capitalist Society) (১৯৬৯) গ্রন্থে। মিলিব্যান্ডের বক্তব্যের মূল যুক্তিগুলি হল—

প্রথমত, পাশ্চাত্যের উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজগুলিতে রাষ্ট্র শাসক শ্রেণীর দ্বারা চালিত এক যন্ত্র। কারণ সরকার, সংসদ, আমলাতন্ত্র, পুলিশ, আইনব্যবস্থা, সেনাবাহিনী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি এই শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই নিয়ন্ত্রণ করেন। মিলিব্যান্ড এই শ্রেণীটিকে 'রাষ্ট্রীয় এলিট' (State Elite) নামে অভিহিত

করেছেন। এই 'রাষ্ট্রীয় এলিট'-রা হলেন মন্ত্রীসভার সদস্য, বিচারক, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ। মিলিব্যান্ডের মতে এই 'রাষ্ট্রীয় এলিট'-এর বেশীরভাগ সদস্যই আসেন উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত, অভিজাত ভূ-স্বামী ও উচ্চ বেতনভোগী শ্রেণী থেকে—এবং এভাবেই রাষ্ট্র পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থাভিমুখী ভূমিকা পালন করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে মিলিব্যান্ড দেখান যে ১৮৮৯-১৯৪৯-এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৬০ শতাংশেরও বেশী মন্ত্রীসভার সদস্যই ছিলেন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভুক্ত। পুঁজিপতি শ্রেণীকে সর্বদা প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে হয় না, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রই অধিকাংশক্ষেত্রে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কাজটা সম্পাদন করে। দ্বিতীয়ত, মিলিব্যান্ড অবশ্য স্বীকার করেন যে কখনও কখনও শ্রমিকশ্রেণী নিজের অনুকূল অবস্থান লাভ করতে সমর্থ হয়, যেমন—ব্রিটেনের মত কল্যাণকামী রাষ্ট্রে (Welfare State) হতে দেখা গেছে। কিন্তু বস্তুত তিনি দেখান যে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই বা পরতীকালে তারা শাসকশ্রেণীর এবং তার স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন, ফলস্বরূপ এমন এক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় যা ধনতন্ত্রের যন্ত্রে পরিণত হয়।

মিলিব্যান্ডের মতে, শাসক এলিটের শ্রেণী অবস্থান নির্ণয় করে যে শ্রেণী উৎস (Class Origin), সেটিই রাষ্ট্র ক্ষমতা বোঝার জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এমনকি সংসদে শ্রমিকশ্রেণীর কিছু প্রতিনিধি থাকলেও সংসদ ধনতন্ত্রের স্বার্থের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। নিকোস পুলানৎজাস মিলিব্যান্ডের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন, যার ফলস্বরূপ ১৯৭০-এর দশকে মিলিব্যান্ড-পুলানৎজাস বিতর্কের সূত্রপাত হয়।

৩.৪ নমুনা প্রশ্ন

দীর্ঘ প্রশ্নমালা ঃ

(১) মিলিব্যান্ডের রাষ্ট্র সম্পর্কিত হাতিয়ারবাদী ধারণাটি পর্যালোচনা করুন।

মধ্যম প্রশ্নমালা ঃ

(১) রাষ্ট্র সম্পর্কিত মিলিব্যান্ডের ধারণায় শ্রেণীর গুরুত্ব কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা ঃ

(১) হাতিয়ারবাদী ধারণার পক্ষে মিলিব্যান্ডের মূল যুক্তিটি কী?

(২) মিলিব্যান্ড কেন উদারনীতিবাদের বিরোধিতা করেছেন?

৩.৫ গ্রন্থসূচী

A. E. M. Wood : "The common Sense of Socialism", in *Radical Philosophy*, 2 April, 2004.

B. Martin Carnoy : *The State and Political Theory* (Princeton : Princeton University Press, 1984)

C. Robin Blackburn (ed) : *Ideology in Social Science. Readings in Critical Social Theory* (New York : Raudom House, 1973).

একক—৪ ❑ রাষ্ট্র সম্পর্কিত কাঠামোবাদী অভিমত ঃ নিকোস পুলানৎজাস (Structuralist view of state : Nicos Poulantzas)

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে পুলানৎজাস-এর অভিমত ও মিলিব্যান্ডের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক
৪.৪ নমুনা প্রশ্ন
৪.৫ গ্রন্থসূচী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটবে :

(ক) ভূমিকাতে রাষ্ট্র প্রসঙ্গে পুলনাৎজাস-এর বক্তব্যের সামগ্রিক পরিচিতি দেওয়া হবে।

(খ) পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রসঙ্গে পুলাৎজাস এবং মিলিব্যাঙ্কের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক।

৪.২ ভূমিকা

এই এককে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রসঙ্গে নিকোস পুলানৎজাস-এর অভিমত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নিকোস পুলানৎজাস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। মূলতঃ গ্রীসের অধিবাসী হলেও পরবর্তীকালে ফ্রান্সে বসবাসকারী নিকোস পুলানৎজাস আলথুসারের মত বিংশ শতকে কাঠামোবাদী মার্কসবাদের এক অন্যতম প্রতিনিধি। মূলতঃ পুলানৎজাস ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কিত আলোচনায় র‍্যালফ মিলিব্যান্ডের সঙ্গে বিতর্কের জন্যই পরিচিত। সাধারণভাবে পরিচিত এই মিলিব্যান্ড-পুলানৎজাস বিতর্ক হাতিয়ারবাদ (মিলিব্যান্ড) ও কাঠামোবাদের (পুলানৎজাস) এক অবস্থানগত সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে, মিলিব্যান্ড শ্রেণীকে গুরুত্ব দিয়েছেন, অন্যদিকে পুলানৎজাস-এর আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গঠনকারী সম্পর্কগুলি।

এই বিতর্কের পটভূমি হিসেবে বলা যায় মিলিব্যান্ডের 'দি স্টেট ইন ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটি' (The State in Capitalist Society) (১৯৬৯) গ্রন্থটি সম্পর্কিত পুলানৎজাস-এর সমালোচনা। এটি ১৯৬৯ সালে একটি বিশিষ্ট ব্রিটিশ জার্নাল 'নিউ লেফট্ রিভিউ'-এর (New Left Review) ৫৮ তম সংখ্যায় 'দি প্রবলেম অফ্ দি ক্যাপিটালিস্ট স্টেট' (The Problem of the Capitalist State) শীর্ষনামে প্রকাশিত হয়। মিলিব্যান্ড এই সমালোচনার উত্তর দেন ১৯৭০ সালে এই পত্রিকারই ৫৯ তম সংখ্যায়, যা 'দি ক্যাপিটালিস্ট স্টেট—রিপ্লাই টু নিকোস পুলানৎজাস' (The Capitalist State—Reply to Nicos Poulantzas) শীর্ষনামে প্রকাশিত হয়। বিতর্কের মূল বিষয়গুলি এই রচনাগুলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও মিলিব্যান্ড পুলানৎজাস সম্পর্কে তাঁর অবস্থান আরও বিশদ্ভাবে প্রকাশ করেন ১৯৭৩ সালে 'নিউ লেফট্ রিভিউ'-এর (New Left Review) ৮২তম সংখ্যায় 'পুলানৎজাস অ্যান্ড দি ক্যাপিটালিস্ট স্টেট' (Poulantzas and the Capitalist State) শীর্ষক নিবন্ধে। ইতিমধ্যে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত

পুলানৎজাসের 'পলিটিক্যাল পাওয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল ক্লাসেস' (Political Power and Social Classes) শীর্ষক গ্রন্থটি ১৯৭৩ সালে ইংরেজিতে অনুদিত হয় এবং ১৯৭৬ সালে 'নিউ লেফট্ রিভিউ'-এর (New Left Review) ৯৫ তম সংখ্যায় পুলানৎজাস 'দি ক্যাপিটালিস্ট স্টেট ঃ আ রিপ্লাই টু মিলিব্যান্ড এ্যান্ড ল্যাকলাউ' (The Capitalist State : A Reply to Miliband and Laclau) শীর্ষক আরও এক নিবন্ধ লেখেন এবং তাঁর অবস্থানকে আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন।

পদ্ধতিগতভাবে বিচার কবলে পুলানৎজাসকে সাধারণভাবে কাঠামোবাদী হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশিষ্ট ফরাসী মার্কসবাদী তাত্ত্বিক, মার্কসবাদের কাঠমোবাদী গোষ্ঠীর পুরোধা লুই আলথুসারের দ্বারা পুলানৎজাস প্রভাবিত হয়েছিলেন। সনাতনী মার্কসবাদীদের যুক্তি পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্র একটি যন্ত্রমাত্র-এর পরিবর্তে আলথুসারের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করে পুলানৎজাস—ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এক স্বশাসিত ক্ষেত্রের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে—এই ধারণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে প্রতিষ্ঠানগুলির এক জটিল কাঠামো এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যকলাপ নিছকই অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণকরী শ্রেণী থেকে উদ্ভূত—এরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং, পুলানৎজাস কাঠামো গঠন করে যে সম্পর্কগুলি, সেগুলিকে পৃথকভাবে পর্যালোচনা/গণ্য করার পক্ষপাতী। এই প্রেক্ষিতেই পুলানৎজাস মিলিব্যান্ডের অভিমতের সমালোচনা করেন এবং নিজের অবস্থানকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে পুলানৎজাসের অবস্থান এবং মিলিব্যান্ডের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরের অংশে দেওয়া হল।

৪.৩ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে পুলানৎজাসের অভিমত ও মিলিব্যান্ডের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক

পুলানৎজাসের মূল বক্তব্যকে কাঠামোগত নির্ধারণবাদের এক অনুশীলন বলা যেতে পারে। বিষয়টিকে সহজভাবে বলতে গেলে, রাষ্ট্রযন্ত্র পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিনিধিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলেই রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থ রক্ষা করে না। বরং ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানিক কর্মপদ্ধতি এমনভাবে সংগঠিত যে ধনতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষা করা শাসকদের জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, শাসক শ্রেণীর উৎস, ব্যক্তি, বস্তু (Subjectivist) ধনতান্ত্রিক কার্যকলাপের পরিবর্তে কাঠামোর স্বাতন্ত্রতাই পুলানৎজাসের কাছে বিচার্য। এই বিষয়টাই স্মরণ করিয়ে দেয় আলথুসারের কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যাকে; আরও নির্দিষ্টভাবে বললে মার্কসবাদের কাঠামোবাদী ধারণা যেখানে কাঠামোবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে একধনের 'তাত্ত্বিক মানবতাবাদবিরোধী' আখ্যা দেওয়া হয়েছে সেখানেই মিলিব্যান্ডের সঙ্গে পুলানৎজাসের বৈসাদৃশ্য স্পষ্ট। মিলিব্যান্ডের বিপরীতে পুলানৎজাস বলেন যে, অতি সাধারণ মানুষের পক্ষেও রাষ্ট্রের এলিট পদে আসীন হওয়া সম্ভব—কিন্তু এর ফলে কোনও কিছুরই পরিবর্তন হবে না। কারণ—রাষ্ট্র ধনতন্ত্রের স্বার্থই রক্ষা করে যাবে। যেমন—কোনো বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় এলেও বাম নীতিগুলি সহজে প্রয়োগ করতে পারবে না। কারণ—আমলাতন্ত্র, পুলিশ, সেনাবাহিনী তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার্থে তাদের বিরোধী যে কোনো নীতি

রূপায়িত হতে বাধা দেবে। সুতরাং, যদি পুঁজিপতি শ্রেণী মনে করে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, তখন তারা অন্যত্র পুঁজি বিনিয়োগ করবে। ফলস্বরূপ, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া শ্লথ হয়ে পড়বে, বেকারত্বের সৃষ্টি হবে, তার সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে দারিদ্র। ফলতঃ রাষ্ট্র এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেই না যার ফলে পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ ও সংবেদনশীলতায় আঘাত লাগে।

আবার রাষ্ট্রের কার্যকলাপ রাষ্ট্রের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র মানে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র। অর্থাৎ, রাষ্ট্রের একটি অংশের কাজকে অন্য কোনো অংশ বাধা দিতে পারে। যেমন, কোনো বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের নীতি অনুসারে সংস্কারের কর্মসূচী নিলে সেনাবহিনী বা সেনাবাহিনীর কোন অংশ সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে। চিলিতে ১৯৭৩ সালে অনুরূপ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়, যেখানে CIA-এর সহযোগিতায় গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সালভাদর আলেন্দে (Salvador Allende) সরকারের পতন ঘটানো হয়।

পুলানৎজাসের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর স্বতন্ত্রতা সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় দুটি বিষয় জড়িত।

প্রথমত, মিলিব্যাণ্ডের বিপরীতে তিনি দেখান যে রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবে কোনো সমজাতীয় (homogenous) পুঁজিপতি শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। পুলানৎজাসের মতে পুঁজিপতি শ্রেণী এখন বহু ক্ষমতার গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ফলস্বরূপ, রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে সামগ্রিক পুঁজিপতি শ্রেণীর পরিবর্তে এর বিভিন্ন অংশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দ্বিতীয়ত, এর ফলে রাষ্ট্র কোনভাবেই অস্থিতিশীল বা দুর্বল হয়ে পড়ে না। কারণ—সমাজে শ্রেণীসংঘাতের যুক্তি ও তার সঙ্গে ধনতন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থ রাষ্ট্রের জটিল কাঠামোর মাধ্যমেই নির্ণীত হয়, যা রাষ্ট্রকে নৈর্ব্যক্তিকভাবে ধনতন্ত্রের স্বার্থ, ভারসাম্য ও স্থিরতা বজায় রাখতে বাধ্য করে।

মিলিব্যান্ড অবশ্য পুলানৎজাসের এই কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণবাদকে স্বীকার করেন নি। এক্ষেত্রে তিনি মূলতঃ দুটি দিক থেকে তাঁর সমালোচনা করেন—প্রথমত, রাষ্ট্র সর্বদাই শাসকশ্রেণীর স্বার্থে কাজ করবে—এটি যথার্থ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—যদি বামপন্থী সরকার ক্ষমতায় আসে, তখনও কি রাষ্ট্র পরিস্থিতির কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে যাবে? দ্বিতীয়ত, পুলানৎজাসের মতে সংসদীয় গণতন্ত্রের অভ্যন্তরে কোন বিকল্প সরকার গঠনের সংগ্রাম অর্থহীন। মিলিব্যাণ্ডের মতে, যাঁরা বিশ্বাস করেন ফ্যাসিবাদ ও উদারপন্থী গণতন্ত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই পুলানৎজাসের যুক্তি তাদের অভিমতকে বৈধতা প্রদান করে। পুলানৎজসের মতে কোন প্রগতিশীল/প্রগতিবাদী সরকারের বৃহত্তর সংস্কারমূলক কর্মসূচীও বিফল হতে বাধ্য, কারণ ধনতন্ত্রের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা অবশেষে তাকে গ্রাস করে ফেলবে।

আর্নেস্টো লাকলাউ ও বব জেসপের মত তাত্ত্বিক পুলানৎজাসের রাষ্ট্রকে মানুষ, শ্রেণী—এই বিষয়গুলি থেকে পৃথক করে দেখার সমালোচনা করেছেন, কারণ—ধনতন্ত্রকে বোঝার ক্ষেত্রে এগুলি মূল উপাদান। মিলিব্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পুলানৎজাসের সমালোচনা নিয়ন্ত্রণবাদের বিরুদ্ধে হলেও অন্যদিকে পুলানৎজাসের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ এই যে তিনি বিমূর্ত কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণবাদকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন।

আজকের এই বিশ্বায়নের যুগে, যখন আন্তর্জাতিক অর্থভান্ডার ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মত রাষ্ট্রের বাইরের সংস্থাগুলি রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, এই বিতর্ক মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। যেহেতু এই ধরনের সংস্থাগুলিই তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের নীতি নির্ধারণ করে ও তাদের সামনে সেইসব দেশের সরকার প্রায়শই অসহায় বোধ করে, সেহেতু পুলানৎজাসের সাবধানবাণী অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। আবার ঠিক এই কারণেই সংস্কারের জন্য সংগ্রাম, আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে মতাদর্শগত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে এমন সরকার নির্বাচনের গুরুত্ব, মিলিব্যান্ডের অবস্থানের প্রাসঙ্গিকতাকে কোনভাবেই হ্রাস করে না।

প্রাথমিক এই বিতর্কের পরে অবশ্য মিলিব্যান্ড ও পুলানৎজাস উভয়ই তাঁদের লেখায় কিছুটা পরিবর্তন আনেন। যেমন, মিলিব্যান্ড স্বীকার করেন যে, হাতিয়ারবাদী ব্যাখ্যা রাষ্ট্র সম্পর্কিত আরও কতগুলি জটিল বিষয়, যেমন,শাসকশ্রেণী ব্যাতিরেকে রাষ্ট্রের স্বতন্ত্রতা, অর্থনৈতিকভাবে আধিপত্যকারী শ্রেণীর চাপ, উৎপাদনের নির্দিষ্ট উপায় দ্বারা সৃষ্ট কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মত বাস্তবিক বিষয়গুলিকে উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয় নি। পুলানৎজাসও তাঁর শেষ লেখায় রাষ্ট্রকে একটি স্থবির কাঠামো, এক বিমূর্ত প্রতীক হিসেবে না দেখে রাষ্ট্রকে তিনি দেখেছেন শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবে, যেখানে কোনো প্রতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা নেই এবং রাষ্ট্রকে তিনি শ্রেণীসংগ্রামের বিভিন্ন প্রেক্ষিত থেকে দেখার কথা বলেছেন।

মিলিব্যান্ড-পুলানৎজাসের এই বিতর্কের সূত্রপাত হয় ১৯৭০ সালে। আধুনিক ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী পর্যালোচনার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে আরও দুজন তাত্ত্বিক এই বিতর্কের মধ্য থেকে উঠে আসা কতকগুলি বিষয় নিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করেছেন। ফ্রেড ব্লক (Fred Block) মিলিব্যান্ডের অবস্থান থেকে দেখিয়েছেন, পুঁজিপতি শ্রেণী কখনও কখনও সংস্কারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করলেও কখনই তাদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে কোনো কিছু করে না। রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে ধনতন্ত্রেরই স্বার্থ রক্ষা করে। একইভাবে বব জেসপ (Bob Jessop) পুলানৎজাস-এর শেষের দিকে লেখার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখিয়েছেন—রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে একটি শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্র, যেখানে মানুষের মধ্যে পূর্বদত্ত কোনো একতা নেই। জেসপের মতে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে শ্রেণীসম্পর্কের বিভিন্ন দিক থেকে দেখা উচিত, যার ক্রিয়াকলাপের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞায়িত রূপ নেই।

পরিশেষে বলা যায়, এই অভিমত কখনই গ্রহণযোগ্য নয় যে, রাষ্ট্র শুধুমাত্র শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রূপায়নের হাতিয়ার। রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি তার চেয়ে অনেক বেশি উৎকর্ষতা দাবি করে। মার্কস নিজেও তাঁর পূর্ববর্তী ধারণার বেশ কিছু পরিবর্তন করেন এবং 'আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্যবাদ'-এর মত ধারণার সূচনা করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিতর্কগুলি তারই প্রাসঙ্গিকতার স্বাক্ষর বহন করে।

৪.৪ নমুনা প্রশ্ন

দীর্ঘ প্রশ্নমালা ঃ

(১) মিলিব্যান্ড-পুলানৎজাস বিতর্ক সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

মধ্যম প্রশ্নমালা ঃ

(১) পুলানৎজাসের কাঠামোবাদ সম্পর্কে মিলিব্যান্ডের সমালোচনাগুলি কী কী?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা ঃ

(১) 'কাঠামোগত নিয়ন্ত্রণবাদ' বলতে কী বোঝায়?

(২) পুলানৎজাসের পরবর্তী লেখাগুলিতে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল?

৪.৫ গ্রন্থসূচী

A. Martin Carnoy : *The State and Political Theory* (Princeton : Princeton University Press, 1984)

B. Robin Blackburn (ed) : *Ideology in Social Science. Readings in Social Theory* (New York : Random House, 1973)

C. Colin Hay, Michael Lister, David Marsh (eds) : *The State : Theories and Issues* (Hampshire : *Palgrave Macmillan*, 2006)

D. Bob Jessop : *Nicos Poulantzas. Marxist Theory and Political Strategy* (Basingstoke and New York : Palgrave Macmillan, 1985)

একক—১ ❑ উত্তরআধুনিকতাবাদ (Postmodernism)

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ ভূমিকা

১.৩ উত্তরাধুনিকতাবাদের উত্থান

১.৪ লিওতার্ড-হাবেরমাস বিতর্ক

১.৫ উত্তরাধুনিকতাবাদ এবং মার্কসবাদ বিতর্ক

১.৬ নমুনা প্রশ্ন

১.৭ গ্রন্থসূচী

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে জানা যাবে :

(ক) ভূমিকাতে উত্তরআধুনিকতাবাদের একটি সামগ্রিক রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

(খ) উত্তরআধুনিকতাবাদের উত্থান ব্যাখা করা হয়েছে।

(গ) লিওনার্দ-বেরমাস বিতর্ক, যা উত্তরআধুনিকতাবাদের আলোচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(ঘ) অপর একটি বিতর্ক, উত্তরআধুনিকতাবাদ ও মার্কসবাদ, সেটি বিশ্লেশিত হয়েছে।

১.২ ভূমিকা

এই এককে যা আলোচিত হবে তা হল উত্তরাধুনিকতাবাদের মূল বক্তব্যসমূহ এবং দেখতে চেষ্টা করা হবে কীভাবে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বিষয়টির জন্ম হয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে আলোচনায় আসবে যে কীভাবে অষ্টাদশ শতকেই আলোকায়নের প্রভাবে তৈরী হয়েছিল অসন্তোষ, যা পরবর্তীকালে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও র‍্যাডিকাল প্রতিক্রিয়ার রূপ ধারণ করে এবং যা বহুলাংশে উত্তরাধুনিকতাবাদের প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছিল। আলোচনার একটি স্পষ্ট ধারাবাহিকতা রাখতে প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হবে আধুনিকতাবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি এবং তারপর বিশ্লেষণ করা হবে কীভাবে আধুনিকতাবাদের বিবিধ ধারণা, যেমন বিশ্বজনীনতা (universality), যুক্তি (reason) প্রগতি (progress), সামূহিকতা (totality)-র বিরুদ্ধে একধরনের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং ক্রমশই এই ধারণাগুলিকে বর্জন করবার আহ্বান জোরালো হয়েছে। একই সঙ্গে আহ্বান এসেছে যাবতীয় 'মহা আখ্যান'

(grand narrative)-কে প্রত্যাখান করার। আর এই প্রেক্ষিতেই জন্ম হয়েছে উত্তরাধুনিকতাবাদের, যা 'খন্ডকরণ' (fragmentation), বিনির্মাণ (deconstruction) আবদ্ধকরণের অনুপস্থিতি (absence of closure), বিশেষ অস্মিতা (microidentitics) এবং স্থানিকতা (localism)-র পক্ষে সওয়াল। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে ১৯৮০-র দশকে যে উত্তরাধুনিকতাবাদের বিকাশ তার দার্শনিক ভিত্তিটিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছিলেন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ফ্রেডেরিক নীৎসে (Friedrich Nietzsche)। তাই উত্তরাধুনিকতাবাদী চেতনায় নীৎসের ভূমিকাকে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনার পর বিশ্লেষণ করা হবে কীভাবে উত্তরাধুনিকতাবাদ সনাতনী উদারবাদ এবং মার্কসবাদের মত মহাআখ্যানগুলিকে আধুনিকতাবাদের অঙ্গ হিসেবে খারিজ করতে আহ্বান জানায়। আর এই সমগ্র প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখেই আলোচিত হবে হারেরমাস-লিওতার্ড বিতর্ক যেখানে হাবেরমাস লিওতার্ডের রক্ষণশীল উত্তরাধুনিকতাবাদী অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং আলোকায়নের ধারনাগুলির সপক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে বলেন যে 'আলোকায়ন' আসলে একটি 'অসমাপ্ত প্রকল্প' (unfinished project)। আলোচনার শেষে আমরা দেখতে চেষ্টা করব মার্কসবাদ ও উত্তরাধুনিকতাবাদের মধ্যে তৈরী হওয়া বিতর্কটি।

উত্তরাধুনিকতাবাদ হল সেই অত্যন্ত র‍্যাডিকাল একটি তাত্ত্বিক অবস্থান যা সমাজবিজ্ঞানের ধারায় বিংশ শতকের শেষ দিকে বিকশিত হয়। এই তাত্ত্বিক অবস্থানটি বিজ্ঞান, যুক্তি ও প্রগতির পশ্চিমী আঙ্গিক আশ্রিত আধুনিকতাবাদের একটি তীব্র সমালোচনা তুলে ধরে। শুধু তাই নয়, পূর্বোক্ত বিষয়গুলিকে ভিত্তি করে ইউরোপীয় আধুনিকতা যেভাবে নিজেকে বিশ্বজনীনভাবে অনুসরণীয় বলে দাবী করে—তাকেও নস্যাৎ করে দেয় উত্তরাধুনিকতাবাদ। উত্তরাধুনিকতাবাদ আসলে নঞর্থক আধুনিকতাবাদী দাবীগুলিকে প্রতিস্থাপিত করতে চায় সম্পূর্ণ নতুনতর একটি দৃষ্টিকোণ থেকে। তবে তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, উত্তরাধুনিকতাবাদ প্রাক্-আধুনিক রক্ষণশীলতায় প্রত্যাবর্তন করতে চায়। বরং উত্তরাধুনিকতাবাদ আলোকায়নপর্বে বৈধতা পাওয়া ইউরোপীয় আধুনিকতার দাবীকে চ্যালেঞ্জে করতে চায়। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন যে, ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদ এক ধরনের আশাবাদ ও সক্ষমতার ধারনা উপস্থাপিত করেছিল যার ভিত্তি ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিপ্লব এবং যার প্রবাহ অব্যাহত ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতেও, মূলতঃ শিল্পবিপ্লবের প্রেক্ষিতে। আধুনিকতাবাদ দাবী করে যে ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে একটি অপ্রকাশিত অথচ অনিবার্য প্রগতির ধারা যা বিশ্বজনীন, যুক্তি ও অভিজ্ঞতাবাদের (empiricism) আলোকে যাকে সনাক্ত করা সম্ভব। শুধু তাই নয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপরই দাড়িয়ে আছে প্রকৃতি ও সমাজের যাবতীয় বিষয়গুলি। তাই এই বিশ্বসমাজে এমন কিছু নেই যা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের বাইরে। বৈজ্ঞানিক যুক্তির এই সর্বত্রচারী সামূহিকতাবাদী দাবী সব বিষয়গুলিকেই তাই কতকগুলি কাঠামো (framework) বা খাঁচার মধ্যে বন্দী করে দিতে চায় আর এই খাঁচাকেই উত্তরাধুনিকতাবাদীরা বলেন মহাআখ্যান (grand narrative/meta narrative)। এই খাঁচার আবদ্ধতাকেই উত্তরাধুনিকতাবাদ তীব্রভাবে চ্যালেঞ্জ করে। উত্তরাধুনিকতাবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে বিশ্বজনীনতার দাবীকে সামনে রেখে আধুনিকতাবাদ আসলে একধরনের

বাজারভিত্তিক সমাজকে বৈধতা দিতে চায়—যে সমাজ দাড়িয়ে আছে উদারবাদী ধ্যানধারণার উপর। তারা যে মূল অভিযোগটিকে আধুনিকতাবাদের বিরুদ্ধে শানিত করে তোলেন তা হল আধুনিকতাবাদের দাবীগুলির তথাকথিত বিশ্বজনীনতা প্রমাণের প্রয়াস আসলে পশ্চিমকে বিশ্বজনীনভাবে অনুসরণীয় করে তোলার অভিপ্রায়ভিত্তিক—এই অভিপ্রায় আসলে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয় আধিপত্য কায়েমের। অন্য ভাবে বলতে গেলে ইউরোপীয় আধুনিকতার ধারনা ইউরোপীয় আধিপত্যের দাবীকে এমনভাবেই বৈধতা দেয়, এমনভাবে তাকে সংশাপত্র দিতে সম্মত হয় যাতে বিষয়টির বিপরীতে থাকা যাবতীয় অসম্মতি, পার্থক্য এমনকি সমালোচনাও মুছে যায়। আর এই বিশেষ অভিপ্রায়কে সফল করতে পশ্চিমকে বিশ্বায়িত করতে চায় আধুনিকতাবাদ, কারণ আধুনিকতাবাদী ধারণাগুলির বিশ্বজনীনতাই পূর্বোক্ত বিষয়গুলির সাফল্যের প্রাক্‌শর্ত। পশ্চিমী আধুনিকতাবাদী ধারণাগুলির তর্কাতীত সর্বজনীনতা স্বাধীনতা, স্বনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নকে যেমন অনেক ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হিসেবে উপেক্ষা করে, তেমনই তা যাবতীয় বহুত্ববাদ ও সমালোচনার সম্ভাবনাকেও মুছে দিতে চেষ্টা করে। ফলত, আধুনিকতাবাদ হয়ে ওঠে দমন (domination) নিয়ন্ত্রণ (control) এবং অবদমন (repression)-এর প্রতীক।

আধুনিকতাবাদের এই জাতীয় প্রবণতাগুলির প্রায় বিপরীত অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় উত্তরাধুনিকতাবাদ। উত্তরাধুনিকতাবাদ খারিজ করে যাবতীয় মহাআখ্যান (meta-narrative), যে কোনও ধরনের সারসত্তাবাদ (essentialism) এবং যাবতীয় সামূহিকতাবাদী দাবীগুলিকে। এর বিপরীতে এই দৃষ্টিভঙ্গীটি যা স্থাপন করতে চায় তা হল চরম সাপেক্ষতাবাদ' (absolute relativim) শুধু তাই নয়, যেহেতু উত্তরাধুনিকতাবাদ যে কোনও সার্বজনীন ও সারসত্তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্মাণের পক্ষপাতী নয় তাই এই দৃষ্টিভঙ্গী শব্দের বহু ও বিবিধ অর্থ-সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেয়। এভাবেই উত্তরাধুনিকতাবাদ শব্দের গৃহীত অর্থ যা ভাবের গন্ডীকে অতিক্রম করে। অর্থাৎ, শব্দের মধ্যে নিহিত থাকা অর্থসম্ভাবনাগুলিকে উত্তরাধুনিকতাবাদ প্রদত্ত বা স্বীকৃত অর্থের ভিতর থেকে বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় খুঁজে নিতে চায়।

১.৩ উত্তরাধুনিকতাবাদের উত্থান

একটি প্রভাবশালী তত্ত্ব হিসেবে ১৯৮০-র দশকে উত্তরাধুনিকতাবাদের উত্থানের পিছনে বেশ কিছু সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ঘটনাপ্রবাহ ও কারণ ছিল যেমন—

(ক) পশ্চিমী উদারবাদী গণতন্ত্র প্রগতি এবং স্থিতিশীলতার যে আদর্শকে তুলে ধরেছিল বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রতিফলন প্রায় দেখাই যায়নি। বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে পুজিবাদের কার্যকলাপ মোটেও খুব আশাব্যঞ্জক হয়নি। উদারবাদী গণতন্ত্র যে কেবল সংকট মোকাবিলাতেই অসমর্থ প্রতিপন্ন হয়েছিল তাই নয়, একই সঙ্গে এটি অনেকক্ষেত্রেই যুদ্ধ, দমনপীড়ন এবং নিয়ন্ত্রণের ইন্ধন যুগিয়েছিল বলে

অভিযোগ। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিল ষাটের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধ। এই ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমী প্রগতি ও যুক্তি বিষয়ক দাবীগুলি সম্পর্কে এক ধরনের সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে।

(খ) অন্যদিকে ১৯৯০ সালে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতন ঘটে এবং এক্ষেত্রে পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশেষত স্তালিনবাদী সমাজতন্ত্রের রূপ বিশ্বব্যাপী বামপন্থী আন্দোলনগুলির আশাআকাঙ্ক্ষাকে ভীষণভাবে আঘাত করে।

ফলতঃ দুই শিবিরেরই এমন পরিস্থিতি অনেকের মনে পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদের বিশ্বজনীনতার দাবী প্রসঙ্গে সন্দেহের উদ্রেক করে। সন্দেহের উদ্রেক হয় যে কোনও ধরনের মতাদর্শ এবং ভাবাদর্শগত বৃহৎ কাঠামো (macro framework) আশ্রিত তত্ত্বের প্রতিও। আর পূর্বোক্ত এই বিষয়গুলির প্রেক্ষিতেই উত্তর-আধুনিকতাবাদ বিশেষ অস্মিতা বা 'micro-identity'-র পক্ষে সমর্থন জানায়। দার্শনিক দিক থেকে বলা যেতে পারে নাস্তিবাদী (nihilist) বিতর্কিত জার্মান দার্শনিক ফ্রেডেরিক নীৎসের কথা, যিনি উত্তরাধুনিকতাবাদী চেতনা বিকাশে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। নীৎসে হলেন সেই ব্যক্তি যিনি পাশ্চাত্ত্য ভাবনাচিন্তার ভিত্তিগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, প্রশ্ন তুলেছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞানব্যবস্থার সর্বজনীনতার দাবীর বৈধতা নিয়ে এবং চরম সাপেক্ষতাবাদের (absolute relativism) পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন। অর্থাৎ, পাশ্চাত্য জ্ঞানব্যবস্থার প্রতি সদর্থক সমর্থনের পরিবর্তে নীৎসে বিষয়টির একটি র‍্যাডিকাল নেতি'র (negation) আহ্বান জানান।

মনে রাখতে হবে যে, এই সব বিষয়গুলির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় উত্তরাধুনিকতাবাদ অনেকক্ষেত্রেই নিজের মধ্যে একধরনের নাস্তিবাদ (nihilism) এবং নৈরাজ্যবাদী প্রবণতাকে ধারণ করে থাকে। আর সেই অবস্থান থেকেই বিশ্বজনীনতার দাবী এবং সারসত্তাবাদকে চ্যালেঞ্জ করে উত্তরাধুনিকতাবাদ। শুধু তাই নয় উত্তরাধুনিকতাবাদ চ্যালেঞ্জ করে পশ্চিমী মানবতাবাদ সংক্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসগুলিকেও, কারণ এই অবস্থানে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে আধুনিকতাবাদআশ্রিত পশ্চিমী মানবতাবাদের ধারণা আসলে এক ধরনের দমনপীড়ন ও নিয়ন্ত্রণেরই হাতিয়ার যাকে পশ্চিম বিশ্বজনীনতার দোহাই দিয়ে ব্যবহার করে।

১.৪ লিওতার্ড-হাবেরমাস বিতর্ক

১৯৮০-র দশকে বিশিষ্ট ফরাসী দার্শনিক ফ্রাসোঁয়া লিওতার্ড (Francois Lyotard) তাঁর 'The Postmodern Condition'-এ উত্তরাধুনিতাবাদী দর্শনকে একটি ব্যবস্থিত রূপে তুলে ধরেন। তবে ইতিমধ্যেই যে উত্তরাধুনিকতাবাদ একটি শক্তিশালী দর্শন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার প্রমাণ আমরা পাই বিশিষ্ট ফরাসী দার্শনিক মিশেল ফুকো (Michel Foucault) এবং জাঁক দেরিদা (Jacques Derrida)-র লেখাপত্রে।

ফুকো দেখান যে এই সমাজের সর্বত্র ক্ষমতার জাল বিস্তৃত এবং ক্ষমতার কোনও নির্দিষ্ট অধিষ্ঠান

ক্ষেত্র নেই। ফলতঃ ক্ষমতাকে কেবল একটি বিশেষ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক স্তরে চিহ্নিত করা যায় না। অন্যদিকে দেরিদা তাঁর বিনির্মাণ (deconstruction) -এর ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখান যে, যে কোনও 'শব্দ', 'ধারণা' এবং 'অনুশীলন'-এর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলি অর্থ সম্ভাবনা। ফলতঃ সেগুলিকে 'স্থির', 'বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত' অর্থইঙ্গিতে বেধে ফেলা যায়না। উত্তরাধুনিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর এই যাবতীয় দাবীগুলিকে অবশ্য মেনে নেননি বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিক য়ুর্গেন হাবেরমাস (Juergen Habermas)—যিনি লিওতার্ড প্রদর্শিত যুক্তিগুলির বিরুদ্ধাচরণ করেন এবং বলা বাহুল্য যে অবিলম্বেই হাবেরমাসের উদ্ধৃত যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি সাজান লিওতার্ড এবং আবার তিনি উত্তরাধুনিকতাবাদী অবস্থানটির পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। আর এভাবেই দানা বেঁধে ওঠে লিওতার্ড-হাবেরমাস বিতর্ক। প্রসঙ্গক্রমে এটি বলা প্রয়োজন হাবেরমাস-ও একথা স্বীকার করে নেন যে, ইউরোপীয় আধুনিকতার যাবতীয় দাবীদাওয়াগুলিকে নিঃসংশয়চিত্তে গ্রহণ করা হলে সমস্যা হবে, তবুও আধুনিকতার যাবতীয় ভিত্তিকে তিনি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। হাবেরমাস মনে করেন যে, আলোকায়নজাত আধুনিকতা আসলে একটি 'অসমাপ্ত প্রকল্প' (an unfinished project)।

ফলতঃ আমরা দেখতে পাই যে, হাবেরমাস আধুনিকতাবাদের সেই প্রবণতাটিকে সমালোচনা করেন যা বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতার দোহাই দিয়ে ব্যক্তির ভাবনাচিন্তার (এমনকি কলা ও বৈজ্ঞানিক চর্চার) স্বাধীনতা ও স্বনিয়ন্ত্রণকে কেড়ে নেয়। কিন্তু হাবেরমাস একই সঙ্গে একথাও মেনে নেননি যে 'আধুনিকতা' স্বয়ং-ই এক নঞর্থক ধারণা। হাবেরমাস প্রদর্শিত যুক্তিগুলিকে এক্ষেত্রে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যায়—

(ক) হাবেরমাস মনে করেন, উত্তরাধুনিকতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যখন আধুনিকতাবাদকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করার কথা বলা হয় তখন আসলে প্রাক্-আধুনিকতা (pre-modern) এবং আধুনিকতার (modern) মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে তাকে অবহেলা করা হয়। আমরা এক্ষেত্রে প্রাক্-আধুনিকতাকে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আধুনিকতার যে বিশিষ্ট ভূমিকা আছে তা ভুলে যাই, যদিও এই ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা প্রাক্-আধুনিকতাবাদী রক্ষণশীলতা ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিল।

(খ) উত্তরাধুনিকতাবাদ আলোকায়নজাত আধুনিকতার মধ্যে থাকা সম্ভাবনা (promise) এবং অনুশীলন (practice), সক্ষমতা (potentialities) এবং বাস্তবতা (actuality)-র মধ্যে যে পার্থক্য তার স্বরূপ অনুধাবনে ব্যর্থ। হাবেরমাসের মতে যদিও আলোকায়ন বেশ কিছু সমস্যার জন্ম দেয় তথাপি আধুনিকতার ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। আসলে সমস্যা হয়েছে যেমনভাবে আধুনিকতাকে দেখা বা বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তাকে নিয়ে। আর এইসব বিষয়ের প্রেক্ষিতেই হাবেরমাস আলোকায়নকে দেখেন একটি 'অসমাপ্ত প্রকল্প' (unfinished project) হিসাবে। আলোকায়নের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগগুলির ভিত্তিতে আধুনিকতাকে বিসর্জন দেওয়ার অর্থ হবে আসলে 'স্নানের জলের সঙ্গে শিশুটিকেও নিক্ষেপ করার' সামিল।

(গ) তাছাড়া অবিবেচকভাবে আলোকায়নকে বিসর্জন দেওয়ার ফলশ্রুতি হতে পারে হতাশা, স্বপ্নভঙ্গ, নাস্তিবাদ এমনকি রাজনৈতিক রক্ষণশীলতায় প্রত্যাবর্তন—যা শেষ পর্যন্ত পরোক্ষভাবে বিজ্ঞান এবং প্রগতির পথ রুদ্ধ করতে পারে।

১.৫ উত্তরাধুনিকতাবাদ ও মার্কসবাদ বিতর্ক

উত্তরাধুনিকতাবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক রয়েছে, এক্ষেত্রে উত্তরাধুনিকতাবাদ মার্কসবাদের বিরুদ্ধে যে মূল অভিযোগটি তুলে ধরে তা হল মার্কসবাদও আধুনিকতাবাদেরই একটি অঙ্গ, কারণ সেটিও ইতিহাসের 'মহাআখ্যান' (grand narrative)-কে সমর্থন করে। মার্কসবাদের আস্থা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-এ (historical materialism), যে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাসের পর্যায়ক্রমিক বিকাশকে যুক্তি, বিজ্ঞান এবং প্রগতির সর্বজনীন ধারণাগুলি দিয়েই বিশ্লেষণ করে। একই সঙ্গে উত্তরাধুনিকতাবাদ মার্কসবাদ অনুসৃত সারসত্তাবাদী বর্গ (essentialist categories) যেমন শ্রেণীসংগ্রাম, ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং উন্নয়নের ধারাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে। তবে মার্কসবাদও উত্তরাধুনিকতাবাদী সমালোচনাগুলিকে নস্যাৎ করে দেয় এই বলে যে, মার্কসবাদ অবশ্যই আলোকায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একই সঙ্গে একথাও ঠিক যে আধুনিকতাবাদকে সম্পূর্ণরূপে বর্জনের কথা বলে না মার্কসবাদ, বরং আধুনিকতার পশ্চিমী ধারণার একটি বৈপ্লবিক পুনর্গঠনের পক্ষে সওয়াল করে। উত্তরাধুনিকতাবাদের তরফ থেকে তোলা অভিযোগুলির বিরুদ্ধে মার্কসাদের নিম্নোক্ত প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা যায়।

(ক) মার্কসবাদ মনে করে যে বিশ্বস্তরে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত করতে গেলে শ্রেণী সংগ্রামের ধারণাকে গুরুত্ব দিতেই হয়। একথা অনস্বীকার্য যে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্তরে বিশেষ সংগ্রামগুলির অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু একইসঙ্গে মার্কসবাদীদের মতে, বিশ্বস্তরীয় বৃহৎ প্রেক্ষিতে শ্রেণী সংগ্রাম (যা সংঘটিত হয় বিপ্লবী ও প্রতি বিপ্লবী শক্তির মধ্যে) যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বা পরিবর্তন আনতে পারে তা আঞ্চলিক সংগ্রামগুলির পক্ষে আনা সম্ভব নয়।

(খ) মার্কসবাদ উত্তরাধুনিকতাবাদের নাস্তিবাদী অবস্থানকে সমর্থন করে না কারণ তা শেষ পর্যন্ত একধরনের নেতিবাচক দর্শনের জন্ম দেয় বলে মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করেন। এর বিপরীতে মার্কসবাদ পুঁজিবাদের একধরনের 'সদর্থক পরিবর্তনে' (positive alternative) আস্থাশীল, অর্থাৎ, সমাজতন্ত্র-কে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আর এই বিশ্বাস থেকেই মার্কসবাদ মতাদর্শে আস্থাহীন, উত্তরাধুনিকতাবাদী অবস্থানটিকে মেনে নিতে পারে না।

(গ) মার্কসবাদ বিশ্বাস করে যে সমাজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক লক্ষ্য, কারণ এই জ্ঞানই পুজিবাদী সমাজের নঞর্থক দিকগুলিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদর্থক দিকগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে প্রণোদিত করে। ফলতঃ মার্কসবাদ উত্তরাধুনিকতাবাদ দ্বারা অনুসৃত চরম সাপেক্ষতাবাদকে সমর্থন কবে না।

১.৬ নমুনা প্রশ্ন

দীর্ঘ প্রশ্নমালা ঃ

(১) উত্তরাধুনিকতাবাদের মূলভিত্তিগুলি আলোচনা করুন এবং এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করুন।

(২) লিওতার্ড-হাবেরমাস বিতর্কের একটি সামগ্রিক ধারণা দিন।

মধ্যম প্রশ্নমালা ঃ

(১) মার্কসবাদ-উত্তরাধুনিকতাবাদ বিতর্কটি আলোচনা করুন।

(২) উত্তরাধুনিকতাবাদের গঠনকারী উপাদানগুলি আলোচনা করো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা ঃ

(১) উত্তরাধুনিকতাবাদের ঐতিহাসিক ভিত্তিসূত্রগুলি কী কী?

(২) 'মহা-আখ্যান' (grand narrative) বলতে কি বোঝেন?

(৩) 'আধুনিকতার অসমাপ্ত প্রকল্প' (unfinished project of modernity) বলতে কী বোঝেন?

(৪) উত্তরাধুনিকতাবাদীরা কেন মার্কসবাদকে 'আলোকায়ন-প্রকল্প (Englishtenment project)-এর একটি অংশ হিসেবে গণ্য করেন?

১.৭ গ্রন্থসূচী

A. S. Hall and B. Giben : *Formations of Modernity* (Cambridge : Polity Press, 1992)

B. B. S. Turner (ed.) : *Theories of Modernity and Post modernity* (London : Sage, 1990)

C. Stuart Hall et al : *Modernity and Its Futures* (Cambridge : Polity Press, 1992)

একক—২ ❑ উত্তরউপনিবেশবাদ (Postcolonialism)

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ ভূমিকা

২.২ উত্তর উপনিবেশবাদ ঃ উত্থান এবং অর্থ

২.৩ এডওয়ার্ড সাইদ এবং প্রাচ্যবাদ

২.৪ উত্তর-উপনিবেশবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে 'পূর্বে'-র নির্মাণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ

২.৫ উত্তর উপনিবেশবাদের সমালোচনা

২.৬ নমুনা প্রশ্ন

২.৭ গ্রন্থসূচী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি জানা যাবে :

(ক) ভূমিকাতে উত্তর উপনিবেশবাদী তত্ত্বের একটি সামগ্রিক পরিচিতি দেওয়া হয়েছে।

(খ) উত্তর উপনিবেশবাদের জনক এডওয়ার্ড সাইদ ও তাঁর তত্ত্বভাবনা, যা প্রাচ্যবাদ নামে পরিচিত, সেটি আলোচিত হয়েছে।

(গ) উপনিবেশবাদ কীভাবে প্রাচ্যকে নির্মাণ করে, সেটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(ঘ) উপনিবেশবাদী তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২.২ ভূমিকা

দ্বিতীয় এককটিতে মূলতঃ আলোচিত হবে ১৯৮০-র দশকে উত্থিত একটি বিশেষ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ উত্তর উপনিবেশবাদ। আসলে এই দৃষ্টিকোণটি উপনিবেশবাদ প্রক্রিয়াকে নতুনভাবে অনুধাবনের একটি কৌশল। উত্তর উপনিবেশবাদী দৃষ্টিকোণের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত মার্কসবাদকেই উপনিবেশবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রিটিক বলে মনে করা হত—যা পশ্চিমী উপনিবেশবাদী বিজয় অভিযানকে ব্যাখ্যা করেছিল পশ্চিমী শক্তিগুলির অর্থনৈতিক শোষণ এবং রাজনৈতিক দমনপীড়নের ভিত্তিতে। এই ভাবনাচিন্তা থেকে

সরে এসে উত্তর উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকেরা উপনিবেশবাদী সাফল্যকে সাংস্কৃতিক আধিপত্য স্থাপনের একটি প্রয়াস হিসাবে ব্যাখ্যা করেন এবং যুক্তি দেন যে উপনিবেশবাদের টিকে থাকার কারণ তা এই যে, জনগণকে একটি বিশেষ অনুকুল সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে পুনর্গঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এই বিষয়টি বোঝাতে এরা সক্ষম হন যে উপনিবেশকারী শক্তিটি উন্নততর এবং উপনিবেশকারীরা উপনিবেশায়িত মানুষের (অর্থাৎ যারা উপনিবেশবাদের শিকার সেইসব মানুষের) হিতার্থেই তাদের শাসন করে। শুধু তাই নয়, প্রভূত্বকারী পশ্চিম প্রভূত্বাধীন পূর্বের তুলনায় উন্নততর। উত্তর উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, পূর্বোক্ত উপনিবেশবাদী সংস্কৃতি ও চেতনা প্রভূত্বাধীন জনগোষ্ঠীর উপর সফলভাবে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হওয়ায় উপনিবেশায়িত জনগোষ্ঠীকে তা বহু বছর ধরে সাংস্কৃতিক দাসত্বে বেঁধে রেখেছে। ফলতঃ প্রভূত্বাধীন উপনিবেশায়িত মানবগোষ্ঠীর কাছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতার বার্তা বহন করে আনতে পারেনি। প্রসঙ্গেক্রমে বলা চলে যে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে মার্কসবাদী অবস্থান যেভাবে উপনিবেশবাদকে বিশ্লেষণ করেছে তাকে বেশ তীব্রভাবেই সমালোচনা করেছে উত্তর উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকেরা কিন্তু উত্তর উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিক অবস্থানটিও কিন্তু সমানভাবে সমালোচিত হয়েছে। এই এককটিতে এই সমস্ত বিষয়গুলিকেই আলোচনার মধ্যে দিয়ে উত্তর উপনিবেশবাদী চেতনার একটি রূপরেখা নির্ণয় করা হবে।

২.৩ এডওয়ার্ড সাইদ এবং প্রাচ্যবাদ

1978 সালে এডওয়ার্ড সাইদ-এর 'Orientalism' গ্রন্থটি উত্তর উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিক আলোচনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি স্থাপন করে। এক্ষেত্রে সাইদ গ্রামশি-র ধারণাকে ব্যবহার করে তাঁর Orientalism-এর মূল যুক্তি কাঠামোটিকে নির্মাণ করেন এবং দেখান যে, অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে যে সম্পর্ক তা মূলতঃ ক্ষমতার ও দমনের এক বিবিধ মাত্রায় আধিপত্য স্থাপনের। এই সম্পর্কটি আবার কতকগুলি ভিত্তিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে বলে সাইদ মনে করেন, যেমন—

(ক) 'প্রাচ্য' সম্পর্কে ইউরোপীয় জ্ঞান কখনই নির্মোহ বা নিরপেক্ষ নয় বরং এই জ্ঞান বিশেষভাবেই একটি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য নির্মিত জ্ঞান। ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে 'প্রাচ্য' বিষয়ক পশ্চিমী জ্ঞানচর্চা বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যতাড়িত নয় বরং এর বিপরীতে 'প্রাচ্য'-কে বিশেষভাবে নির্মাণ করাই এর মূল উদ্দেশ্য। ফলতঃ 'প্রাচ্য'-কে নির্মাণ করার প্রকল্পটি ভীষণভাবেই রাজনৈতিক—যা সাংস্কৃতিকভাবে সংকীর্ণ পক্ষপাতিত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

(খ) সাইদ মনে করেন যে, পশ্চিমের প্রাচ্যবাদী তাত্ত্বিকেরা অধিকাংশই 'প্রাচ্যে'র বাইরের বাসিন্দা। ফলতঃ সেই অবস্থান থেকে প্রাচ্যের বাস্তবতাকে অনুধাবন করা বা সেই বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করার বৈধ ক্ষমতা তাদের নেই। এক্ষেত্রে তাদের বিবৃতি প্রাচ্যের প্রকৃত বাস্তব ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন।

সাইদ আরও মনে করেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে 'পশ্চিম' এবং 'পূর্বে'-র মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে প্রভাবিত করেছে দুটি বিষয়—

(ক) প্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপের মধ্যে গড়ে ওঠা এবং ব্যবস্থিত জ্ঞানচর্চা। সেই জ্ঞানচর্চার ভিত্তি ছিল উপনিবেশবাদী সংঘর্ষ এবং অবশ্যই একটি বিদেশী সভ্যতার প্রতি আগ্রহ। যদিও এই জ্ঞানচর্চা নিরপেক্ষ ছিল না বরং পক্ষপাতী এই জ্ঞানচর্চায় ব্যবহৃত হয়েছিল তৎকালীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচর্চায় সাইদের ভাষায় বিকশিত বিবিধ শাখার তথ্য ও জ্ঞান যেমন—নৃকূলতত্ত্ব (ethnology), তুলনামূলক সংস্থানতত্ত্ব (comparative analogy), ভাষাতত্ত্ব (philology)। শুধু তাই নয় এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল ইতিহাস-ও। এছাড়াও ঔপন্যাসিক, কবি, অনুবাদক এবং প্রতিভাবান পর্যটকদের বিবরণ এই সবই এই বিশেষ ব্যবস্থিত তত্ত্বচর্চার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল।

(খ) এক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে সম্পর্ককে দেখা হয়েছে সবল ও দুর্বলের মধ্যে সম্পর্কের মত। কারণ পশ্চিম (ইউরোপ) এই সম্পর্কে চিরকালই পূর্বের প্রতি সেইসব দৃষ্টিপাত করেছে যেভাবে দৃষ্টিপাত করে সবলপক্ষ তার দুর্বল প্রতিপক্ষের দিকে। পাশ্চাত্ত্য এক্ষেত্রে প্রাচ্যের বিপরীতে নিজেকে আদর্শস্থানীয় হিসেবে চিহ্নিত করেছে কৌশলে। ফলতঃ মনে হয়েছে পশ্চিম/পাশ্চাত্ত্য/ইউরোপ-ই যাবতীয় বিজ্ঞান, যুক্তি, জ্ঞানচর্চা ও প্রগতির পীঠস্থান। এর বিপরীতে পূর্ব হল পশ্চাদ্‌পদতা ও ক্ষয়ের প্রতীক। আর এই যুক্তিতেই উপনিবেশবাদের নৈতিক দাবী "সভ্য করার সর্মসূচি" বৈধতা অর্জন করতে চেষ্টা করেছে, যেমন বৈধতা পেয়েছে 'প্রাচ্যবাদ'।

২.৪ উত্তর উপনিবেশবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে 'পূর্বে'-র নির্মাণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ

উত্তর উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকরা যা দেখাতে চেষ্টা করেন, তা হল কিভাবে প্রাচ্যবাদীরা 'পূর্ব' (east)-কে 'পশ্চিমে'র (west) 'অপর' (other) হিসেবে নির্মাণ করে। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে 'পূর্ব'-কে পশ্চিমের বিপরীতে দাঁড় করানোর জন্য 'পূর্ব'-কে এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যা তাকে এক কল্পিত সুবর্ণজগত (golden world) বলে মনে হয়। তাছাড়া 'পূর্বে'-র জীবনযাত্রাকেও চিহ্নিত করা হয় আদিমতা মিশ্রিত সরলতা এবং নিষ্পাপ অজ্ঞতার দ্বারা। আর এই প্রেক্ষাপটেই দাবী করা হয় যে 'পূর্ব'-কে চিহ্নিত করা যায় কতকগুলি অনুন্নত সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজ দ্বারা। সেখানে মানুষ মূলত প্রাকৃতিক রাজ্যের বাসিন্দা এবং মুক্ত ও অবাধ যৌনতায় বিশ্বাসী। আসলে পূর্ব-কে এভাবে চিত্রায়িত করে, তার একটি অবক্ষয়িত চেহারাকেই কল্পজগতে চর্চা করতে চায় পশ্চিম। এভাবেই প্রাচ্যবাদ পূর্বের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চায় এবং পূর্বের অস্তিত্ব এক্ষেত্রে কেবলই পশ্চিমের সাপেক্ষে, পশ্চিমের অস্তিত্বের শর্তাধীনে গড়ে ওঠে। প্রাচ্যবাদীদের পক্ষে এজাতীয় নির্মাণ করা কঠিন হয় না কারণ তারা তাদের

আলোচনায় ব্যবহার করে কিছু 'ইউরোপীয় বর্গ' (European categories) এবং নিয়মনীতি যেগুলি দ্বারা সহজে প্রমাণ করা যায় যে পশ্চিম-ই আসলে বিজ্ঞান, যুক্তিবোধ এবং প্রগতির উৎসস্থল এবং এর বিপরীতে পূর্বকে চিহ্নিত করা যায় ধর্মীয় চেতনা কুসংস্কার, পশ্চাদ্‌পদতা এবং শৃঙ্খলাহীনতা দ্বারা।

উত্তর উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন যে 'প্রাচ্য' সম্পর্কে প্রাচ্যবাদী তাত্ত্বিকদের এ জাতীয় বিশ্লেষণের মূলটি গ্রথিত আছে আলোকায়নজাত আধুনিকতাবাদের সঙ্গে, যা এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যে 'পূর্ব' এবং 'পশ্চিম' সারসত্তাগতভাবে (essentially) শুধু পৃথক নয় বরং বিপরীত। আলোকায়নজাত আধুনিকতাবাদ বিশ্বজনীনভাবে এই সারসত্তাবাদ-কে বৈধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পিছুপা হয়নি।

২.৫ উত্তর উপনিবেশবাদের সমালোচনা

উপনিবেশবাদী প্রভাব বিষয়ে উত্তর উপনিবেশবাদের এহেন অভিনব দাবী ও যুক্তিগুলি সত্ত্বেও, এই অবস্থানটি সম্পর্কে বিভিন্ন সময় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উঠেছে, যেমন—

(ক) জে. জে. ক্লার্ক (J. J. Clarke) এর মত সমলোচকেরা মনে করেন সাইদের এই দাবীটিকে যদি মেনে নিই যে সমস্ত প্রাচ্যবাদী বুদ্ধিজীবীরাই প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিত্ব করে তবে প্রাচ্যবাদের সদর্থক দিকগুলি থেকে আমরা আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নেব, যা নিতান্তই অবিবেচনাপ্রসূত হবে। তিনি আরও দাবী করেন যে পশ্চিমী আলোকায়ন যে যুক্তিবোধের ধারণা নিয়ে আসে তা 'দ্বিধাগ্রস্থতা' বা 'সন্দেহে'-র মত বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব দেয়—যে দ্বিধা, সন্দেহ বা উদ্বেগ অনেকক্ষেত্রে পশ্চিমের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং তথাকথিত স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে। শুধু তাই নয়, 'প্রাচ্য' অনেকক্ষেত্রে পশ্চিমের গুরুত্বপূর্ণ 'রেফারেন্স পয়েন্টে'-এও পর্যবসিত হয়েছে। যেমন, পশ্চিমের নিজস্ব সীমাবদ্ধতাগুলিকে বুঝতে 'তাত্ত্বাদ' এবং 'বৌদ্ধ' ভাবনা ও চিন্তাদর্শ সম্পর্কে পশ্চিমের আগ্রহের কথা বলা চলে।

(খ) অনেকটা একইভাবে ডেভিড লাডেন (David Ludden)-ও বলেন যে, সাইদের প্রাচ্যবাদ প্রসঙ্গে বক্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হল সাইদ প্রাচ্যবাদকে একটি 'অবিমিশ্র' (undifferentiated) বিষয় হিসেবে দেখেছেন, কিন্তু বাস্তবত প্রাচ্যবাদ তা নয়।

সংকীর্ণ অর্থে প্রাচ্যবাদকে এক বিশেষ বৌদ্ধিক চর্চাক্ষেত্র বিসেবে দেখা যেতে পারে। আবার কিছুটা বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে একে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে যে কোনও বিষয়ের সঙ্গে যেগুলি কোনও না কোনওভাবে প্রাচ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেমন—অঙ্কন শিল্প, সাহিত্য, বৌদ্ধিক সন্দর্ভসমূহ (discourses) ইত্যাদি।

আবার এই দুই চরম অবস্থার মাঝখানে একটি তৃতীয় অবস্থান-ও থাকতে পারে যেখানে কিছু বিশেষ ঘটনা বা তৎসংশ্লিষ্ট বর্ণনার মধ্যে থেকে প্রাচ্যবাদী প্রবণতাকে খুঁজে নেওয়া হয়। তার ভিত্তি হতে পারে বিশেষ কিছু তথ্য বা অভিজ্ঞতাভিত্তিক সূত্র। লুডেনের মতে সাইদের 'প্রাচ্যবাদ' মূলত পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ধারা অনুসারী।

(গ) তবে সাইদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনাটি আসে বিশিষ্ট তাত্ত্বিক আইজাজ আহমদের (Aijaz Ahmad) তরফ থেকে। আহমেদ মনে করেন যে যদিও সাইদ প্রাচ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার তথাপি তাঁর নিজের প্রচেষ্টাটিকে 'প্রতি প্রাচ্যবাদ' (Orientalism in reverse) বললে ভুল হবে না। কারণ সাইদের প্রাচ্যবাদ সমালোচনাও দাঁড়িয়ে আছে একধরনের 'প্রতি-সারসত্তাবাদ'-এর (counter essentialism) উপর। আর এই 'প্রতি-সারসত্তাবাদ' ধরা পড়েছে পশ্চিমী জ্ঞানচর্চাকে সম্পূর্ণরূপে খারিজ করার আহ্বানের মধ্যেই।

আহমেদ মনে করেন যে, সাইদের প্রধান সীমাবদ্ধতা হল তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং পশ্চিম বিরোধিতাকে গুলিয়ে ফেলেন। তাই সাইদেগর কাছে পশ্চিমের সমগ্র জ্ঞানচর্চাই একধরনের নেতিবাচকতা বহন করে আনে। ফলতঃ আহমাদ কোনওভাবেই সাইদের এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন না যা সামগ্রিকভাবে পশ্চিমী জ্ঞানচর্চার ধারাটিকেই নাচক করতে বলে। কারণ আহমদ মনে করেন যে পশ্চিমী জ্ঞানচর্চার মধ্যেও 'ক্ষমতা' এবং 'আধিপত্যে'র মত ধারণাগুলির গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা রয়েছে, যেমন মার্কসবাদের কথা বলা চলে। আসলে আহমাদ কিছুতেই সাইদের যুক্তি অনুসারে মেনে নিতে পারেন না যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রাচ্যবাদ সমগোত্রীয়। যেমন তিনি বিশ্বাস করেন না যে পশ্চিমকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে অর্থাৎ পশ্চিম ব্যতিরেকে পূর্বে-র একটি স্বতন্ত্র অস্মিতা (autonomous identity) নির্মিত হতে পারে। সাইদের এ জাতীয় দাবীগুলির বিরোধিতা করে তাই আহমাদ বলেন যে অবিবেচকের মত সাইদের যাবতীয় দাবীগুলিকে স্বীকৃতি দিলে তৈরী হবে এক সংকীর্ণ মৌলবাদী বৌদ্ধিক পরিসর।

তাছাড়া আহমাদ আরও মনে করেন যে, প্রাচ্যবাদের ইতিহাস প্রভূত্বাধীনের তরফ থেকে কেবল নিষ্ক্রিয় আনুগত্যের ইতিহাস নয়। অর্থাৎ এমন নয় যে 'প্রাচ্য' কোনওভাবেই প্রাচ্যবাদী পশ্চিমী জ্ঞানচর্চাকে চ্যালেঞ্জ জানায়নি এবং সম্পূর্ণ প্রতিরোধহীনতায় আত্মসমর্পণ করেছে। বরং সেখানেও দেখা গিয়েছে প্রতিরোধ। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা প্রয়োজন যে, সাইদ তাঁর Culture and Imperialism (১৯৯৩)-এ উপনিবেশবাদ বিরোধী প্রতিরোধের কথা স্বীকার করে নেন এবং পরবর্তী বেশ কিছু রচনায় স্পষ্টতই বলেন যে প্রাচ্যবাদের সমালোচনার সময় কোনও প্রকার রক্ষণশীল ও মৌলবাদী অবস্থান গ্রহণের তাঁর ইচ্ছে নেই।

২.৬ নমুনা প্রশ্ন

দীর্ঘ প্রশ্নমালা ঃ

(১) সাইদ 'প্রাচ্যবাদ'-কে কীভাবে সমালোচনা করেছেন ব্যাখ্যা করুন।

(২) উত্তর উপনিবেশবাদ সংক্রান্ত তত্ত্বের সমালোচনাগুলির একটি রূপরেখা দিন।

মধ্যম প্রশ্নমালা ঃ

(১) প্রাচ্যবাদ কীভাবে পূর্বকে পশ্চিমের 'অপর' হিসাবে নির্মাণ করে তার পর্যালোচনা করুন।

(২) 'পূর্ব' এবং 'পশ্চিমে'র মধ্যে সম্পর্ক মূলতঃ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের—এই বিশেষ দৃষ্টিকোণটিকে বিশ্লেষণ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা ঃ

(১) উপনিবেশবাদ প্রসঙ্গে মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে উত্তর উপনিবেশবাদী দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র—আলোচনা করুন।

(২) প্রাচ্যবাদ কীভাবে পশ্চিমের "সভ্যতার মানচিত্র"-কে বৈধতা দিতে চায় ব্যাখ্যা করুন।

(৩) 'প্রতি-প্রাচ্যবাদ' বলতে আইজাজ আহমাদ কী বুঝিয়েছেন ব্যাখ্যা কর।

(৪) প্রাচ্যবাদ সম্পর্কে সাইদের অবস্থান প্রসঙ্গে জে. জে. ক্লার্কের সমালোচনাটি কী?

২.৭ গ্রন্থসূচী

A. Bart Moore-Gilbert : *Postclonial Theory : Context, Practices, Politics* (London and New York : Verso 1997)

B. Peter Childs and R. J. Patrick Williams (eds) : *An Introduction to Post-Colonial Theory* (Essex, Harlow : Prientice Hall, Pearson Education 1997).

C. Bart Moore-Gilbert et al (eds) *Postcolonial criticism* (London, and New York : Longman, 1997)

D. Leela Gandhi : *Postconolial Theory : A Critical Introduction* (Columbia : Columbia University Press 1998)

E. S. Hall and B. Gieben : *Formations of Modernity* (Cambridge : Polity Press, 1992)

একক—৩ ❑ নারীবাদ (Feminism)

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য
৩.২ ভূমিকা
৩.৩ নারীবাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ
৩.৪ নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতিচর্চা
৩.৫ নারীবাদের বিবিধ ধারা
৩.৬ বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে নারীবাদ
৩.৭ নমুনা প্রশ্নসমূহ
৩.৮ গ্রন্থসূচী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটবে ঃ

(ক) ভূমিকাতে নারীবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তিটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
(খ) নারীবাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
(গ) নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতির্চচার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।
(ঘ) নারীবাদের বিভিন্ন ধারাগুলির একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।
(ঙ) বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে নারীবাদের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছে।

৩.২ ভূমিকা

এই একটিতে 'নারীবাদ' সম্পর্কিত আলোচনার প্রথমেই 'সেক্স' ('যৌন স্বরূপ') এবং 'জেন্ডার' ('লিঙ্গ স্বরূপ') এই ধারণা দুটির পার্থক্যকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হবে এবং বিশ্লেষণ করা হবে কীভাবে 'সেক্স' বা যৌনস্বরূপ চিহ্নিত প্রাকৃতিকভাবে নির্দেশিত জৈবিক গঠনাত্মক স্বাতন্ত্র্য দ্বারা এবং 'জেন্ডার' বা 'লিঙ্গ স্বরূপ' একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবনার দ্বারা নির্মিত হয়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতেই এরপর আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বুঝে নেবার চেষ্টা করব যে কীভাবে 'লিঙ্গস্বরূপ' (জেন্ডার) বিষয়ক আলোচনা রাজনৈতিক তত্ত্বচর্চায় একটি অন্যতম মুখ্য 'বিষয়' হয়ে উঠল। এই আলোচনায় বেশ কিছু বিষয় পৃথকভাবে গুরুত্ব দিয়ে আলোচিত হবে, যেমন (ক) ব্যক্তিপরিসর-গণপরিসর-এর পার্থক্য ও বিভাজন (public-private divide), (খ) পিতৃতন্ত্র (patriarchy) (গ) সমতা এবং ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্য (equality and difference)। এই বিষয়গুলি আলোচনার পর আমরা বুঝতে চেষ্টা করব যে কীভাবে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হিসাবে গড়ে ওঠা নারীবাদের মধ্যেও রয়েছে বিবিধ অবস্থান—যে অবস্থানগুলিকে কেন্দ্র করেও আবার তৈরী হয়েছে দোলাচলগ্রস্ততা (ambiguity), যেমন—

(ক) সক্রিয় 'বিষয়ী' হিসেবে নারীর অন্তর্ভুক্তি বা সংযোজন (inclusion/addition)

(খ) মূলস্রোত রাজনৈতিক তত্ত্বচর্চার পুরুষকেন্দ্রিকতাকে ('mainstream = malestream') বর্জন করা

(গ) প্রাধান্যশীল রাজনৈতিক তত্ত্বের মূল ভাষ্যটিকে বিনির্মাণ করা এবং রূপান্তরণ বা পুনর্গঠন করা (deconstruction and transformation)

এই আলোচনা শেষে আমরা নারীবাদের বিবিধ ধারা নিয়ে আলোচনা করব, যেমন উদারবাদী নারীবাদ, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ এবং র‍্যাডিকাল নারীবাদ।

বিশ্বব্যাপী নারীবাদী আন্দোলনগুলির উত্থান, 'নারী'-কে এবং বিশেষত তার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থানটিকে সাম্প্রতিক রাজনীতিচর্চায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এই আলোচনার ভিত্তি হিসেবে অবশ্যই গুরুত্ব পেয়েছে 'যৌনস্বরূপ' (সেক্স) এবং 'লিঙ্গস্বরূপ' (জেন্ডার) এই দুটি বর্গের স্বাতন্ত্র্য। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে সনাতনী ভাবনায় জৈবিক বর্গ হিসেবে 'যৌনস্বরূপ (সেক্স)-কে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য সূচক একটি বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং অধিকতর শক্তিশালী যৌনবর্গ হিসেবে (stronger sex) পুরুষ, দুর্বলতর যৌনবর্গ (weaker sex) হিসেবে নারীর উপর প্রাধান্য পায়। এই জাতীয় দাবীর বিপরীতে নারীবাদীরা বলেন যে, যদিও জৈবিক তারতম্যের ভিত্তিতে 'যৌনস্বরূপ'-কে কেন্দ্র করে বিষমতা রয়েছে তথাপি এই বিষয়টির প্রয়োগকে প্রলম্বিত করে নারীর সামাজিক অবস্থানের উপর সুকৌশলে পুরুষ প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস সমর্থনীয় নয়। আসলে প্রাধান্যবিস্তারের এই প্রয়াসটির পিছনে রয়েছে সেই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নির্মাণ কৌশল যা পুরুষকে তার বিপরীত লিঙ্গ নারীর উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভুত্ব কায়েমের এক্তিয়ার দেয়। তাই শেষ পর্যন্ত জৈবিক স্বাতন্ত্র্য বা যৌনস্বরূপ সামাজিক বর্গ বা লিঙ্গস্বরূপ হিসেবে পুরুষ ও নারীর মধ্যে উর্ধ্ব-অধঃ সম্পর্ককে বৈধতা দেয়। অথচ নির্মিত লিঙ্গস্বরূপ (জেন্ডার) ভিত্তিক এই বিভাজন প্রাকৃতিক নয় বরং তা নিতান্তই সামাজিক সাংস্কৃতিক নির্মাণ। কীভাবে এই নির্মাণ প্রকৌশলকে দেখা হবে? এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজতেই চলে আসে 'ক্ষমতা', প্রভুত্ব এবং 'নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন। আলোচনায় চলে আসবে সেই প্রয়াসের (বা প্রয়াসগুলির) কথা যেখানে এক স্বতন্ত্র 'বিষয়ী' হিসেবে নারী পুরুষতান্ত্রিক নির্মাণ প্রকৌশলের বাইরে গিয়ে নিজের 'অস্মিতা' (identity) কে স্থাপন করতে চেয়েছে। আর এই সব বিষয়গুলির প্রেক্ষিতেই 'লিঙ্গস্বরূপ' বা জেন্ডার-এর সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করতে হবে।

৩.৩ নারীবাদের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়সমূহ

নারীবাদী দৃষ্টিকোণের মধ্যে সবকটি বিষয়বস্তুকে একটি অভিন্ন বিষয়সূচীর মধ্যে বেঁধে ফেলা কঠিন। এর একটি বড় কারণ হল নারীবাদী দৃষ্টিকোণগুলির অভ্যন্তরীণ পার্থক্য ও বৈচিত্র্য। তবু কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ভাবধারাকে কেন্দ্রীয় বক্তব্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে, এগুলি হল—

(ক) ব্যক্তিপরিসর-গণপরিসর বিভাজন (public-private divide)

(খ) পুরুষতন্ত্র (patriarchy)

(গ) সমতা ও ভিন্নতা (equality and difference)

(ক) ব্যক্তিপরিসর-গণপরিসর বিভাজন ঃ সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীতে গণপরিসরকে (public space) পুরুষের বিচরণস্থল এবং 'ব্যক্তিপরিসর'কে (private space) নারী-র অধিষ্ঠান ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয় এই পরিসর দুটি যে স্বতন্ত্র সে বিষয়টিকেও মেনে নেওয়া হয়েছিল এই দৃষ্টিকোণ থেকে। আর এই অনুশীলন ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিশ্বাস করা হতে থাকে যে রাজনীতি, প্রশাসন ইত্যাদি একান্তভাবেই পুরুষের বিচরণক্ষেত্র, অন্যদিকে নারীর একান্ত ও যাবতীয় মনোযোগ গৃহপরিসরে সীমাবদ্ধ। এই ব্যক্তিপরিসর বা গৃহপরিসরে তার কাজ আদর্শ 'মা' এবং 'স্ত্রী' হয়ে ওঠা, গৃহকর্ম নিপুণভাবে সম্পন্ন করা এবং পরিবারের দেখাশোনা করা। ফলত নারীর এই ব্যক্তিপরিসর একান্তভাবেই অ-রাজনৈতিক এবং যাবতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম থেকে যা বিরত থাকবে। শুধু তাই নয়, সনাতনী এই দৃষ্টিকোণ থেকে আরও দাবী করা হয় যে ব্যক্তিপরিসরে নারীর এই অবস্থান একান্তভাবেই প্রাকৃতিক। ঠিক যেমনভাবে পুরুষের বিচরণক্ষেত্র 'গণপরিসর' যা আবার রাজনীতিরও পীঠস্থান। সনাতনী ভাবনায় এই জাতীয় দ্বিবিভাজনের বিরুদ্ধে নারীবাদীরা তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং দেখান যে এই দ্বি-বিভাজন মিথ্যাশ্রয়ী, স্বেচ্ছাচারী এবং প্রকৃতিগতভাবে বিপদজনক। কারণ, প্রথমতঃ এই দ্বিবিভাজন নারী-পুরুষ বৈষম্যকে ব্যক্তিপরিসর-গণপরিসরের কৃত্রিম বিভাজনের ভিত্তিতে যৌক্তিকতা দিতে চায় যার পিছনে মূল উদ্দেশ্য হল 'ক্ষমতা'-র ক্ষেত্র হিসেবে গণপরিসরকে একান্তভাবেই পুরুষের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে সুরক্ষিত রাখা। নারীবাদীরা মনে করেন যে, রাজনীতি ও প্রশাসন, যা তথাকথিতভাবে গণপরিসরগত বিষয়, সেখানে নারী-পুরুষ দ্বি-বিভাজন সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অপ্রাসঙ্গিক, অসংখ্য উদাহরণের মাধ্যমে যা প্রমাণও করা যায়।

দ্বিতীয়ত ব্যক্তিপরিসরকে রাজনীতি উর্ধ্ব একটি বর্গ হিসেবে চিহ্নিত করার যে রাজনীতি তা আসলে গৃহ হিংসা, দমন ও বৈষম্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকা পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা ও আধিপত্যের প্রকৃত রূপটিকে উন্মোচিত হতে না দেওয়ার একটি অভিপ্রায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নারীবাদীরা মনে করেন যে, যদি রাজনীতিতে ক্ষমতা ও দমনপীড়নের ইতিহাসকে উন্মোচিত করার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে গৃহপরিসরও সমানভাবে রাজনৈতিক। আর এখান থেকেই তাঁরা বলেন যে, 'ব্যক্তিগত বিষয়ও রাজনৈতিক' বা the personal is political'। তাই গণপরিসরের এই দ্বিবিভাজন কৃত্রিম যার কোনও যৌক্তিক ভিত্তি নেই।

(খ) পুরুষতন্ত্র ঃ নারীবাদীরা মনে করেন যে, 'লিঙ্গস্বরূপ' বা জেন্ডার নির্মাণ প্রকৌশলটি আসলে এমন একটি অনুশলীন যা সমাজের সকল ক্ষেত্রে এবং প্রাধান্যশীল সামাজিক ধারায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে এক ক্রমোচ্চ (hierarchical) অবস্থানকে মেনে নেয় যেখানে পুরুষের প্রাধান্য বৈধতা পায়। আর এটিই পুরুষতন্ত্রের মূল কথা। পুরুষতন্ত্র পরিবারের ভিতরে এবং বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই, এমনকি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেও তারা প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যায় যখন দেখা যায় যে, সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় রয়েছে পুরুষ। যদিও এই জাতীয় প্রবণতার বিরুদ্ধে পশ্চিমে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরী হয়েছে কিন্তু উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে যথেষ্ট আশঙ্কাজনক।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে শিশুপুত্র এবং শিশুকন্যার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, কন্যা ভ্রূণ হত্যা, সংসদে ও প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে পুরুষের প্রাধান্য, পুরুষ প্রাধান্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টে নারী সংরক্ষণ সম্পর্কিত বিল পাশের ক্ষেত্রে অনীহা লক্ষ্যণীয়।

(গ) সমতা ও ভিন্নতা ঃ নারীবাদী আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সনাতন ধারা নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে। ফলত তাদের আন্দোলনের যে কর্মসূচী তার অন্যতম অঙ্গ হল নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি। আবার নারীবাদীদের মধ্যে একাংশ নারীপুরুষের সাম্যের তুলনায় তাদের মধ্যে ভিন্নতায় অধিক আস্থাশীল। র‍্যাডিকাল নারীবাদী গোষ্ঠীটি নারীর স্বাতন্ত্র্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং নারীরা যে মৌলিকভাবে পুরুষদের থেকে স্বতন্ত্র তা প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এঁরা মনে করেন যে নারীর মধ্যে রয়েছে কিছু বিশেষ গুণ যা নারীকে স্বাতন্ত্র্য দেয়। আর এই স্বাতন্ত্র্যের এমন স্বীকৃতি প্রয়োজন যা তাদের মধ্যে জন্ম দেবে এক ধরনের গোষ্ঠী ঐক্যের বোধ, যেটি জরুরী পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে। ফলত এরা দাবী করেন যে নারী ও পুরুষের মধ্যেকার পার্থক্যকে একটি চিরন্তন বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩.৪ নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনীতিচর্চা

নারাবাদীদের মধ্যে রাজনৈতিক অবস্থান প্রসঙ্গে কোনও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নেই। এদের মধ্যে একটি অংশ মনে করেন যে নারীবাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হল, সেইসব অধিকার এবং সুযোগ সুবিধাগুলি অর্জন করা যা সনাতন সমাজে নারীর ছিল না—অর্থাৎ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে ওঠা। আবার নারীবাদীদের মধ্যেই অপর অংশটি বিশ্বাস করে যে মূলস্রোত রাজনীতি পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলত এই রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্তি নারীর যুক্তিকে সুনিশ্চিত করে না। এর ফলে নারীর প্রয়োজন এক স্বনিয়ন্ত্রিত পরিসর' (autonomous space) যা পুরুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে অবস্থিত। নারীবাদীদের এই অংশের মূল সংগ্রাম তাই এই স্ব-নিয়ন্ত্রিত পরিসরটি অর্জনের লক্ষ্যে। অন্য দিকে নারীবাদীদের মধ্যেই অপর একটি অংশ মূলস্রোত রাজনীতি প্রসঙ্গে যাবতীয় ভাবনাচিন্তা বর্জনের সপক্ষে সওয়াল করে। তাঁরা মনে করেন মূলস্রোত ভীষণভাবেই পুরুষকেন্দ্রিক অর্থাৎ 'মূলস্রোত = পুরুষতান্ত্রিক স্রোত' এবং এই মূলস্রোতের নির্মাণ পুরষ তার নিজের ইচ্ছায় ও স্বার্থে করেছে—যেখানে নারীর কোনও স্থান নেই।

মতামতের ক্ষেত্রে এমন বিবিধ অবস্থান সত্ত্বেও নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীগুলির মধ্যে কতকগুলি সাধারণ উপাদান সনাক্ত করা যায়।

(ক) এক সক্রিয় বিষয়ী হিসেবে অন্তর্ভুক্তি/ সংযোজন ঃ এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সনাতন প্রথা/চর্চাকে চ্যালেঞ্জ করা হয় যা রাজনৈতিক পরিসরে নারীর প্রবেশাধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। শুধু তাই নয় এরা নারীর স্বতন্ত্র অবস্থানকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ সুনির্দিষ্টভাবে নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণকে চ্যালেঞ্জ জানায়, নারী-পুরুষ সমানাধিকারের পক্ষে সওয়াল করে এবং তাকে পুরুষের সঙ্গে সমগোত্রীয় হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চায়।

(খ) মূলস্রোত রাজনীতির ধারাকে বর্জন করতে চায় কারণ তা ভীষণভাবে পুরুষকেন্দ্রিক ঃ এক্ষেত্রে মূল যুক্তি হল মূলস্রোত রাজনীতি যে মান দৃষ্টি বা তত্ত্বগুলিকে গ্রহণযোগ্য বলে দাবী করে

সেগুলি ভীষণভাবেই পুরুষতন্ত্রের প্রতি পক্ষপাতগ্রস্ত। ফলত সেগুলি চিরকালই নারী স্বার্থের বিপরীতে ঝুঁকে আছে। এই রাজনীতিতে নারীর স্বতন্ত্র পরিসরের কোনও স্বীকৃতি নেই; তাই একে বর্জন করাই অভিপ্রেত।

(গ) প্রতিষ্ঠিত রাজনীতির ভাষ্যগুলির বিনির্মাণ এবং রূপান্তরণ ঃ মূলত উত্তরাধুনিকতাবাদ দ্বারা প্রভাবিত নারীবাদীদের একটি অংশ বিশ্বাস করে যে, নারীবাদীদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তথাকথিত লিঙ্গ নিরপেক্ষ রাজনীতির পক্ষপাতদুষ্টতার স্বরূপ উন্মোচন করা। বিনির্মাণ তথাকথিত লিঙ্গ নিরপেক্ষ রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচিত করে এবং তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা পুরুষ প্রভাবিত অর্থগুলিকে বের করে আনে। ফলত রাজনীতির মূল স্রোত ভাষ্যগুলির একধরনের সামগ্রিক রূপান্তরণ ঘটতে থাকে।

৩.৫ নারীবাদের বিবিধ ধারা

নারীবাদ কোনও একটি বিশেষ তত্ত্ব নয়। বরং এটি একটি দৃষ্টিকোণ যার মধ্যে রয়েছে বিবিধ ধারা যেমন—উদারবাদী নারীবাদ (Liberal Feminism), সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ (Socialist Feminism), র‍্যাডিকাল নারীবাদ (Radical Feminism)

(ক) উদারবাদী নারীবাদ ঃ

মেরী উলস্টোনক্রফট (Mary Wollstonecraft)-এর Vindication of the Rights of Women' থেকে শুরু করে বেটি ফ্রিডান (Betty Friedan)-এর The Feminine Mystiue (১৯৫৩) পর্যন্ত উদারবাদী নারীবাদের যে ধারা তাতে মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আলোকে নারীস্বাধীনতা বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। নারাবীদের এই বিশেষ ধারাটি কখনও সেইসব সুযোগ সুবধি আদায়ের দাবীতে সোচ্চার হয়েছে যা যুগযুগান্ত কেবল পুরুষের কুক্ষিগত ছিল এবং যেগুলি থেকে সুকৌশলে বঞ্চিত রাখা হয়েছে নারীদের, আবার কখনও এই ধারা চ্যালেঞ্জ করেছে সেই দৃষ্টিভঙ্গী বা বিশ্বাসকে যা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে নারী কেবলই গৃহ পরিসরের শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত। আসলে উদারবাদী নারীবাদ বিশ্বাস করে যে নারীকে গৃহপরিসরে আবদ্ধ রেখে পুরুষতন্ত্র সুকৌশলে তাকে রাজনীতি ও গণপরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়।

(খ) সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ ঃ

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস দ্বারা সূচীত এবং বলশেভিক আন্দোলন-উত্তর পর্বে Alexandra Kollontai দ্বারা অনুসৃত সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ বিশ্বাস করে যে, নারী যে বৈষম্যের শিকার তার মূল প্রোথিত আছে শ্রেণীবিভাজিত সমাজের বুকেই। আর এই বিশ্বাস থেকে তারা আরও দাবী করেন যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজের অধীনেই একমাত্র এই বৈষম্যের প্রতিকার সম্ভব। তবে বিংশ শতকের শেষ বছরগুলিতে যখন সমাজতন্ত্রের সংকট খুবই তীব্র আকার ধারণ করে তখন অবশ্য এই দাবীগুলিকে সেভাবে রক্ষা করতে পারেনি সনাতনী সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ। প্রকৃতপক্ষে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলিব মধ্যে অন্যতম হল এই যে, শ্রেণি এবং শ্রেণিবৈষম্য নিয়ে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ অতিরিক্ত মনোযোগী হওয়ায় লিঙ্গভিত্তিক সমস্যাগুলিকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে গণ্য করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা বা পদক্ষেপ নিতে তা ব্যর্থ হয়েছে।

(গ) র‍্যাডিকাল নারীবাদ

যেখানে উদারবাদী নারীবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ মূলত নারীবাদের প্রথম তরঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেখানে র‍্যাডিকাল নারীবাদ (যার আবার অসংখ্য উপধারা রয়েছে) মূলত নারীবাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তবে এই ধারাটি তার আকৃতি নিচ্ছিল বিশ শতকের সত্তর ও আশির দশক থেকেই। র‍্যাডিকাল নারীবাদ নারীবাদীরা 'লিঙ্গ-অস্মিতা' বা 'gender identity' বিশেষত যৌনতা বিষয়ক অধিকারের উপর গুরুত্ব দিয়ে তাদের অবস্থানটিকে স্বতন্ত্র করে তোলে। তারা দাবী করেন যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পিতৃতান্ত্রিক অবদমনের মধ্যে নারীর যৌন অধিকার হারিয়ে গিয়েছে অথবা বিকৃত উপস্থাপনার শিকার হয়েছে। অন্যভাবে বলতে গেলে র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী তার নিজের শরীরের উপর অধিকার হারিয়েছে, সে পুরুষের যৌন পরিতৃপ্তির পুতুল মাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। র‍্যাডিকাল নারীবাদের পক্ষে অত্যন্ত জোরালো সওয়াল করে এই ধারাটিকে বিশিষ্টতা দান কারর ক্ষেত্রে সিমন দা ব্যুভেয়ার (Simone de Beauvoir) বিশেষত তার The Second Sex (১৯৪৯) এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরবর্তীকালে এর পূর্ণ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি কেট মিলেট (Kate Millett)-এর Sexual Politics (১৯৭০)-এ এবং সুলমিথ ফায়ারস্টোন (Shulasith Firestone)-এর The Dialectic of Sex (১৯৭২)-এ। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, যেহেতু যৌনতাভিত্তিক পার্থক্য একটি প্রাকৃতিক বিষয় তাই পুরুষতন্ত্রের বীজটিও লুকিয়ে থাকে পুরুষের যৌনস্বরূপের মধ্যে—এবং এই বিষয়টিই পুরুষকে প্রণোদিত করে নারীকে দমন ও পীড়নে। তাই পুরুষ নিজেকে নারীর প্রতিপক্ষ হিসেবে নির্মাণ করে এবং এক ও অদ্বিতীয় যৌনবর্গ হিসেবে নিজেকে স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত বিষয়ী হিসেবেও দাবী করে। বলা বাহুল্য যে র‍্যাডিকাল নারীবাদীদের এমত দাবী তাদের বাকি নারীবাদীদের থেকে আলাদা করে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে উপরোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতেই র‍্যাডিকাল নারীবাদ নারীর শরীরের উপর তার স্বীয় অধিকার পুনরুদ্ধারের উপর গুরুত্ব দেয়। ফলত মহিলা সমকামীতাকেও তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন।

৩.৬ বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে নারীবাদ

বিশ্বায়নের সামগ্রিক প্রেক্ষিতে বিষয়টির প্রতি নারীবাদের দুটি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আবার সংশ্লিষ্ট রয়েছে রাষ্ট্র অনুবর্তী (pro-state) এবং রাষ্ট্রবিরোধী (anti-state) অবস্থান।

এদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে নারীর প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব এবং বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র মহিলাদের স্বার্থসংরক্ষণে আরও বেশী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম। এদের মূল যুক্তিটি হল বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে একদিকে যেমন শিক্ষার প্রসার ঘটবে তেমনই অন্যদিকে অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে অনিশ্চয়তাও বাড়বে। এমতাবস্থায় পারিবারিক অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে আরও বেশী সংখ্যক মহিলারা কাজের সন্ধানে বেড়োবেন। তাঁদের তরফ থেকে তাই তৈরী হবে আরও বেশী চাহিদা এবং অধিকার স্বীকৃতির দাবী। গণপরিসরে মহিলাদের বিপুল সংখ্যায় অনুপ্রবেশ রাষ্ট্রীয়

কর্মীবাহিনীকে মহিলা অধ্যুষিত করার ফলে মহিলাদের সমস্যা এবং দাবীগুলি নিয়ে রাষ্ট্র মাথা ঘামাতে বাধ্য হবে। ফলত রাষ্ট্র তাদের প্রতি অনেক বেশী মনোযোগী হয়ে উঠবে এবং তাদের জন্য উন্নয়নকর্মসূচীগুলি গ্রহণ করবে। যেমন আরও বেশ কিছু রাষ্ট্রের মত ভারতবর্ষও মহিলাদের জন্য উন্নয়নমন্ত্রক গড়ে তুলেছে যেখানে মহিলা উন্নয়নের কর্মসূচীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সঙ্গে মহিলাদের সমঝোতা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, মহিলাদের এই অধিকারগুলির স্বীকৃতি নিয়ে উদারবাদী নারীবাদীরা বহুদিন ধরে লড়াই করে চলেছেন। বেশ কিছু রাষ্ট্রে মহিলারা উচ্চপ্রশাসনিক পদগুলিও অধিগ্রহণ করে আছে। কিন্তু তবুও নীতি নির্মাণে, বিশেষত জনপ্রশাসনিক ক্ষেত্রে, নারীরা এখনও প্রান্তীকৃত এবং এইসব ক্ষেত্রগুলিতে পুরুষপ্রাধান্য এখনও সমানভাবে অব্যাহত রয়েছে।

তবে পূর্বোক্ত গোষ্ঠীর এই জাতীয় আশাবাদের বিপরীতে নারীকল্যাণে বিশ্বায়নের প্রভাব বিষয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্র বিরোধী নারীবাদীরা। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি আবার বহুধারায় বিভাজিত। তবে প্রায় সবকটি ধারাই প্রথম গোষ্ঠীটির বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলে যে, বিশ্বায়নের পর্বে নারীর জীবনে আরও বেশী নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তা এসেছে। কারণ বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্র নিজেকে বিবিধ দায়বদ্ধতাগুলি থেকে সরিয়ে নিয়েছে, এমতাবস্থায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মহিলারা। তাদের এই ক্ষতিগ্রস্থতা দুটি স্তরে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রথমত অর্থনৈতিক সংস্কার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র অধিজাতীয়তাবাদী করপোরেশনগুলিকে (transnational corporation) কার্যতঃ অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব দান করেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ উন্নয়ন কর্মসূচীগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও NGO গুলির হাতে।

এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তা—যা সবচেয়ে অনুভব করেছে নারী। আর এই বিষয়গুলির ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা গিয়েছে ব্যাপক সীমান্ত অভিবাসন (cross border migration), নারী পাচার, অধিজাতীয় দেহব্যবসা, মানবাধিকার লঙ্ঘন। বলা বাহুল্য এই বিষয়গুলি নারীর সামগ্রিক সাম্মানিক অবস্থানের এক শোচনীয় অধঃপতনকে চিহ্নিত করে। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঘটনাগুলি ঘটেছে সেইসব স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যস্থতায় যা পুরুষ অধ্যুষিত। বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে নারীর বিরুদ্ধে যেমন অপরাধ প্রবণতা বেড়েছে তেমনই বিশ্বব্যাপী এই অপরাধ প্রবণতার বিপরীতে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দৃষ্টান্তও বেড়ে চলেছে। সমালোচকরা মনে করে যে বিশ্বায়ন নারী এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলেছে। কারণ আগে নারী সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে সমঝোতার ক্ষেত্রে সরাসরি রাষ্ট্রকে একটি মূল পক্ষ হিসাবে সনাক্ত করা সহজ হত কিন্তু বিশ্বায়ন সেই সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করেছে। শুধু তাই নয় বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে নারী আন্দোলনগুলি অত্যন্ত বেশীমাত্রায় ছড়িয়ে পড়ায় সেগুলির কর্মসূচী এবং প্রভাব বিষয়ে একধরনের অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে।

এই বিস্তারিত আলোচনার শেষে বলা যায় যে নারীবাদের বিবিধ ধারা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিতর্কগুলির অস্তিত্ব সত্ত্বেও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বোঝার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এটি রাষ্ট্র এবং নারীর বিশেষ অবস্থিতি ও দাবীদাওয়া সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকোণ ও জ্ঞানকে বিশেষভাবে প্রসারিত করতে সাহায্য করে। একথা অনস্বীকার্য যে রাষ্ট্র প্রসঙ্গে

মূলস্রোত ভাবনাচিন্তায় যুগ যুগ ধরে মহানচিন্তাবিদরা তাদের দর্শন ও তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বনিয়ন্ত্রিত 'বিষয়ী' (subject) হিসেবে নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিষয়ে আলোচনা সাধারণভাবে উপেক্ষিতই ছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নারীবাদী দৃষ্টিকোণের উত্থান আসলে সেই অতীতে সংঘটিত ভ্রান্তির-ই একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক সংস্কার।

৩.৭ নমুনা প্রশ্ন ঃ

দীর্ঘ প্রশ্নমালা ঃ

(১) নারীবাদের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) নারীবাদ প্রসঙ্গে উদারবাদী ও র‍্যাডিকাল দৃষ্টিকোণের একটি রূপরেখা দিন।

মধ্য প্রশ্নমালা ঃ

(১) র‍্যাডিকাল নারীবাদ সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

(২) সাম্প্রতিককালে কীভাবে বিশ্বায়ন নারীবাদী দৃষ্টিকোণকে প্রভাবিত করেছে সেটি ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা ঃ

(১) উদারবাদী নারীবাদের কেন্দ্রিয় আলোচ্য বিষয়টি কী?

(২) র‍্যাডিকাল নারীবাদ সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ থেকে কীভাবে স্বতন্ত্র?

(৩) 'ব্যক্তিগত-ই রাজনৈতিক'—এই বক্তব্যটির অর্থ কী?

(৪) 'যৌনস্বরূপ' বা 'সেক্স' এবং 'লিঙ্গস্বরূপ' বা 'জেন্ডারে'র মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৩.৮ গ্রন্থসূচী

A. Elizabeth Fraser and Nicola Lasey : "Public-private Distinctions' in Alan Finlayson (ed) : *Contemporary Political Thought. A Reader and Guide* (New Delhi : Rawat, 2003)

B. Michael Colinstay, David Marsh Lister, (eds) : *The State : Theories and Issues* (Hampshire : Palgrave Macmillan 2006)

C. Catharine Mackinnon : *Towards a Feminist Theory of the State* (Cambridge MA : Harvard University Press 1989)

D. Andrew Heywood : *Modern Political Ideologies*. Third Edition (New York : Palgrane, Macmillan, 2003)

E. Chris Beasley : *What is Feminism ? An Introduction to Feminist Theory* (Sage : New Delhi, 1999]

একক—৪ ❑ বাস্তুসংস্থানবাদ (Ecologism)

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য
৪.২ ভূমিকা
৪.৩ বাস্তুসংস্থানবাদের মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ
৪.৪ বাস্তুসংস্থানবাদের বিবিধ ধারা
৪.৫ বাস্তুসংস্থানতত্ত্বের আলোকে রাষ্ট্র
৪.৬ নমুনা প্রশ্ন
৪.৭ গ্রন্থসূচী

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটবে ঃ

(ক) বাস্তুসংস্থানবাদের তাৎপর্য ও গুরুত্বটি ভূমিকায় আলোচিত হয়েছে।

(খ) বাস্তুসংস্থানবাদের মূল আলোচ্য বিষয়গুলি ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(গ) বাস্তুসংস্থানবাদের আলোকে রাষ্ট্রের ধারণাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.২ ভূমিকা

চতুর্থ এককটিতে মূলত আলোচিত হবে বাস্তুসংস্থান (ecology) এবং রাজনীতির আন্তঃসম্পর্ক। এক্ষেত্রে প্রথমেই পরিবেশবাদ এবং বাস্তুসংস্থানবাদের মধ্যে পার্থক্যকে চিহ্নিত করা হবে এবং দেখার চেষ্টা করা হবে যে কীভাবে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক তত্ত্বচর্চায় বাস্তুসংস্থানবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এরপর বিশ্লেষণ করা হবে যে বাস্তুসংস্থানবাদ কীভাবে পূর্বতন নৃকূলকেন্দ্রিক (anthropocentric) দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণের ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে—যে ধারাটি আলোকায়নজাত আধুনিকতাবাদী চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। এর বিপরীতে আমরা দেখতে চেষ্টা করব কীভাবে বাস্তুসংস্থানবাদ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক ধরনের সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সৃজনশীল সম্পর্কের পক্ষে সওয়াল করে। বাস্তুসংস্থানবাদ প্রকৃতপক্ষে এক বিকল্প দার্শনিক ও নৈতিক দর্শনের সন্ধান দেয় যা গুরুত্ব সহকারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করে ঃ

(a) সামগ্রিকতাবাদ (holism)

(b) স্থিতিক্ষমতা (sustainability)

(c) পরিবেশ সম্পর্কিত নৈতিকতা (environmental ethics)

(d) উত্তরবস্তুবাদ (post-materialism)

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বাস্তুসংস্থানবাদ কোনও সমসাত্ত্বিক তত্ত্ব (homogenous doctrine) নয়, এর মধ্যেও রয়েছে অনেকগুলি ধারা যেমন—দক্ষিণপন্থী বাস্তুসংস্থানবাদ, ইকোসোশ্যালিজম, ইকো-অ্যানার্কিজম এবং ইকোফেমিনিজম। এই প্রত্যেকটি বিষয় নিয়েই একটিতে এই ইউনিটে আলোচিত হবে।

পৃথিবীব্যপী পরিবেশবাদী সবুজ আন্দোলনগুলি (Green movement) প্রাথমিকভাবে শিল্পায়নের অভূতপূর্ব বিকাশের ফলশ্রুতিতে ঘটে চলা পরিবেশ বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল। তবু সনাতন পরিবেশবাদ তার দৃষ্টিভঙ্গীগত সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করতে পারেনি। ফলত প্রাথমিকভাবে পরিবেশবাদীরা পরিবেশগত বিপর্যয়কে ম্যানেজারিয় দৃষ্টিকোণ থেকে সামলে নিতে চেয়েছে। এক্ষেত্রে তারা সংকটকালীন পরিস্থিতিতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছে। আর ঠিক এই প্রেক্ষিতেই পরিবেশবাদ ও বাস্তুসংস্থানবাদ পরস্পরের থেকে পৃথক হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বাস্তুসংস্থানবাদ অনেক বেশী র‍্যাডিকাল নৈতিকতা, রাজনীতি ও দর্শন দ্বারা চিহ্নিত যা প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে নতুনভাবে বিশ্লেষণ করে। গ্রীন পলিটিক্স এর অন্যতম পীঠস্থান জার্মানীতে বাস্তুসংস্থানবাদ বা ইকোলোজিসম পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে এক বিকল্প সম্পর্ক নির্মাণের উপর গুরুত্ব দেয়। কীভাবে বাস্তুসংস্থানবাদ সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চর্চায় এতখানি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল এক্ষেত্রে সেটিরও বিশ্লেষণ জরুরী এবং এই বিষয়টি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে চেষ্টা করব যে কীভাবে আলোকায়ন এবং ইউরোপীয় আধুনিকতাবাদ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছিল। সেখানে মূলত মানুষের প্রয়োজনে প্রকৃতির নিরন্তর ব্যবহারকে কোথাও নিষিদ্ধ করা হয়নি। এর বিপরীতে বাস্তুসংস্থানবাদ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক সুসামঞ্জস্যময় সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়েছে, যেমন অনেক সনাতন ধর্মবিশ্বাসেও এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল (উদাহরণস্বরূপ হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং তাওবাদের কথা বলা চলে)।

৪.৩ বাস্তুসংস্থানবাদের মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ

একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে বাস্তুসংস্থানবাদ নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়।

(a) সামগ্রিকতাবাদ (holism)

বাস্তুসংস্থানবাদ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রভাবশালী নিউটোনীয় সেই বিশ্বদর্শনকে চ্যালেঞ্জ করে যে বিশ্বদর্শন সমগ্র পৃথিবীকে একটি যন্ত্র হিসেবে গণ্য করেছিল এবং এই যন্ত্রের যন্ত্রাংশগুলি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনই ছিল জ্ঞানচর্চার চূড়ান্ত লক্ষ্য। সেই জ্ঞানকে আবার কিছু সুনির্দিষ্ট সূত্র ও নীতির মধ্যে বেঁধে ফেলার দাবীও করেছিল নিউটনীয় এই বিশ্বদর্শন। অর্থাৎ এই চর্চায় সমগ্রের ধারণা অবলুপ্ত হয়। অবলুপ্ত হয় মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে অঙ্গসংস্থানিক সংশ্লিষ্টতার (organic integration) ধারনা। এর বিপরীতে বাস্তুসংস্থানবাদ মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি সংগতিপূর্ণ সম্পর্কেরই পুনরুদ্ধার করতে চায় যার ভিত্তি হিসেবে সে আধুনিক বিজ্ঞান এমন কী ধর্মশাস্ত্রকেও গ্রহণ করে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে আইনস্টাইনীয় বীক্ষা এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নিউটনীয় বিশ্ববীক্ষার অভ্রান্ততাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং দেখায় যে সকল বিষয়কেই কিছু বিশ্বজনীন সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তৈরী হয় অনিশ্চয়তার (indeterminism) ধারণা। এই ধারনাই নিউটনীয় হ্রস্বায়ণবাদী দৃষ্টিকোণকে চ্যালেঞ্জ করে। তা ছাড়া সনাতন ধর্মীয় চেতনার বিবিধ ধারায় অভিন্ন ঈশ্বর এবং প্রকৃতির ধারনাকে স্বীকার করা হয়েছিল। আর এই সব বিষয়গুলিই বাস্তুসংস্থানবাদের 'সামগ্রিকতা'-র ধারনায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। যদিও

আলোকায়ন যা বিজ্ঞানকে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং বিজ্ঞানকেই প্রগতির ভিত্তি হিসেবে জাহির করে তথাপি মানুষ ও প্রকৃতির সুসামঞ্জস্যময় সম্পর্ককে কিন্তু তা সুনিশ্চিত করতে পারেনি। বরং আলোকায়ন মানব প্রজাতিকে তথাকথিত প্রগতির স্বার্থে প্রকৃতিকে আত্মসাৎ, নিয়ন্ত্রণ এবং দমন করতে শেখায়। বলা বাহুল্য যে পুঁজিবাদ এবং শিল্পায়নও মানুষ ও প্রকৃতির এহেন সম্পর্ককেই গুরুত্ব দিয়েছে এবং ফলত শেষ পর্যন্ত জন্ম হয়েছে ব্যাপক পরিবেশ দূষণ, বি-অরণ্যায়ন এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত সমস্যাগুলির দায়ভার নিয়ে চাপান উতরের মত ঘটনাগুলির, যদিও এই সবই ঘটেছে উন্নয়ন ও প্রগতির নামে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উন্নয়ন ও প্রগতির মুখোশের অন্তরালে রয়েছে শিল্পভিত্তিক সমাজের ব্যবসায়িক স্বার্থ ও মুনাফা। আর এই সকল বিষয়গুলির বিরুদ্ধেই বাস্তুসংস্থানবাদ একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা গড়ে তোলে তেমনই এক বিকল্প দর্শনেরও জন্ম দেয়। ফলত সাম্প্রতিককালে পরিবেশ ও মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে বাস্তুসংস্থানবাদ এবং তৎসংশ্লিষ্ট 'গ্রীন পলিটিক্স' বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে।

স্থিতিক্ষমতা (Sustainability)

বাস্তুসংস্থানবাদ বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষার তাগিদে শক্তিসম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে সেগুলিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানো যায়। অর্থাৎ, স্থিতি ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বাস্তুসংস্থানবাদ দূষণ, অতিভোগ এবং অবিবেচকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংসসাধনকে প্রতিরোধ করতে চায়। অন্যভাবে বলতে গেলে বাস্তুসংস্থানবাদ ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের স্পর্শকাতর চরিত্র এবং সেটির সহনক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দেয়। এটি একদিকে ভোগবাদের বিরুদ্ধে এক ধরনের রণকৌশল গ্রহণ করতে চায়, কারণ ভোগবাদ যে বৃহৎ শিল্পের বিষাক্ত প্রভাব তা প্রকৃতির উপর নিরন্তর নিষ্ঠুর আগ্রাসন কায়েম করে। অন্যদিকে বাস্তুসংস্থানবাদ এক ভিন্ন স্থিতিক্ষম উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয় যা পৃথিবীর ভারসাম্যময় অস্তিত্বের অগ্রাধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

পরিবেশ সম্পর্কিত নৈতিকতা (Enviromental Ethics)

অনেক ক্ষেত্রেই 'গ্রীন এথিক্স' হিসেবে চিহ্নিত পরিবেশ সম্পর্কিত নৈতিকতা প্রকৃতিকে দেখে একটি 'কৌম' (community) হিসেবে, যেখানে সকল জীবন্ত উপাদান যেমন মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর সমানাধিকার এবং সমান দায়িত্ব রয়েছে। অর্থাৎ, মনে করা হয় যে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বজায় রাখতে কিছু নৈতিক আচরণবিধি অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন এবং প্রয়োজন মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে বাস্তুসংস্থানবাদ যে পরিবেশ সম্পর্কিত নৈতিকতার উপর গুরুত্ব দেয় তাতে পারস্পরিক সহনশীলতা, অহিংসা ইত্যাদি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তরভোগবাদ (Post Materialism)

উত্তরভোগবাদী দর্শন সংশ্লিষ্ট রয়েছে বাস্তুতন্ত্রের গভীরতর দর্শনের সঙ্গে, যা ভোগবাদী দৃষ্টিকোণকে সমালোচনা করতে শেখায় যে ভোগবাদের জন্ম আধুনিকতাবাদের ভিতর থেকে। উত্তরভোগবাদ দেখায় কীভাবে আধুনিকতাবাদ বিজ্ঞান ও তথাকথিত উন্নয়নের ধারনার প্রতি মোহগ্রস্ত। সেই মোহগ্রস্থতা স্থূল

বস্তুবাদ ও ভোগবাদে আচ্ছন্ন করে ব্যক্তিকে। ফলত সেই ব্যক্তি কেবল আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত থাকে এবং পরিবেশের ধ্বংস বিষয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে বাস্তুসংস্থানবাদ এমন এক দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে আছে যা বিশ্বব্যাপী পরিবেশবাদী আন্দোলনে নিজেকে সামিল করেছে, যেমন বিশ্বব্যাপী নারী আন্দোলন বা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনগুলি। বাস্তুসংস্থানবাদ একইসঙ্গে প্রতিস্থাপিত করতে চেয়েছে অহমিকা সর্বস্ব বস্তুবাদী জীবন দর্শনকে এবং আহ্বান করেছে একটি বিকল্প উত্তরবস্তুবাদী জীবনদর্শন। সেই জীবনদর্শন কেবল ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় বরং তা একটি সংহত, সমগ্রতাভিত্তিক নৈতিক চেতনার জন্ম দেয় সেখানে ব্যক্তি সমগ্র অর্থাৎ প্রকৃতির-ই অংশ।

৪.৪ বাস্তুসংস্থানবাদের বিবিধ ধারা

বাস্তুসংস্থানবাদ কোন একটি বিশেষ সমসাত্ত্বিক তত্ত্ব নয় বরং এর মধ্যেও রয়েছে বিবিধ ধারা—

(ক) দক্ষিণপন্থী বাস্তুসংস্থানবাদ (Right-wing Ecologism)

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে বাস্তুসংস্থানবাদ একটি র‍্যাডিকাল দৃষ্টিভঙ্গী যা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে আধুনিকতবাদী দর্শনকে চ্যালেঞ্জ করে এবং একটি বিকল্প দর্শনের সন্ধান করে। কিন্তু বেশ আশ্চর্যজনকভাবে ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে বাস্তুসংস্থানবাদের গভীরে থাকা দর্শনকে অনেক ক্ষেত্রেই দক্ষিণপন্থীরা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছে। যেমন হিটলারের জার্মানীতে ওয়াল্টার ডার (Walter Darre) পরিবেশ সংরক্ষণ এবং বাস্তুচক্রের ভারসাম্য বিধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়ার আহ্বান করেন। আসলে তাঁর এমন আহ্বানের পিছনে কাজ করেছিল অতীতকে গৌরবান্বিত করা এবং অতীত বিষয়ে রোম্যান্টিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে এক বোঝাপড়া, যে বোঝাপড়া মানুষের ভিতর সুপ্ত শক্তির উন্মোচন ও স্ফুরণ কামনা করে। বলা বাহুল্য যে বিষয়টি তৎকালীন নাৎসী জার্মানীর প্রেক্ষাপটে অসাধারণভাবে খাপ খেয়ে যায়। ১৯৮০র দশকে মার্গারেট থ্যাচারও প্রায় একইভাবে ব্যবহার করেন অতীত ও প্রকৃতি বিষয়ে এক রোম্যান্টিক মস্টালজিয়া বা অতীতচারণকে এবং দেখান যে সংরক্ষণবাদ আসলে বাস্তুচক্রের অস্তিত্বরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয়। অর্থাৎ, অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তুসংস্থানবাদী দর্শন সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে রক্ষণশীল ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়ার আহ্বানের সঙ্গে, সেই প্রাক্-আধুনিক রোম্যান্টিক ধারার সঙ্গে যা একদা 'ক্ষুদ্র কৌম' (small Communities)-গুলিকে ঘিরে তৈরী হয়েছিল।

(খ) বামপন্থী বাস্তুসংস্থানবাদ বা ইকোসোশ্যালিজম (Ecosocialism) :

বাস্তুসংস্থানবাদ প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট বামপন্থী, সমাজবাদী এবং মার্কসবাদী সেই বিশ্বাসের সঙ্গে যা মনে করে পুঁজিবাদই প্রকৃতপক্ষে সকল পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার মূল। এই বিশ্বাস অনুযায়ী পুঁজিবাদ মূলত মুনাফা এবং অর্থ উপার্জনের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেয় এবং পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধন করবার জন্য নির্দয়ভাবে বাস্তুচক্রের ভারসাম্য নষ্ট করে। জন্ম দেয় এমন এক হিংস্র বস্তুবাদী সমাজের যা মানব-প্রকৃতির সম্পর্ক বা বিশ্ব-বাস্তুচক্রের ভারসাম্য বিষয়ে মাথা ঘামায় না। এর বিপরীতে 'ইকোসোশ্যালিজম'

এমন এক বিকল্প সমাজবাদী চেতনার জন্ম দেয় যা দেখায় যে সমাজবাদই একমাত্র সেই ব্যবস্থা যা মানুষ ও প্রকৃতির ভারসাম্যময় সম্পর্কটিকে গুরুত্ব দেয়। তবে বাস্তবক্ষেত্রে ১৯৮৬ সালে ইউক্রেনে চেরনোবিল দুর্ঘটনা এবং ১৯৯১ সালে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর প্রকাশিত একাধিক ঘটনা উন্মোচনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবাদের পূর্বোক্ত দাবী প্রসঙ্গে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে।

(গ) ইকো-অ্যানার্কিজম্ (Eco-anarchism)

বাস্তুসংস্থানবাদী চেতনায় নৈরাজ্যবাদী দর্শনের প্রভাব বিষয়ে যাদের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁরা হলেন উইলিয়াম মরিস (William Morris) এবং প্রিন্স ক্রপটকিন (Prince Kropotkin) যাঁরা যে কোনও ধরনের কর্তৃত্বকেই অপ্রয়োজনীয় হিসাবে নস্যাৎ করতে চান এবং প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে স্বতঃস্ফূর্ততা ও কৌম (Community) জীবনকে গুরুত্ব দেন। প্রায় একইভাবে 'ইকো-অ্যানার্কিস্ট'রা দাবী করেন যে প্রকৃতির মধ্যেই থাকে স্বতঃস্ফূর্ততার বীজ এবং ভারসাম্যের মূল মন্ত্র। তাই কোনওভাবেই প্রকৃতির ভারসাম্যকে ক্ষুণ্ণ করা অভিপ্রেত নয়। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ বা যে কোনও ধরনের বিবৃতির ফলশ্রুতি ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব নিয়ে আসতে পারে বলে এরা মনে করেন।

(ঘ) নারীবাদী বাস্তুসংস্থানবাদ বা ইকো-ফেমিনিজম (Eco-feminism) :

বাস্তুসংস্থানবাদের এই বিশেষ ধারাটিকে নারীবাদ এবং বাস্তুসংস্থানকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এক সূত্রে বেঁধে ফেলা হয়। ইকোফেমিনিজম-এর প্রবর্তক ও সমর্থকরা মনে করেন যে নারী ও প্রকৃতি সমার্থক এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ প্রকৃতি ও নারী উভয়ের প্রতিই অ-যত্নশীল ও কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জিত, এদের যুক্তি হল পিতৃতন্ত্র যেমনভাবে পুরুষকে নারীর উপর দমনপীড়ন করতে শেখায় ঠিক একইভাবে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ প্রকৃতিকেও দমন, পীড়ন ও নিয়ন্ত্রণ করবার কৌশল শেখায়। অর্থাৎ, পুরুষশাসিত বিশ্বে প্রকৃতি ও নারী উভয়ই পুরুষতন্ত্রের দ্বারা অবদমিত ও নিয়ন্ত্রিত। ইকোফেমিনিস্টরা মনে করেন যে নারী প্রকৃতির মতই সামঞ্জস্য, শান্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততার বাহক, যে সামঞ্জস্য, শান্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততা পুরুষতান্ত্রিক হস্তক্ষেপে ব্যাহত হয়। ফলত নারী ও প্রকৃতির সংরক্ষণের স্বার্থে পুরুষতন্ত্রকে ধ্বংস ও প্রতিস্থাপিত করা প্রয়োজন।

৪.৫ বাস্তুসংস্থানতত্ত্বের আলোকে রাষ্ট্র

বাস্তুসংস্থানবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্র সম্পর্কে মোট চার ধরনের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়, যেমন—

(ক) রাষ্ট্রের কেন্দ্রবর্তী অবস্থান এবং বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত বিষয়গুলির স্থানকেন্দ্রিকতার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা

(খ) রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রবাদের সমালোচনা

(গ) হিংসাশ্রয়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক যান্ত্রিক উদ্দেশ্যসাধনে সম্পদের ব্যবহার

(ঘ) বাস্তুসংস্থানবাদ প্রকৃতপক্ষে সেই নির্দেশক যা দেখায় যে কীভাবে উদারবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যক্তিকে অক্ষম করে রাখে।

(ক) রাষ্ট্রের কেন্দ্রবর্তী অবস্থান এবং বাস্তুতন্ত্র সংক্রান্ত বিষয়গুলির 'লোক্যালিজম্' বা স্থানকেন্দ্রিকতার

মধ্যে যে ছেদ তার ভিত্তি সেই ধারণা যা বলে 'ক্ষুদ্রই সুন্দর'। ১৯৭৬ সালে ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন ফ্রিটজ্ সুমাখার (Fritz Schumacher), পরবর্তীকালে যাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলেন জিগমুন্ট বাউমান (Zygmunt Bauman)। আসলে এদের মূল বক্তব্য ছিল যে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় জনগণ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে। এর বিপরীতে বাস্তুসংস্থানবাদ সম্পদ সংরক্ষণ এবং পরিবর্ধনে আঞ্চলিক উদ্যোগকে কাজে লাগানোর উপর গুরুত্ব দেয়। তাই গুরুত্ব পায় আঞ্চলিকতা, বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদির মত বিষয়গুলি একই এবং আঞ্চলিকতা ও বিকেন্দ্রীভবনের মত বিষয়গুলি সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গুরুত্বকে চ্যালেঞ্জ করে।

(খ) রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রবাদের সমালোচনা ঃ বাস্তুসংস্থানবাদীরা মনে করেন যে, আধুনিক রাষ্ট্র প্রশাসন ও ম্যানেজারিয় নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে যুক্ত রাখে যাতে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বৃহৎ নিগমগুলির (corporate) স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখে। এক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের মাধ্যমেই রাষ্ট্র এই নিয়ন্ত্রণকারী কার্যগুলিকে সম্পাদন করে থাকে। বাস্তুসংস্থানবাদীরা রাষ্ট্রের এমন ভূমিকাকেই তীব্রভাবে সমালোচনা করেন কারণ তাঁরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের এমন ভূমিকা এবং নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত ব্যাপক পরিবেশগত অবনতিকে ডেকে আনে। শুধু তাই নয় রাষ্ট্রের এমন ভূমিকার প্রেক্ষিতে মানুষও নিজেকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং নিজেকে প্রকৃতির প্রভু হিসেবে সনাক্ত করতে থাকে। ফলত প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে প্রকৃত যে সম্পর্ক তা উল্টে যায়। এ জাতীয় ধারণাকেই বাস্তুসংস্থানবাদ চ্যালেঞ্জ করে এবং মানুষের উপর প্রকৃতির অগ্রাধিকারের পক্ষে সওয়াল করে।

(গ) হিংসাশ্রয়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং রাষ্ট্র কর্তৃক যান্ত্রিক উদ্দেশ্যসাধনে সম্পদের ব্যবহাবঃ আধুনিক রাষ্ট্র প্রযুক্তিতে ব্যবহার করে যান্ত্রিকভাবে কিছু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ফলত প্রাকৃতিক সম্পদ এক ধরনের ম্যানেজারিয় নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ হয়ে পড়ে। এর ফলে সম্পদ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর হয়ে ওঠে এক বাস্তুসংস্থানিক আধুনিকতার দর্শন যা শেষ পর্যন্ত ডেকে আনে এক ব্যাপক ব্যবস্থিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সেই বিপর্যয় একদিকে যেমন মানুষ মানুষের সম্পর্ককে ভারসাম্যহীন করে তোলে তেমনই মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ককেও ভারসাম্যহীন করে তোলে।

(ঘ) বাস্তুসংস্থানবাদ প্রকৃতপক্ষে সেই নির্দেশক যা দেখায় যে কীভাবে উদারবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যক্তিকে অক্ষম করে রাখে। অর্থাৎ, এঁরা মনে করেন যে গ্রীন পলিটিক্স ভোগবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নৈতিকতার (যা নয়া-উদারবাদী রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি) বিপরীতে একধরনের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। কারণ নয়া-উদারবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব যে নৈতিকতার জন্ম দেয় তা শেষপর্যন্ত ব্যক্তিকে সামাজিক সমগ্র (social collective) থেকে পৃথক করে এবং তার মধ্যে অনুসদৃশ বিচ্ছিন্নতা ও একাকীত্বের জন্ম দেয়। এর বিপরীতে গ্রীন পলিটিক্স শেখায় প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের পন্থাপদ্ধতি এবং উৎসাহিত করে তোলে অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র এবং কৌমজীবন সম্বন্ধে। অর্থাৎ, বাস্তুসংস্থানবাদ গণতন্ত্রের ব্যপ্তিকরণের উপর গুরুত্ব দেয়।

বাস্তুসংস্থানবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে যে 'গ্রীন ক্রিটিক'-গুলি উপস্থাপিত হল বিভিন্ন সময়ে কিন্তু সেগুলির

বিরুদ্ধেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা উঠে এসেছে। যেমন বলা হয়ে থাকে যে 'গ্রীন পলিটিক্স' ক্ষুদ্র কৌমগুলির (small communitties) উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ায় এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীগত সংকীর্ণতা (parochialism) জন্ম নিয়েছে। আবার এমন অভিযোগও উঠেছে যে বাস্তুসংস্থানবাদী ক্রিটিক এক ধরনের প্রাক্-আধুনিকতাবাদী দর্শনের জন্ম দিয়েছে যা প্রকৃতি সম্পর্কে এক অবাস্তব রোম্যান্টিক চিত্র উপস্থাপন করে। শুধু তাই নয় বাস্তুসংস্থানবাদের মধ্যে যে ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থান রয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই সাম্প্রতিক বিশ্বের পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়, কারণ বিশ্ব উষ্ণায়নের মত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয়স্তরে সমঝোতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থান সমস্যা সমাধানে খুব সহায়ক নয়।

তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও মার্কসবাদে বিশ্বাসী বাস্তুসংস্থানবাদীদের বিশ্বাস যে সম্পদের সমানুপাতিক বন্টন ন্যায়কে নিশ্চিত করে। তবে তাঁদের মতে সামাজিক ন্যায়বিধানের অ্যাজেন্ডা কেবল কিছু বস্তুগত পুর্নবন্টনের (material aspect of redistribution) মধ্যেই সীমিত নয়, যা কেবল রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পদ বন্টনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজন অবসরযাপন ও সুন্দর জীবন যাপনের অধিকারের স্বীকৃতি। কারণ এই বিষয়গুলি মানবিক জীবনকে গুণগতভাবে সমৃদ্ধ করে। তবে বাস্তুসংস্থানবাদের ক্রিটিকরা মনে করেন যে প্রকৃতপক্ষে এই জাতীয় দাবীগুলির বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। R. Eckersley-র মত ব্যক্তিত্বরা মনে করেন যে, বাস্তুসংস্থানবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক রাষ্ট্রের সমালোচনা বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর কারণ বাস্তুসংস্থানবাদীরা রাষ্ট্রের এক ধরনের স্থির-বিমূর্তকরণ (static abstraction) ঘটায় যার সঙ্গে 'বাস্তব' রাষ্ট্রের মিল নেই। তাঁর মতে মনে রাখা প্রয়োজন যে 'রাষ্ট্র' একটি 'ঐতিহাসিক বর্গ' (historical category) যা পরিবর্তনশীল ও সংস্কারযোগ্য। ফলত একে বাস্তুসংস্থানবাদী যুক্তিগুলির ভিত্তিতে সংস্কার করা অসম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রবিরোধিতা বা রাষ্ট্রকে ভেঙে ফেলা নয় বরং রাষ্ট্রের সবুজায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া বেশী প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সবুজপন্থীরা রাষ্ট্রের দুটি উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন—এগুলি হল সার্বভৌমিকতা ও গণতন্ত্র। সার্বভৌমিকতা প্রসঙ্গে সবুজপন্থীদের বক্তব্য হল ভূখণ্ডকেন্দ্রিক সার্বভৌমিকতার ধারণায় বেশ কিছু সংস্কার করতে হবে। কারণ বর্তমান পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির এক ধরনের বিশ্বায়িত রূপ রয়েছে, যেগুলি সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় সীমা-অতিক্রমী সমঝোতা প্রয়োজন। প্রয়োজন বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত কিছু নিয়মনীতির অনুসরণ। গ্রীন পলিটিক্সে বিশ্বাসী এই গোষ্ঠী আসলে ম্যাক্স ওয়েবার প্রদত্ত রাষ্ট্রের চূড়ান্ত সার্বভৌমিকতার ধারণা থেকে এক ধরনের প্রতিসরণ কামনা করে। অন্যদিকে গণতন্ত্রের প্রশ্নে এই গোষ্ঠীটি গণতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক কাঠামো থেকে সরে এসে এক ধরনের পরিবেশবাদী গণতন্ত্রে আস্থা রাখার উপর জোর দেয়। আর এগুলির ভিত্তি হিসেবে তাঁরা বাস্তুসংস্থানবাদী এক বিকল্প আধুনিকতার ধারণা বা ecological modernization-কে গুরুত্ব দেন।

Eckersley-র মতে বাস্তুসংস্থানবাদী গণতন্ত্র উদারবাদী গণতন্ত্র থেকে দুটি অর্থে স্বতন্ত্র—

প্রথমত এটি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মত, এমন কোনও স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিসত্ত্বায় (autonomous self)

বিশ্বাসী নয় যার স্বনিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রাক্-সিদ্ধ (pre-existing) এবং যে ব্যক্তি কেবলই নিজের অধিকার ও স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়।

দ্বিতীয়ত বাস্তুসংস্থানবাদী গণতন্ত্র খারিজ করে দেয় সেই উদারবাদী গণতান্ত্রিক অবস্থানকে যা ব্যক্তিকে কেবল রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসেবে নিজেকে সনাক্ত করতে শিখিয়েছে। আসলে বাস্তুসংস্থানবাদ গণতন্ত্রকে 'democracy of affected' হিসেবে দেখে, 'democracy of membership' হিসেবে নয়, অর্থাৎ তারা মনে করেন যে রাষ্ট্রকে সেই সকল ব্যক্তির স্বার্থকেও দেখতে হবে যারা রাষ্ট্রের কাজকর্মের দ্বারা পরিবেশগত দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে। পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিনির্মাণ এবং সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকাকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষেই এক ধরনের অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে। আর এভাবেই রাষ্ট্রের সবুজায়নের প্রকল্পটি সার্থক হয়ে উঠবে।

এই বিস্তারিত আলোচনার শেষে বলা যায় যে, গ্রীন পলিটিক্সের বিবিধ ধারা নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গীগত মতবিরোধ যেমন রয়েছে, তেমন রয়েছে অসংখ্য বিতর্ক। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যে জটিলতা তৈরী হয়েছে সেই জটিলতার মধ্যেও রয়েছে অজস্র সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাগুলি বিকশিত হয়েছে আধুনিক রাষ্ট্রকে ঘিরেই।

যদিও একথা অনস্বীকার্য যে সবুজপন্থীদের একাংশের মধ্যে রয়েছে এক কঠোর রাষ্ট্রবিরোধী রোম্যান্টিক অবস্থান তবু মধ্যমপন্থী সবুজপন্থীরাও বিরল নয় যাঁরা রাষ্ট্রের মধ্যে কাম্য সংস্কার এনে আধুনিক রাষ্ট্রকে পরিবেশগত বিষয়ে অনেক সচেতন করে তোলার পক্ষপাতী। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, এঁরা যেভাবে রাষ্ট্রকে সীমিতকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে সওয়াল করেছেন তাতে মনে হতে পারে যে নয়া-উদারনীতিবাদের সঙ্গে এঁদের ভাবনাচিন্তার সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু এ জাতীয় সাদৃশ্যসূচক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা কোনওভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় কারণ সবুজপন্থী বাস্তুসংস্থানবাদীরা নয়াউদারনীতিবাদী বাজারকেন্দ্রিক নৈতিকতাকে সমর্থন করেন না বরং তার তীব্র সমালোচনা করেন। বাস্তুসংস্থানবাদীরা মনে করেন যে নয়া-উদারবাদী চেতনার 'ব্যক্তি' আপাতভাবে 'স্বনিয়ন্ত্রিত' 'একক বিষয়ী' (subject), যে পরিচালিত হয় তার অধিকার, দাবীদাওয়া ও স্বার্থের দ্বারা, কিন্তু শেষ বিচারে এই ব্যক্তি বাজার চালিত। এর বিপরীতে বাস্তুসংস্থানবাদী সবুজপন্থীরা কামনা করেন এক নতুন ধরনের গণতন্ত্র যা দাঁড়িয়ে আছে 'green ethics' বা সবুজপন্থী নৈতিকতার উপর এবং যা গুরুত্ব দেয় গোষ্ঠীবদ্ধতা, অংশগ্রহণ ও কৌম ভিত্তিক গণতন্ত্রের মত বিষয়গুলিকে। তাছাড়া মনে রাখা প্রয়োজন যে নয়া উদারবাদ এমনভাবে সম্পদ ব্যবহার ও আত্মসাৎ করার উপর গুরুত্ব দেয় যাতে সবচাইতে বেশী মুনাফা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্র বা পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব পায় না। এই বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তুসংস্থানবাদী সবুজপন্থী এবং নয়া উদারবাদীকে কোনভাবেই এক আসনে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় না।

বাস্তুসংস্থানবাদের বিবিধ প্রবণতা (যেমন আধুনিকতার বিরোধিতা) সত্ত্বেও এটি প্রকৃতির প্রতি এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করে, তৈরী করে কিছু নতুন মান (standards) এবং নিয়মনীতি (norms), যা আমাদের আসন্ন ভবিষ্যতে মানবসভ্যতার সংকটগুলি সম্পর্কে সচেতন করে দেয়। আর এই বিষয়টিও

অনস্বীকার্য যে, বাস্তুসংস্থানবাদীদের সাবধানবাণীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করার অর্থ নিজেদের সর্বনাশকেই বাস্তব করে তোলা। তাই এই আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা চলে যে বাস্তুসংস্থানবাসী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের পুনর্বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, কারণ প্রকৃতি ও মানুষের ভারসাম্যমূলক সম্পর্ককে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

৪.৬ নমুনা প্রশ্নসমূহ ঃ

দীর্ঘ প্রশ্নমালা ঃ

(১) বাস্তুসংস্থানবাদের মূল বক্তব্যসমূহের পর্যালোচনা করুন।

(২) বাস্তুসংস্থানবাদের প্রধান ধারাগুলির একটি রূপরেখা দিন।

মধ্যম প্রশ্নমালা ঃ

(১) বাস্তুসংস্থানবাদ কীভাবে আলোকায়ন প্রভাবিত আধুনিকতার ধারণাকে সমালোচনা করে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দিন।

(২) বাস্তুসংস্থানবাদের বিরুদ্ধে ওঠা সমালোচনার মূল যুক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নমালা ঃ

(১) বাস্তুসংস্থানবাদ কীভাবে উত্তর ভোগবাদকে সমর্থন করে?

(২) নারীবাদী বাস্তুসংস্থানবাদ বা ইকোফেমিনিজম্ এর মূল বক্তব্য কী?

(৩) রাষ্ট্রকেন্দ্রিক আমলাতন্ত্রবাদের বাস্তুসংস্থানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা বলতে কী বোঝায়?

(৪) 'প্রভাবিতদের গণতন্ত্র' বলতে কী বোঝায়?

৪.৭ গ্রন্থসূচী

A Andrew Heywood : *Modern Political Ideologies*, Third edition (New York : Palgrane Macmillan 2003]

B Michael Colinstay, David Marsh Lister, (eds) : *The State : Theories and Issues* (Hampshire : Palgrave Macmillan, 2006)

C Tim Hayward : ''Ecologism and Environmentalism'' in Alan Finlayson(ed) : *Contemporary Political Thought. A Reader and Guide* (New Delhi : Rawat 2003)

D Vandana Shiva, 'Development, Econlogy and Women'' in Alan Finlayson (ed) : *Contemporary Political thought. A Reader and Guide* (New Delhi : Rawat, 2003)

E Roy Eckersley : *The Green State, Rethinking Democracy and Sovereignty* (Cambridge, MA : MIT Press, 2004).

NOTES

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

—Subhas Chandra Bose

Price : Rs. **150.00**

(*NSOU* -র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-1, Salt Lake City, Kolkata-700 064 and
Printed at : Royal Hlaftone Co., 4, Sarkar Bye Lane, Kolkata-700 007